মরমী কবি
খোদা বক্‌শ শাহ
জীবন ও সঙ্গীত

খোন্দকার রিয়াজুল হক

মরমী কবি খোদা বক্‌শ শাহ ঃ জীবন ও সঙ্গীত / খোন্দকার রিয়াজুল হক

বাংলা একাডেমী

মরমী কবি খোদা বক্‌শ শাহ : জীবন ও সঙ্গীত

ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ / জুন ১৯৯৭

বাএ ৩৫৭২
[৯৬–৯৭ গসফো : ফোকলোর–১]

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
আশফাক–উল–আলম
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা–১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
পঁচাশি টাকা মাত্র

MARAMI KABI KHODA BAKSHA SHAH : JIBAN O SANGIT. [*Mystic Poet Khoda Baksha Shah : Life and Songs*]. Written by Dr. Khondaker Reajul Haque. Published by Ashfaque-ul-Alam, Director, Research Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition: June 1997. Price : Taka 85·00 only. US $ 3.

ISBN-984-07-3581-0

উৎসর্গ

চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল ভাবসঙ্গীত
শিল্পী ও মরমী সাধকের উদ্দেশে

অবতরণিকা

লালন শাহের তিরোধানের পর লালন–শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ লালন–সঙ্গীত প্রচার–প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ছেঁউড়িয়ার আখড়াতে লালন–শিষ্য ভোলাই শাহ এবং তাঁর অনুগামিগণ লালন–সঙ্গীত চর্চায় রত থাকেন। লালন–অনুসারী শীতল শাহ, পাঁচু শাহ এবং আরো অনেকে লালন–সঙ্গীতকে তাঁদের সাধনার অনুষঙ্গ করে নেন।

লালন–সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের কারো অনুরাগ কম ছিল—এমন কথা বলা যায় না। বরং বলা যায়, গুরুপ্রাপ্ত এ সঙ্গীত–সম্পদের সদ্ব্যবহার করার জন্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাবই তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিল। এই প্রতিযোগিতায় মনিরুদ্দিন শাহের সাফল্যই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর জন্মপল্লি মালিপাড়ায় এবং পার্শ্ববর্তী হরিয়ারঘাট গ্রামে লালন–সঙ্গীত চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁরই অন্তরঙ্গ শিষ্য হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ।

শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ খোদা বকশ গুরুর নিকট থেকে প্রাপ্ত লালন–সঙ্গীত প্রচারে সচেষ্ট হন। এ সঙ্গীতকে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি নানা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। বিভিন্ন সাধুসেবায় (ফকিরি মজলিশে) উপস্থিত হয়ে তিনি গায়ক–গায়িকাগণকে বেশি বেশি করে লালন–সঙ্গীত গাইবার প্রেরণা দিতে থাকেন। মনিরুদ্দিন শাহের সংরক্ষিত খাতা থেকে লালন–সঙ্গীত চয়ন করে খোদা বকশ আগ্রহী শিল্পীদের হাতে তুলে দেন।

ঐ শ্রেণীর শিল্পিগণের মধ্যে অমূল্য শাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গ–সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ শিল্পী। কলকাতা এবং যশোর–নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি উচ্চাঙ্গ–সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এক পর্যায়ে লালন–সঙ্গীতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র পরিত্যাগ করে অমূল্য শাহ হাতে তুলে নেন একতারা–বায়া। অসাধারণ কণ্ঠ এবং অপূর্ব গায়নভঙ্গির গুণে তিনি অতি সত্বর লালন–সঙ্গীত তথা সমগ্র ভাবসঙ্গীতের নামকরা শিল্পী হিসেবে জনগণের স্বীকৃতি লাভ করেন।

নিজের সংগ্রহ–ভাণ্ডারে অধিক সংখ্যক লালন–সঙ্গীত সঞ্চয় করার আশায় অমূল্য শাহ তাঁর নিজস্ব এলাকা মহেশপুর থেকে হরিশপুর (থানা–হরিণাকুণ্ডু, জেলা–ঝিনাইদহ) আসেন। হরিশপুরের আলীম শাহ (বেহালাবাদক ও ভাবসঙ্গীত শিল্পী) ছিলেন অমূল্য শাহের নিকট আত্মীয়। এই সূত্রে পূর্বেও হরিশপুরে তাঁর যাতায়াত ছিল। আলীম শাহের আখড়ার অনতিদূরে মরমী কবি পাঞ্জু শাহের আখড়া। এ আখড়ায় নিয়মিত ভাবসঙ্গীতের আসর বসতো। পাঞ্জু–পুত্র শামসউদ্দিন খোন্দকার এবং খোন্দকার রফিউদ্দীন উভয়ে ভাবসঙ্গীতের অনুরাগী সমঝদার এবং সাধুভক্ত মানুষ ছিলেন। অমূল্য শাহকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানান পাঞ্জু–আখড়ায়। এভাবে পাঞ্জু–আখড়ায় অমূল্য শাহ পরিচিত হয়ে ওঠেন। হরিশপুর থেকে

হরিয়ারঘাটের দূরত্ব তিন মাইল। হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের সাথেও এক সময় অমূল্য শাহের পরিচয় হয়। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ এবং অসাধারণ গায়নভঙ্গির পরিচয় পেয়ে খোদা বকশ শাহ তাঁকে সাধ্যমতো সাহায্য করেন। অল্প দিনেই অমূল্য শাহের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় বহু লালন-সঙ্গীত।

মনিরুদ্দিন-শিষ্য খোদা বকশ শাহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাঁর নিকট থেকে আহরিত লালন-সঙ্গীতকে অমূল্য শাহ সাধুসেবার (ফকিরি মজলিশের) আসর থেকে জনসাধারণের দরবারে নিয়ে যান। হাজার হাজার শ্রোতার সম্মুখে তিনি লালন-সঙ্গীত উপস্থাপন করেন। শ্রেণীবিভাগ করে প্রশ্নোত্তরে গানগুলো পরিবেশন করায় শ্রোতারা গান শুনে তৃপ্তি পেতে থাকে। প্রশ্নোত্তরে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে অন্তত দু-জন শিল্পীর প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অমূল্য শাহ শিল্পী তৈরিতে মনোযোগ দেন। তাঁর চেষ্টায় এবং প্রশিক্ষণে বেশ কিছু শিল্পী তৈরি হয়। এঁদের মধ্যে বেহাল শাহ, শুকচাঁদ শাহ, নিমাই শাহ, গহোর শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অমূল্য-বেহাল-শুকচাঁদের সঙ্গীত-ভুবনে আর এক সঙ্গীত-প্রতিভার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম খোদা বকশ শাহ। হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের নাতি-শিষ্য ছিলেন তিনি। কররাজাঁহাপুরের খোদা বকশ বিশ্বাস বললে সকলে তাঁকে চিনতো। ফকিরি পোশাক গ্রহণের পর তিনি খোদা বকশ শাহ নামে পরিচিত হন। হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের দীক্ষিত শিষ্য শুকচাঁদ শাহ। এই শুকচাঁদ শাহের দীক্ষিত শিষ্য কররাজাঁহাপুরের খোদা বকশ বিশ্বাস বা খোদা বকশ শাহ। শুকচাঁদের শিষ্য হলেও খোদা বকশ শাহ লালন-সঙ্গীত তথা সমগ্র ভাবসঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন অমূল্য শাহের কাছে। একতারা-বায়া সহযোগে লালন-সঙ্গীত পরিবেশনের যে ধারা অমূল্য কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, খোদা বকশ শাহ সে ধারারই পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্পী।

বর্তমান গ্রন্থে এই মহত সঙ্গীত-সাধকের জীবন, দর্শন এবং রচনা-বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর রচিত একশত আটচল্লিশটি সঙ্গীতও এ গ্রন্থে রয়েছে। ভূমিকাংশে কবি-মানস পটভূমি শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে মরমী কবি খোদা বকশ শাহের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস আছে। সবশেষে রয়েছে কবির সিজরানামা, বংশলতিকা ইত্যাদি। লালন-ঘরানার যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে খোদা বকশ শাহকে আর কেউ এভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে আমার জানা নেই। ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) করে গ্রন্থে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছি। ফিল্ডওয়ার্কই আধুনিক ফোকলোর চর্চার সর্বপ্রথম রীতি-পদ্ধতি। এ গ্রন্থে সেই রীতি-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁর অমূল্য সহযোগিতার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত-প্রতিভা এবং তত্ত্বদর্শন-চিন্তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ-রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রেরণা আমাকে সর্বাধিক উৎসাহিত করেছে।

আমি তাঁর মহত্ত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। বাংলা একাডেমীর পরিচালক থাকাকালেও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সামান্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর মহত্ত্বকে অকিঞ্চিৎকর করে দেখতে চাইনে।

মুদ্রণকালে গ্রন্থের আঙ্গিক সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক গোলাম মঈনউদ্দিন। গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে প্রকাশ করার জন্যে তাঁর নির্দেশ যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করেছি। তাঁকে জানাই ধন্যবাদ।

গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগের পরিচালক আশফাক-উল-আলম সর্বাধিক যত্নবান হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

ফোকলোর উপবিভাগের প্রাক্তন উপপরিচালক হাবীব-উল-আলম (বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগের পরিচালক) গ্রন্থটি প্রকাশে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ফোকলোর উপবিভাগের সহপরিচালক শাহিদা খাতুন, সহপরিচালক মোহাম্মদ ইসহাক আলী এবং প্রেসের উৎপাদন কর্মকর্তা আফজল হোসেন গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে খুব তৎপর ছিলেন। তাঁদের সকলকে জানাই অভিনন্দন। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস, ডক্টর মোমেন চৌধুরী, ডক্টর বেগম জাহান আরা প্রমুখ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ মহানুভবতার জন্যে তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি।

খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত সংগ্রহে সহায়তা করেছেন বকশ-পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাস, বকশ-শিষ্য হেদায়েত আলী এবং বিনয়কৃষ্ণ পাল। তাঁদেরকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। কবির জীবন, দর্শন ও সঙ্গীত-প্রতিভা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন কতিপয় গুণীজন। এঁদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ তৎপর হওয়ায় প্রেস এবং কম্পিউটার সেকশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ধন্যবাদ জানাই।

কবি খোদা বকশ শাহ সম্পর্কে গ্রন্থ-রচনার এটিই প্রথম প্রয়াস। আর সে জন্যেই তথ্য-সন্নিবেশ, প্রণয়নের রীতি-পদ্ধতি, গবেষণা-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে। এ সব ত্রুটির জন্যে আমি সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে বলবো, এ গ্রন্থ যদি বিদ্বৎ-সমাজে কবি খোদা বকশ শাহ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আগ্রহ সঞ্চার করে, তবেই আমার শ্রম সার্থক।

খোন্দকার রিয়াজুল হক

সূচিপত্র

জীবন

কবি-মানস পটভূমি : মরমীবাদ সমীক্ষা

ইংরেজি 'মিস্টিসিজম' শব্দের বাংলা রূপান্তর 'মরমীবাদ'।[১] 'মরমী' বলতে অস্পষ্ট গূঢ় অর্থপূর্ণ গুপ্তরহস্যমণ্ডিত হৃদয় দ্বারা অনুভূত বিষয় বুঝায়। স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে সক্ষম ব্যক্তিকেও মরমী বলা হয়।[২] অর্থাৎ পরম সত্যের সাথে যাঁর মর্ম বা অন্তঃকরণ সংযুক্ত, তিনিই মরমী এবং দার্শনিক প্রমাণাদি দ্বারা নির্ণীত তাঁর সিদ্ধান্ত বা মানসতত্ত্ব 'মরমীবাদ' নামে অভিহিত।[৩] আঞ্চলিক ভাষায় মরমী অর্থে 'মরমীয়া' কথাটি প্রচলিত। 'মরমীয়া' সেখানে পবিত্র হৃদয়বিশিষ্ট সমবেদনা অনুভবকারী[৪] মহাপ্রাণ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক শব্দ। তবু মনে হয়, 'অতীন্দ্রিয়' এই প্রতিশব্দ দ্বারা 'মরমী' শব্দটি অধিকতর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কেননা ইন্দ্রিয়ের অগম্য বা জ্ঞানের অবিষয়ীভূত যা কিছু, তাই অতীন্দ্রিয় ; মর্ম দ্বারা উপলব্ধি ব্যতীত যার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন সম্ভব নয়।[৫] বস্তুত মর্ম দ্বারা অনুভূত তত্ত্ব বলে 'মরমীবাদ' ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত রহস্যলোকের গূহ্যবস্তু জ্ঞানাতীত চিন্তাতীত আত্মিক বিষয়।[৬] সুতরাং প্রেমমিশ্রিত ধ্যান ও স্বজ্ঞা বা বোধি দ্বারা পরম সত্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের অভিজ্ঞতাই 'মরমীবাদ'।[৭]

মরমীবাদ বস্তুগত বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় নয়। এ এক বিশেষ ধরনের মানবীয় অনুভূতি, মহিমময় বোধশক্তি, বিষয়বুদ্ধি থেকে মুক্তির প্রয়াস এবং সর্বোচ্চ মোক্ষলাভের সাধনা।[৮] অবাঙমানসগোচর সেই পরম সত্তা — হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে যার অবস্থান, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যার বিচরণ, ধমনীর নৃত্যছন্দে যার অভ্রান্ত বিহার, ভাবুক যাকে অন্তরের নিথর স্তব্ধতায় অনুভূত করেও সে অনুভূতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় না, ব্যাখ্যাতীত বর্ণনাতীত সেই বিরাট সত্তা — 'জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে অভ্যাসে'[৯] — বোধি (Intuition) দ্বারা তারই উপলব্ধিজাত গভীর মানস-চাঞ্চল্য সৃষ্টিই মরমীবাদের বৈশিষ্ট্য। সহজভাবে বলতে গেলে 'বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ, দেহে থেকেও দেহাতীতের স্পর্শানুভব, নীরবতার মধ্যে থেকে দেহ-মনের ক্রিয়াশীলতা, বিরহের মধ্যে মিলনের রস উপভোগ, সুদূরকে নিকটতম রূপে পাওয়া, নিকটতমকে সুদূর-ভ্রমে ধারার আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির বেদনা, একাকীত্বের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদন, বিষাদের মধ্যে আনন্দের প্লাবন এবং সর্বোপরি সর্বতোপ্রয়াসী প্রেম এর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।'[১০]

বস্তুত অন্তরের গভীরে উপলব্ধ সত্য-শিহরণের অনুভূতি বোধি (স্বজ্ঞা) ব্যতীত জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিচার্য নয়। কেননা একমাত্র বোধিদৃষ্টির ফলেই সমুচ্চ অনন্ত সত্তার সাথে শান্ত মানব-সত্তার বিভেদ তিরোহিত হয়।[১১] সীমাবদ্ধ জ্ঞানে শ্রেয়-প্রেয় সেই অসীমকে জানা অসম্ভব। বিজ্ঞানও এ জানাকে সম্ভব করতে পারে না। কারণ জানা (knowing) এবং হওয়া (becoming) অভিন্ন-অচ্ছেদ্য হয়ে একটি চরমাবস্থা সৃষ্টি করে। ধ্যানদৃষ্টিসম্ভূত সে

চরমাবস্থার কথা বিজ্ঞান ভাবতেই পারে না। যোগী যা ধ্যানে এবং কবি যা ভাবে পেয়ে থাকেন, সেই অহংবিলুপ্ত তন্ময়াবস্থা মরমীর ব্যক্তিগত অনুভূতি। শ্রুতি যাকে পরাবিদ্যা বলে, এটা আসলে তাই। মরমীবাদের চূড়ান্ত তাৎপর্য এই।[১২]

দৃষ্টিবহির্ভূত অতীন্দ্রিয় জগত এবং শাশ্বত অধ্যাত্ম প্রেম চিরন্তন। মরমীরা এ চিরন্তনবাদে আস্থাশীল।[১৩] এই আস্থা অর্জনের প্রধানতম অবলম্বন হচ্ছে আত্মা। সুতরাং আত্মাই মরমীবাদের প্রধান উৎস।

মানুষ যে উৎস থেকে এসেছে, যে উৎসে ফিরে যাবে —আল কোরআনে এ কথার উল্লেখ আছে।[১৪] গ্রিক এবং নিউপ্লেটোনিক দার্শনিকগণও এ তত্ত্ব সমর্থন করেন।[১৫] কিন্তু কোথায় সে উৎস, যার কাছ থেকে এ জীবজগতের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং দীর্ঘ পথ–পরিক্রমার পর একদিন তার সাথে জীবের মিলন হবে? এ প্রশ্নের জবাব–সন্ধানী 'উৎকণ্ঠা' মরমী চিন্তার আর একটি উৎস।

নশ্বর এ দেহে অবিনশ্বর সত্তার বসত। বাইরে না খুঁজে আপন দেহমধ্যে খোঁজ করলে তাকে পাওয়া যায়। মরমী মনের এ আত্ম–অনুসন্ধানের স্পৃহা থেকে মরমীবাদের উৎপত্তি। জনৈক বিদ্বানের ভাষায় — 'সমগ্র মরমী–ভাবনা একটি একক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।'[১৬] আর তা হচ্ছে নিজেকে জানা অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ যাবতীয় গূঢ়রহস্য উদঘাটনের সাধনা।

ধর্মের বাহ্যিক আচার–অনুষ্ঠান নয়, হৃদয়ের প্রেমই স্রষ্টাকে লাভ করার শ্রেষ্টতম উপায়। এ প্রেমানুভূতি থেকে মরমীবাদের ধারণাপ্রবাহ সৃষ্টি। জগতের অনেক মরমীর জীবন–দর্শন, বাণী ও আদর্শ এ কথার সাক্ষ্য বহন করে।[১৭]

মানুষের পার্থিব জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে মরমী বা মর্মমুখ চৈতন্যের বিকাশও স্বাভাবিক। সুতরাং অজ্ঞাতকে পরিজ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা, চর্মচক্ষে দৃষ্ট বস্তুর পশ্চাতে লুক্কায়িত অদৃশ্য বস্তুকে প্রাণের নয়নে মর্মের দৃষ্টিতে দেখার ও বুঝার তীব্র আন্তর–প্রেরণা থেকে মরমীবাদের উদ্ভব।[১৮]

প্রত্যেক ধর্ম উদ্ভবের মূলে থাকে দুটি প্রবণতা। একটি মানুষকে মর্মমুখ করে অজানার সন্ধান বলে দিতে চায়। অন্যটি তাকে কর্মমুখ করে বাইরের সভ্যতা ও জ্ঞানের দিকে চালিত করে। ধর্ম ও কর্ম উভয় দিকে ঝোঁক পড়লে ধর্মানুসারীদের মধ্যে একটা অতিরঞ্জনের সংঘাত আসে। ফলে ঐহিকতার চাপে মর্মের দিকটা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো হয়ে পড়ে। এরই শেষ শিখাটুকুকেই মরমীবাদের উদ্ভবের মূলে দেখতে পাই।[১৯]

প্রাচীন বিশ্বের কোথায় সর্বপ্রথম মরমীবাদের উদ্ভব ঘটে, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বিদ্বানদের মতে মরমীবাদ অনেক ধর্মীয় বিশ্বাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাচ্যের আদিম ধর্মমতসমূহ, বৈদিক সাহিত্য, চীন–ভারতের বুদ্ধমত, ইহুদী মতবাদ, গ্রিক মতাদর্শ, খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাস এবং বিশেষ করে ইসলামে এর প্রভাব সর্বাধিক। অনুসন্ধানে জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মরমীবাদ ইসলামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মুসলিম দেশসমূহে বিস্তৃত হয়। তবে মিশর, পারস্য, তুরস্ক ও ভারত মরমীবাদ–প্রভাবিত দেশ হিসেবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

ঐতিহাসিকেরা বলেন —'ভারতের চিন্তাজগতে অধ্যত্মবাদের প্রভাব সর্বজনবিদিত।'[২১] বিশ্বকোষের তথ্য থেকেও দেখা যায়, 'ভারতের সমাধিমগ্ন যোগীদের সাধন–মার্গ মরমী ভাবধারার সাথে অভিন্ন।'[২২] দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তিও এ উপমহাদেশের আদি ভাবসাধনার ফল। এ ধারণাও একেবারে ভিত্তিহীন নয়।[২৩]

মিশর এবং ব্যাবিলনীয়ান সভ্যতার সমকক্ষ হয়েও ভারত অদ্যাবধি তার সভ্যতা টিকিয়ে রেখেছে।[২৪] এর মূলে বোধ হয় একটি সত্য সক্রিয় যে, এ উপমহাদেশের জনজীবন নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকৃতপক্ষে ধর্ম দ্বারা, যার সাথে দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, সমগ্র এশিয়ার চিন্তাধারা ধর্মের প্রভাবে অভিভূত, অথচ ইউরোপীয় চিন্তাধারা বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[২৫] তত্ত্বের ক্ষেত্রেও ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। তার ফলে এ দর্শনে আধ্যাত্মিকতার এত প্রভাব। উপমহাদেশীয় প্রায় সব দার্শনিকই আত্মা ও মুক্তির স্বরূপ জানার চেষ্টায় ব্যস্ত। তাঁদের এ চেষ্টার মূলেও অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বিশেষ ক্রিয়াশীল।[২৬] এ সব তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আমরা এখন ভারতীয় দর্শন এবং তাতে অধ্যাত্মবাদ বা মরমীবাদের প্রতিফলন, সাথে সাথে বহির্ভারতীয় মরমীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাংলাদেশ–পাক–ভারতীয় মরমী চিন্তায় তার প্রভাব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করতে চাই।

ভারতের প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র বেদ। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দী বেদের উদ্ভবকাল। যাঁরা বেদ স্বীকার করেন, তাঁরা আস্তিক দর্শন–সম্প্রদায় ; যাঁরা বেদ স্বীকার করেন না, তাঁরা নাস্তিক দর্শন–সম্প্রদায় নামে অভিহিত। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত — এ ছয়টি ভারতীয় ষড়দর্শন। অন্যদিকে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ নাস্তিক দর্শন রূপে পরিচিত।[২৭] সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ ও বিচারবুদ্ধি উভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন হচ্ছে মীমাংসা ও বেদান্ত।[২৮] তবে বেদবিধি ও বেদাচার অস্বীকৃত চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনও ভারতীয় চিন্তাধারার মূল্যবান সম্পদ — এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

চার্বাক দর্শন মূলত 'লোকায়ত দর্শন' বলে পরিচিত। বেদ–বিরোধী, ধর্মমোক্ষ বিরোধী, দেহাত্মবাদী, প্রত্যক্ষবাদী এবং বস্তুবাদী এ দর্শন মাটি, পানি, আগুন, বায়ু — এই চার বস্তুকে সমস্ত বস্তুসৃষ্টির মূল বলে ব্যাখ্যা করে। জাবালী, চার্বাক, ভাগুরী, রাজাবেন, অজিত কেশকম্বলী ইত্যাদি দার্শনিকের নাম এ দর্শনের সাথে জড়িত।[২৯] তথাপি বহু সমালোচনার মধ্যদিয়ে নির্ণীত হয়েছে যে, 'চার্বাক দর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাধারণ মানুষের জীবন–দর্শন। এ দর্শন মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক এবং প্রগতিশীল চিন্তার বাহক।'[৩০]

জৈন দর্শনের উৎপত্তি সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে। চল্লিশ জন প্রচারক দ্বারা জৈন দর্শন প্রচারিত হয়। এর প্রথম প্রচারক ঋষভদেব এবং সর্বশেষ প্রচারক মহাবীর। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের সমসাময়িককালে মহাবীরের জন্ম। প্রত্যক্ষণ, অনুমান ও শব্দ—এ তিনটি জৈনমতে জ্ঞানের উৎস। ক্ষিতি, অপ, তেজ ,মরুৎ — এ চার উপাদানে বস্তুজগত সৃষ্ট। এ কথা জৈনরা স্বীকার করেন। আত্মার সর্বত্রগামিতা, সাধনবলে দেহ–খাঁচায় বদ্ধ আত্মার মুক্তি

ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদে তাঁদের বিশ্বাস। জীবে দয়া এবং অহিংস পরম ধর্ম —এ হচ্ছে জৈন দর্শনের সার কথা।[৩১] বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতে জৈনমত যথেষ্ট জনপ্রিয়।

প্রাচ্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ও দর্শন প্রচারক হচ্ছেন বুদ্ধদের। (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ — খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩)। ত্রিশ বছর বয়সে যুবরাজ সিদ্ধার্থ গৌতম অবলোকন করেন বার্ধক্য, জ্বরা, রোগ ও মৃত্যু। তাঁর চিত্তে পরিবর্তন আসে। তিনি রাজপ্রাসাদ ছাড়েন। গয়ার নিকটস্থ বোধিবৃক্ষতলে ছ-বছর যাবত ধ্যান করার পর তিনি দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হন। তখন তাঁর সম্মুখে খোলা থাকে তিনটি পথ — জাগতিক আনন্দের পথ, কৃচ্ছ্রসাধনার পথ এবং মধ্যপথ (নির্বাণ ও শান্তির পথ)।[৩২]

বুদ্ধের তিরোধানের পর বৌদ্ধ দর্শন-সম্প্রদায় চার ভাগে বিভক্ত হয়। এগুলো হচ্ছে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। প্রথম দুটি মহাযান শাখার এবং দ্বিতীয় দুটি হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৩৩] সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে হীনযান সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তিব্বত, চীন ও জাপানে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লক্ষিত হয়।[৩৪]

মাধ্যমিকদিগের মতে সবই শূন্য, জগতে কিছুই নেই। এঁদের মতে জগত মিথ্যা। যোগাচারীরা বাহ্যবস্তুকে অলীক ও ক্ষণিক বিবেচনা করেন। বিজ্ঞানরূপ আত্মাই এঁদের মতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। উক্ত বিজ্ঞান দ্বিবিধ — প্রবৃত্তি ও আলয়। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও অনুমান সিদ্ধ। বৈভাষিকেরা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কয়।[৩৫]

আত্মোৎকর্ষ সাধনই বৌদ্ধ ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। সদদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদবাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন ইত্যাদি দ্বারা মানুষ ধর্মপথে অগ্রসর হতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মে জাতির বিচার নেই। এ ধর্মে সব মানুষই সমান।[৩৬]

বৌদ্ধ ধর্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক। গৌতম বুদ্ধ প্রাগ্রসর চৈতন্যের মননধর্মী দর্শনের এবং বিপ্লবী ভাবধারার একটি তেজদীপ্ত প্রবুদ্ধ ভাবমূর্তি। এই উপমহাদেশের প্রধানত পারজাগতিক চিন্তাসর্বস্ব চিরায়ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে তিনি একটি স্বাধীন যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন। বস্তুত বুদ্ধের চিন্তার প্রভাব এ উপমহাদেশে হাজার বছর ধরে অত্যন্ত প্রকট। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও বৌদ্ধ-প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধগণেরই সাধন-সঙ্গীত। এমন কি বঙ্গদেশের উনিশ শতকের পুনর্জাগরণের মধ্যে যে নয়া মানবতাবাদ, মুক্তনীতিবোধ এবং যুক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, বৌদ্ধ দর্শনে তার সন্ধান মেলে।[৩৭]

ভারতীয় ষড়দর্শনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই।[৩৮] তবে এগুলোর মধ্যদিয়ে আর্যঋষিদের চিন্তাবিকাশের একটি শৃংখলা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ন্যায় ও বৈশেষিক এ পৃথিবীকে আমরা যেভাবে দেখছি, সে ভাবেই গ্রহণ করেছে। তারপর নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতো এর জড় উপাদানের সর্বনিম্ন স্তর — অনুপরমাণু পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখেছে। এই অনুসন্ধানে বিশ্বস্রষ্টার শিল্পচাতুর্য ও সর্বকারণত্ব সর্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে 'ন্যায়' তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়েছে।[৩৯]

মীমাংসা দর্শন বলছে — বেদনির্দিষ্ট কর্মই ধর্ম এবং বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম সবই অধর্ম। এ দর্শনের প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষ , অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি — এ পাঁচ প্রকার জ্ঞানের উৎস। এর ভট্ট সম্প্রদায় এ পাঁচটির সাথে 'অনুপলব্ধি' নামক আর একটি জ্ঞানের উৎস যোগ করেছেন। এরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এঁদের মতে আত্মার কর্মানুসারে জগতের বিভিন্ন বস্তু গঠিত হয়। তবে এঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না।[৪০]

এ বারে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শন নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই। বিদ্বানদের মতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র — এ তিনটি ভারতীয় আদি তত্ত্ব ও শাস্ত্র। কারো কারো মতে সাংখ্য দর্শনেরই দ্বিবিধ আচার শাস্ত্র হচ্ছে যোগ ও তন্ত্র।[৪১] কেউ কেউ বলেন একই দর্শনের দুটি ভিন্ন দিক হচ্ছে সাংখ্য ও যোগ।[৪২]

'সাংখ্য' শব্দের দুটি অর্থ —সম্যক জ্ঞান (সম অর্থ সম্যক, খ্যা অর্থ জ্ঞান) এবং 'সংখ্যা সম্পর্কিত বা সংখ্যাবোধক তত্ত্ব'। বুদ্ধিভিত্তিক বিশ্লেষণ, সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা এই দর্শনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানযোগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলে এই দর্শনকে সম্যক জ্ঞানবাদী দর্শন বলা হয়।[৪৩] গীতায় আছে নিষ্ঠা দুই প্রকার — সংখ্যাবিদগণের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের প্রতি এবং যোগীদের (কর্মযোগী অর্থে) নিষ্ঠা কর্মযোগের প্রতি।[৪৪] সংখ্যা দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, কর্মযোগ দ্বারাও সেই স্থান লাভ করা যায়।[৪৫] বুদ্ধি, মন, অহং ও ইন্দ্রিয়াদি সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতি জড়াত্মক পরিণামী। এ সমস্তে আত্মার অধ্যাস ও বন্ধন মুক্ত হয়। বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তিই সাংখ্য দর্শনের মতে জীবনের পরমার্থ।[৪৬]

যোগ-দর্শনের মূলকথা জন্ম, মৃত্যু এবং জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জনের সাধনা। এই মুক্তির মাধ্যম দুটো — বৈরাগ্য এবং যোগ বা ধ্যান। জগত ও জীবনকে মায়া বলে ধারণা করলেই মানুষের মনে বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়। যোগের বা ধ্যানের মাধ্যমেই ভগবান বা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়। যোগের আলোচ্য বিষয় দর্শন নয়, সাধনা। তবু দর্শন-সম্প্রদায় হিসেবেই যোগ প্রসিদ্ধ।[৪৭] আদিতে যোগ অবৈদিক সাধন-পদ্ধতি ছিল। সাংখ্য ও যোগের মূল ধারাগুলো বেদপূর্ব যুগের। তবে জৈন দর্শনের সাথে সাংখ্য ও যোগ সমন্বিত হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত দর্শনের সাথে সাংখ্য ও যোগ স্বীকৃতি পেয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন প্রাচীনতম এই সাংখ্য দর্শন থেকে উৎপন্ন। বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম ও উদ্রক উভয়েই সাংখ্য মতের ছিলেন।[৪৮] সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতম আর একটি প্রমাণ এই যে, সাংখ্য-সমর্থিত স্বত্তঃ, রজঃ, তমঃ — এ ত্রিগুণের উল্লেখ আছে বৈদিক সাহিত্যে। এছাড়া প্রকৃতি-নিষ্ঠা, যোগদর্শন-সম্মত ইন্দ্রিয় সংযম, চিত্তের অভিনিবেশ ইত্যাদিও অথর্ব বেদে আছে। সাংখ্য দর্শনের ধারণাসমূহ স্পষ্টভাবে কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও মৈত্রায়নী উপনিষদে দেখা যায়।[৪৯] 'আত্মানং বিদ্ধি' — সাংখ্য দর্শনের এ অমোঘ বাণী বৃহদারণ্যকে আছে।[৫০] আত্মাই ব্রহ্ম — ছান্দোগ্য উপনিষদেও এ কথা বলা হয়েছে।[৫১] মহাভারতেও 'যোগ' বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।[৫২] প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত এবং প্রাথমিক যোগদর্শন-ভিত্তিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ 'ঈশ্বরবাদ' মহাভারতে খুঁজলে মেলে। মোটকথা, 'যোগ' হচ্ছে দেহসাধনা বিষয়ক দর্শন।

'সাংখ্য' এবং 'যোগ' উভয় দর্শনের আচার-শাস্ত্র হচ্ছে 'তন্ত্র'। বেদে তান্ত্রিক আচারের পূর্বাভাস আছে। তবে স্ত্রী-রূপকে ঐশী শক্তির উচ্চতর মর্যাদা দান, বিষ্ণু-শিবের শক্তি মহিমা এবং তাদের ক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণা অবৈদিক। 'আগম' শাস্ত্রকেও অবৈদিক ধরা হয়ে থাকে। বস্তুত অবৈদিক ও অনার্য তন্ত্রই এ দেশের আদি ধর্ম।[৫৩] এ সূত্রে তন্ত্রকে 'আদিম অনার্য গুপ্ত শাস্ত্র' বলা হয়।

তন্ত্র সাধনার দুটো প্রধান বিষয় আছে। এ দুটো হচ্ছে 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব' ও 'মৈথুনতত্ত্ব'। 'যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' — তন্ত্র সাধনার এটাই মূল কথা।[৫৪] অর্থাৎ মানবদেহ মধ্যেই সব কিছু আছে। দেহের পরিচর্যা করলেই সব সাধনা সফল হয়। 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব' কার্যত এ তথ্যের ভিত্তিতেই দণ্ডায়মান।

মৈথুনতত্ত্ব বলতে নারীপুরুষ-তত্ত্ব-ভাবনা বুঝায়। এ তত্ত্বের মূল কথাগুলো এ রকম — আত্মা প্রথম পুরুষ, তিনি দ্বিতীয়ের অভাব বোধ করেন, তখন রতিভোগের জন্যে নিজেই দ্বিধাবিভক্ত হন। তন্ত্র মতে 'আদি একক' স্বয়ং নর ও নারী রূপে আবির্ভূত হয়ে রতি-মিলনে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি করেন। এটাই তন্ত্রের মৈথুনতত্ত্ব ব্যাখ্যা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তন্ত্রের এ মৈথুনতত্ত্ব আছে।[৫৫] সুতরাং এ তত্ত্ব অতি প্রাচীন। সাংখ্য, গীতা ইত্যাদি এ মৈথুনতত্ত্ব স্বীকার করে।[৫৬]

এ সকল তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মিলে প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে একটি দেহতত্ত্ব সাধনা চালু আছে। এ দেশীয় অধ্যাত্মবাদের এটাই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। দেহতত্ত্ব আবার মরমীবাদের প্রধান কথা। কাজেই সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র ইত্যাদি ভারতীয় দর্শন ও আচার শাস্ত্রে মরমীবাদের মূলসূত্র নিহিত।

বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে, ভারতীয় মরমীবাদে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশ্বতত্ত্বের বৈচিত্র্যে, জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে এবং মৌলিক ভাবধারার নতুন সমন্বয়ে ভারতীয় দর্শন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে বেদান্ত দর্শনে।[৫৭]

বেদান্ত দর্শনকে উত্তর-মীমাংসা বা জ্ঞান-মীমাংসা বলা হয়। দৃশ্যজগত ও জীবনের পশ্চাতে বিপুল ও জটিল কর্মকাণ্ডের অন্তরালে যে অদৃশ্য সত্য এবং অত্যন্ত গোপন তত্ত্ব অলক্ষ্যভাবে কাজ করে, বেদান্ত বা উনিষদসমূহে সেই সমস্ত পরাবিদ্যাগত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা অন্বেষণ করা হয়। তবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সন্ধানই উপনিষদের সার কথা।[৫৮]

উপনিষদের দর্শনই বেদান্ত দর্শন। উপনিষদ, ভাগবত গীতা ও ব্রহ্মসূত্র—এ তিনটি বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ। এ তিনটিকে বেদান্ত দর্শনের প্রস্থানত্রয় বলা হয়ে থাকে।[৫৯]

বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে গৌড়পাদ ও শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, মাধবাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈত, বিষ্ণুস্বামী বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, নির্বাকের ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে শংকর ও গৌড়পাদ ব্যতীত সবাই বৈষ্ণব দর্শনের আচার্য।[৬০]

বৈষ্ণব সম্প্রদায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত। মাধবাচার্য প্রবর্তিত মাধ্বী সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায়, রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায় এবং সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার

প্রবর্তিত চতুঃসন সম্প্রদায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধ্বী সমাজের একটি শাখা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৪-১৫৩৩ খ্রি) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। 'বৈষ্ণব বেদান্ত দর্শন' বাংলাদেশেরই বৈষ্ণব দর্শন। এ সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম বৈষ্ণব সহজিয়া।

ভারতীয় চিন্তায় নানা কারণে জড়বাদী ও বস্তুবাদী চিন্তা বিশুদ্ধভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। মধ্যযুগে অর্থাৎ চৈতন্যপূর্ব যুগেই বাংলাদেশসহ সারা ভারতে বুদ্ধিবাদী এবং মরমীবাদী ইসলামী চিন্তাধারার একটি সক্রিয় ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। বৈষ্ণব দর্শনে একটি ঈশ্বরবাদী ধর্মীয় চিন্তা ও মরমী চিন্তার প্রেক্ষিতে বেদ-উপনিষদ দর্শন ও ইসলামী সুফিভাবধারার সমন্বয়, সংশ্লেষণ এবং আত্মীকরণের প্রচেষ্টা হয়।[৬১]

মুসলিম দর্শনে মরমীবাদের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। ইসলামে নিহিত 'মরমীবাদ' বস্তুত 'সুফিবাদ' নামেই পরিচিত। আর ইসলামী সুফিবাদই বিশ্ব-মরমীবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।[৬২]

আভিধানিত অর্থে আরবি 'সুফ' থেকে 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি। সুফ অর্থ পশম। এর নিকটতম শব্দ 'তাসাউফ', যার অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। মরমী তত্ত্বের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার কাজকেও বলা হয় তাসাউফ। এরূপ সাধনায় আত্মসমর্পিত ব্যক্তি ইসলামী পরিভাষায় 'সুফি' নামে অভিহিত।[৬৩]

'সুফি' শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে অন্য মতও আছে। মদিনায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মদিনার মসজিদ সংলগ্ন নির্জন স্থানে অবস্থানরত সংসার-নির্লিপ্ত আল্লাহ-প্রেমিক একদল লোক 'আহলুস সাফফা' নামে পরিচিত হন। এঁদেরই উপর আরোপিত এই 'সাফফা' শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দের উদ্ভব বলে ধরা যায়।[৬৪]

কেউ কেউ 'সাফা' পবিত্রতা শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। গ্রিক ভাষার 'সোফিস্ট' কথাটির পরিবর্তিত রূপ 'সোফিয়া' থেকে সুফি শব্দটি এসেছে বলেও কারো কারো ধারণা।[৬৫]

সুফিবাদের উদ্ভবের মূলে কারণস্বরূপ ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়ে থাকে। কারো কারো মতে নব্যপ্লেটোবাদী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সুফিবাদের উদ্ভবের মূল কারণ। কেউ কেউ বলেন যে, পারসিকদের ভাববাদী চিন্তাধারা থেকেই সুফিবাদের জন্ম। অন্যদিকে আল-কোরআন প্রকৃতপক্ষে সুফিবাদের মূল উৎস — এ ধরনের যুক্তিও উত্থাপিত হতে দেখি।[৬৬]

প্রথম তিনটি কারণ বাহ্যিক এবং চতুর্থ কারণটি অভ্যন্তরীণ। আর এটাই সুফিবাদ উদ্ভবের যথার্থ ও আসল হেতু। পাশ্চাত্যের গবেষকদের মতেও সুফিবাদের শ্রেষ্ঠতম উৎস ঐ মহাপবিত্র গ্রন্থ 'আল-কোরআন'।[৬৭]

উৎপত্তির কারণ যা-ই হোক, সুউচ্চ মরমী আদর্শ সুফিবাদকে খুব শীঘ্র জনপ্রিয় করে তোলে। সুফিবাদের মূলতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে এ কথা জানা যায়। প্রথম পর্যায়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ও দয়াশীলতা অপেক্ষা তাঁর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা দ্বারাই মুসলিম-মানস বেশি অভিভূত ছিল। আল্লাহকে তখন কঠোর স্বৈরাচারী, অন্ধ আনুগত্য আদায়কারী এবং মানুষের অনুভূতি

ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন এক পরাক্রমশালী সত্তা বলে ভাবা হতো। আল্লাহ যেন দূরবর্তী কোনো ভয়ঙ্কর শাসক ও শাস্তিদাতা।[৬৮]

সুফিবাদ মানুষের আবেগাত্মক জীবন থেকে আল্লাহর এ ধরনের দূরবর্তিতা সইতে পারে নি। সুফিবাদই আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেম-সম্পর্ক স্থাপনই সুফিবাদের মূলতত্ত্ব।[৬৯] সুফি রাবেয়া বসরির আল্লাহ-প্রেম এর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।[৭০]

সুফিবাদের প্রথম প্রবক্তা মালিক-বিন-আনাসের শিষ্য প্রখ্যাত মিশরীয় লেখক জুননুন (মৃত্যু ২৪৫ হি.)। তাঁর রচনাবলী সংকলিত ও সম্পাদিত করেন তদীয় শিষ্য জুনায়েদ বাগবাদী (মৃত্যু ৩০৯হি.)। সর্বেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী সুফিদের মধ্যে হোসেন-বিন-মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩০৯ হি.),বায়েজিদ বোস্তামি (মৃত্যু ২৬০ হি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হাসান বসরি (৬৪৩-৭২৮ খ্রি.), রাবেয়া বসরি (৭১৩-৮৮১ খি.), তাস্তারি (মৃত্যু ৮৮৬ খ্রি.) খার্রা (মৃত্যু -৮৯০ খ্রি.), আল-অফজ্জালি (১০৫৮-১১১১ খ্রি.), ইবনুল আরাবি (১১৬৫-১২৪০ খ্রি.), জালালউদ্দীন রুমী (১২০২-১২৭০ খ্রি.), কবি হাফিজ, শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম প্রমুখ স্মরণীয় সুফি ব্যক্তিত্ব।[৭১]

মরমীবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ এই সুফিবাদ। এর গতিও তাই দুর্বার। মরুময় আরব দেশে সুফিবাদের জন্ম। সেখান থেকে এ মতবাদ উপস্থিত হয় গোলাপকুঞ্জময় পারস্যে।[৭২] পারস্যের ধর্মীয় চিন্তায় মরমী ভাবধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুফি সাধকগণের ভূমিকাও সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৭৩] তবে সমকালেই সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফিবাদের প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে এ মতের আগমন, প্রভাব ও প্রসার এ গতিরই একটি স্বাভাবিক পরিণতি।[৭৪]

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদ প্রবেশ করে।[৭৫] অবশ্য আরব-বণিকদের ব্যবসায় সূত্রে ভারতীয় ভূখণ্ডে মুসলিম আগমন অষ্টম শতাব্দীতেই সম্ভব হয়।[৭৬] তথাপি একাদশ শতাব্দীকেই বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সুফি মতবাদ প্রচারের যথার্থ কাল বলে বিদ্বানেরা সাব্যস্ত করেছেন।

সুফিদের মধ্যে শাহ সুলতান রুমী (আগমন ১০৫৩ খ্রি.) বাংলাদেশে ইসলামী মরমীবাদ নিয়ে আসেন।[৭৭] শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সুফি মরমীয়া বাণী বাহকও ইনি।[৭৮] দাক্ষিণাত্যে সৈয়দ বাশার শাহ (তিরোভাব ১০৩৯ খ্রি.) এবং পশ্চিম ভারতে (লাহোরে) দাতা-গঞ্জ-বক্‌শ (তিরোভাব ১০৭২) ইসলামী মরমীবাদের প্রচারক। এ ছাড়া আরো অসংখ্য সুফি সাধকের আগমন-সংবাদ ইতিহাসে আছে। এঁদের মধ্যে বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান মাহী সওয়ার, মখদুম শাহদৌলা শহিদ, মখদুম শাহ মামুদ গজনবি, বায়েজিদ বোস্তামি, শেখ ফরিদ, শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি, শাহ জালাল, শেখ শরফুদ্দিন, আবু তাওয়ামা প্রমুখ বিশেষ স্মরণীয়।[৭৯]

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে সুফিবাদ একটি 'ভাবসংঘ' (স্কুল অব থট) হিসেবে চিশতিয়া সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকাভুক্ত সুফিদের মাধ্যমে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত

বাংলায় তার প্রচারাভিযান জোরদার করে। এদেশে ঐ সময় শংকর-পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র (নবম শতাব্দী), মধুসূদন সরস্বতী, প্রকাশাত্ম যতি (একাদশ শতাব্দী), শ্রীহর্ষ (দ্বাদশ শতাব্দী), মাধবাচার্য (চর্তুদশ শতাব্দী) প্রমুখ দার্শনিক অদ্বৈত দর্শন প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন।[৮০] এছাড়া চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব-দর্শন, বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ, তন্ত্রসাধনা এবং যোগদর্শন-সম্মত দেহতত্ত্ব সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এ সব ভাবধারা বিরাজিত ভূখণ্ডে প্রবেশের আগেই সুফিবাদ এ দেশীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতীয় গ্রন্থের আরবি-ফারসি অনুবাদ, ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষুর সান্নিধ্য, পতঞ্জল যোগ, কপিল, সাংখ্য ইত্যাদি প্রভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পারসিক সুফি বায়েজিদ বোস্তামির ভারতীয় গুরু বু-আলি কলন্দরের ব্যক্তিগত আদর্শের প্রেরণাও এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৮১] এদেশে বিশেষত বাংলায় প্রবেশের পর সহজিয়া সাধনপন্থা দ্বারা সুফিবাদও অভিভূত হতে থাকে। বাংলার সংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদির সাথেও সুফিমতের সম্মিলন ঘটে। সুফিদের আদর্শ, ধ্যানধারণা এবং সাধন-প্রণালীও এদেশের সাধকগণ অবলম্বন করেন। মোট কথা , এ দেশের প্রাণের সাথে আরব-পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে যায়। বিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ 'প্রয়াগ'-ক্ষেত্রে পরিণত হন। কবীরের মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও সুফিবাদী তস্বববফ বা ব্রহ্মবাদ মিলিত হয়। ফলে সুফিরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর ভিতর দিয়ে ভারতীয়দের এবং ভারতীয়রা সুফিদের প্রাণের সন্ধান লাভ করেন।[৮২]

বাংলাদেশে এই সুফিবাদের এক ধারা বৈষ্ণব ভাববাদে এবং অন্য ধারা ইসলামি ভাববাদে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে। প্রথম ধারায় শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈতাচার্য-নিত্যানন্দের প্রভাবে সৃষ্টি হয় সুবিশাল বৈষ্ণব পদাবলি। দ্বিতীয় ধারায় লালন-দুদ্দু ও অন্যান্য মহতের হাতে অজস্র তত্ত্বসঙ্গীত 'বাউল পদাবলি' নামে প্রকাশ পায়।[৮৩]

উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণব পদাবলি চৈতন্য-পূর্ব যুগেও ছিল। তবে চৈতন্যদেবের পদাবলি-প্রীতিতে এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের পদাবলির প্রতি অনুরাগে এ সঙ্গীত-ধারা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। অনুরূপভাবে একটু পরবর্তীকালে বিশেষত শাক্ত পদাবলির সমকালে সৃষ্ট বাউল পদাবলিও লালনের হাতে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এ মরমী সঙ্গীত-ধারা সবগুলোই সুফিবাদের প্রভাবে উজ্জীবিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমত এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন —'একদিকে সিদ্ধাদের চর্যাপদ, অন্যদিকে মরমীয়া বাউল ও বৈষ্ণব সঙ্গীত — সুফিদের প্রভাবে যে বিপ্লব সাধিত হলো, তা থেকে কেউই রক্ষা পেলো না। পরবর্তী অজস্র মারফতি দেহতত্ত্বে তারই লোকায়ত ধারা নানা তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত।'[৮৪]

এই লোকায়ত ধারার 'বাউল পদাবলি' বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভাবগান, শব্দগান, ফকিরিগান ইত্যাদি নামে পরিচিত। যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশের এ মরমী তত্ত্বসঙ্গীতকে বিদ্বানেরা বলেন 'বাউল গান' আর গ্রামের জনসাধারণ বলেন 'ভাবগান'।[৮৫] বৈষ্ণব পদাবলি, পদকর্তা, বৈষ্ণবতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বিদ্বানেরা যেমন গবেষণারত আছেন, বাউল পদাবলি এবং বাউলতত্ত্ব নিয়েও ঠিক তেমনি তাঁরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে

বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মোটামুটি একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেলেও 'বাউল-তত্ত্ব' নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে লালন ও তাঁর অনুসারীদের মত ও পথ এবং সংশ্লিষ্ট ভাবসঙ্গীতে বিধৃত তত্ত্বের শ্রেণীকরণে এ মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবশ্যক।

প্রখ্যাত বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার তাবৎ মরমী সাধককে 'বাউল' বলে অভিহিত করেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের অমুসলিম ভাবসাধকেরাই প্রধানত 'বাউল'—এ কথাও তিনি অকপটে বলে গেছেন। তাঁর ভাষায় 'পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু জাতির এই সব সাধককে সাধারণত বাউল বলা হয়।[৮৬] জনৈক বিদ্বানের মতে নবদ্বীপের নদীয়া বিনোদই (শ্রীচৈতন্যই) হিন্দু বাউলের আধ্যাত্মিক গুরু।[৮৭] যদিও 'বাউল-তত্ত্ব' এবং 'বাউল' শব্দের ব্যবহার চৈতন্য-পূর্ব যুগেও বর্তমান ছিল, তথাপি শ্রীচৈতন্যকে 'বাউল', 'মহাবাউল' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের একাধিক ব্যবহার তার প্রমাণ।[৮৮]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় দর্শন অর্থাৎ 'বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ' এবং 'বাউল দর্শন' অর্থাৎ 'বাউল মতবাদ' — এ উভয়েরই উদগাতা। যাঁরা রাধাকৃষ্ণ — রূপকের মধ্যে (পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে) সাধন-ভজন আবদ্ধ রেখেছেন, তাঁরা বৈষ্ণব সহজিয়া, আর যাঁরা নির্বিচারে 'রূপক ও প্রতীক' গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই বাউল।[৮৯]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয় যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা বজায় রেখে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন,তাঁরা পূর্বোক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া। 'দেহরূপ ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সব তত্ত্ব নিহিত' — তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার এ কথাই বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মূল সাধনতত্ত্ব। তাঁদের মতে এ দেহের ভিতরেই সহজ প্রেমরূপে 'পরমতত্ত্ব' বিরাজ করছে। সহজিয়াদের কাছে প্রেমই পরমার্থ সত্য। প্রেমই জীবনের এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সব বস্তুর 'সহজ স্বরূপ'। এই সহজ বস্তু একান্তই অপ্রাকৃত, সেই অপ্রাকৃত সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ নরনারীর প্রেমে, তারই আবার স্থূলরূপ হচ্ছে 'কাম'। এই প্রাকৃত কাম থেকে নরনারীর পিরিতির ভেতর দিয়ে সেই অপ্রাকৃত 'সহজ প্রেমস্বরূপে' ফিরে যেতে হয়। এটাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনা।[৯০]

বাউল মতবাদ সম্পর্কেও এ জাতীয় কথা আছে। চৈতন্যদেব একটি গুহ্য সাধন-প্রণালী অবহিত ছিলেন। এটি মূলত নারী-পুরুষের মিলনজাত সাধনা। পূর্ববর্ণিত তন্ত্রে একে মিথুন তত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সহজিয়া মতে একে পরকিয়া প্রেম বলা হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, জীবগোস্বামী, রূপ-সনাতন প্রমুখ এ তত্ত্ব জানতেন। ভক্তমধ্যে এই পরকিয়া তত্ত্ব প্রচারাভিলাষে চৈতন্যদেব নিজেই 'আউলচাঁদ' রূপে পুনরাবির্ভূত হন বলে কথিত আছে। উক্ত আউলচাঁদের শিষ্য রাম শরণ। এঁরই পুত্র দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আউলচাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত। অন্যদিকে আউলচাঁদের শিষ্য মাধব বিবি এবং মাধম বিবির শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র পূর্বোক্ত পরকিয়া সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। এটাই বাউল সাধনা বা বাউলতত্ত্ব। এ তথ্য অনুসারে চৈতন্যদেবই প্রকৃত 'বাউলতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠাতা।[৯১]

এ প্রসঙ্গে সুফিদের কথা আরো একটু স্মরণ করা দরকার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুফিবাদ একটি ভাবসংঘ হিসেবে বাংলার সর্বত্র চালু হয় — এ কথা আগেই বলেছি। চৈতন্যদেবের (১৪৮৪-১৫৩৩) জন্মের আগেই সুফি সাধকদের খানকা ও আস্তানায় বাংলাদেশের সর্বত্র ভরে যায়। আজমিরে আগত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪২-১২৩৬) এবং বাংলায় আগত চিশতিয়া অনুসারী শেখ আবদুল্লাহ্ কিরমানী, শেখ আখি সিরাজুদ্দিন, আলাউল হক প্রমুখ সাধক এ দেশে গজল ও সামা সঙ্গীতধারা চালু করেন।[৯২] এ সকল সুফির খানকায় বা আস্তানায় জিকির এবং অধ্যাত্ম সঙ্গীত ছিল সাধনার মাধ্যম। সঙ্গীত যেমন সুফিদের (বিশেষত চিশতিয়া খান্দানী ফকিরদের) সাধনার অঙ্গ, তেমনি আবার ভারতীয় দর্শনসম্মত যোগাচারভিত্তিক দেহতত্ত্ব সাধনাও তাঁরা নির্বিবাদে নিজেদের সাধনায় যুক্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত বহিরাগত কোনো জাতি দ্রাবিড়, আর্য এবং উত্তরকালের মুসলমান কেউই যোগ-প্রভাব অস্বীকার করতে পারে নি। এ সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকই একমত।[৯৩]

প্রাচীন চার্বাক লোকায়ত দর্শনে সাংখ্য ও যোগ যেমন স্বীকৃত হয়েছে, মুসলমান সুফিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী দরবেশীমতের সাধন-ধারাতেও এ সব দর্শনের দেহতত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় সাধনা গৃহীত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় 'অমৃতকুণ্ড'নামক একখানা যোগতাত্ত্বিক সংস্কৃত গ্রন্থের আরবি-ফারসি অনুবাদ মুসলিম সুফিদেরকে যোগতত্ত্বে আকৃষ্ট করে।[৯৪] এ ছাড়া বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব, বাউলদের মিথুনতত্ত্ব ইত্যাদিও সুফিরা অস্বীকার করেন নি। কেননা এসব তত্ত্ব মুসলিম বিশ্বাসের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যহীন নয়। যেমন মিথুনতত্ত্ব মুসলমানদের 'আদম-হাওয়া' তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।[৯৫] অধ্যাত্ম সাধনার অন্যান্য বিষয়েও সুফি, বাউল এবং বৈষ্ণব অনেকটা একাত্ম। বৈষ্ণব-বাউল তত্ত্বের 'উপাসনা' হচ্ছে সুফিদের 'এবাদত'। তেমনি নামজপ—জিকির, দেহতত্ত্ব—অজুদতত্ত্ব, ষটচক্র — ছয় লতিফা, দশা — হাল, শ্বাসক্রিয়া (ন্যাসকুম্ভক) — দমের বন্দেগি, হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা — ফেরেশতা প্রহরী, প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধি—রাবিতা-মুরাকিবা-ফানাফিল্লাহ্, গুরু —পির (মুরাশিদ) ইত্যাদি স্বীকরণ ও সাজুয্য লক্ষণীয় বিষয়। দ্বিরুক্তি হলেও বলতে হয় যে, সুফি-বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল প্রভৃতি সব মরমী সাধকই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভের ভিত্তি হিসেবে দেহতত্ত্ব সাধনাকে মূল অবলম্বন বলে ধরে নিয়েছেন। এরই দার্শনিক নাম 'যোগ'।

মুসলিম বিজয়ের পর ভারতীয় সুফিমতের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে এই 'যোগ'। যোগই মূলত অধ্যাত্ম সাধনার তথা মরমীবাদের প্রকৃত ভিত্তি। বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, হিন্দু শৈব-শাক্ত, মুসলিম সুফি ও বাউলদের মধ্যে আজো তা বিরল নয়।[৯৬] বাংলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, গোর্খ-সংহিতায়, যোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনীল পূরাণে, বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলে, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপবর্ণনে, যোগ-চিন্তামণি, বাউল গান প্রভৃতি গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথাই পাই। মুসলমান কবিদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজি মুহম্মদ, আলাওল, শেখ জাহিদ, শেখ আবদুল হাকিম, শেখ চাঁদ, যোগকলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলিরজা, শুকুর মামুদ, রমজান আলী, রহিমুদ্দিন মুনশি প্রভৃতিকেও যোগ-পদ্ধতির মহিমা কীর্তনে মুখর দেখি।[৯৭]

এ সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন দর্শন ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা যা নির্ণয় করতে চেয়েছি, তা হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য মরমী কবি খোদা বকশ শাহের কাব্যচিন্তা ও কবিমানস ধারা নির্ণয়। এ বিষয়ে কবির নিজস্ব বক্তব্য, সমালোচকদের মতামত এবং আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) যৌথভাবে কার্যকর হতে পারে।

কবির কাব্যগীতি পাঠ করে যা জানা যায়, তাতে কবিকে মানবতাবাদী , সমন্বয়বাদী এবং ভাববাদী সাধক বলেই মনে হয়। গুরুবাদী দেহতত্ত্ব সাধক হিসেবেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। মরমী কবি লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, জহরদ্দী শাহ, লাল শশী, হাউড়ে গোঁসাই, যাদুবিন্দু, কাঙাল হরিনাথ প্রমুখ সাধক যে তাঁর পূর্বসুরি, তাঁর রচনা , জীবনধারা এবং দর্শন–চিন্তা পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়। তবে সবচেয়ে যে কথাটি সত্য, তা হচ্ছে এই যে, খোদা বকশ শাহ ছিলেন শুকচাঁদ শাহের শিষ্য। শুকচাঁদ শাহ ছিলেন হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের শিষ্য। এই খোদা বকশ ছিলেন লালন শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহের সাক্ষাৎ অনুসারী। এ হিসেবে খোদা বকশ শাহ লালন–ঘরানা অনুসারী মরমী সাধক। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই কবির জীবন, দর্শন, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে চাই।

তথ্যনির্দেশ

১. Sailendra Biswas (Compiled), Subodhchandra Sengupta, Sudhangshu Kumar Sengupta (Revised), Samsad English-Bengali Dictionary, Fourth Edition, Reprinted, Sahitya Samsad, Calcutta, 1979, Page-712.

২. Encyclopaedia Britanica, 1973-1974, Vol. VII, 15th Edition, William Benton Publisher, Chicago & London, Page 153.

৩. কাজী আবদুল ওদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ,. প্রথম সংস্করণ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলিকাতা, প্রকাশকাল অনুক্ত, পৃ. ৭৮৩।

৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত), বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৬৯।

৫. আশুতোষ দেব, ছাত্রবোধ অভিধান, প্রথম সংস্করণ, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২।

৬. গোলাম মোস্তফা, আমার চিন্তাধারা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১২৯

৭. আমিনুল ইসলাম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ,১৯৮১, পৃ. ৩৭৪।

৮. Syed Ali Ahsan, Songs of Lalon Shah (Abu Rushd tr), First Edition, Bangla Academy, Dhaka, 1964, Page–Preface.

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, বাংলাদেশ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, মিতা পাবলিকেশন, বরিশাল, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০, গান নং ১৪৯।

১০. যোগেশচন্দ্র সিংহ, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, সিগনেট লাইব্রেরি, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ১৯৮।

১১. মোহাম্মদ আবদুল করিম, এরশাদে খালেকিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, রুবি বুক হাউস, যশোর, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬৬—২৭০.

১২. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ১৬২–৬৩।

১৩. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Eighth Impression, George Allen and Unwin Ltd. London, 1962, Page 64.

১৪. আল–কোরআন, সুরা বাকারা, ১৫৬ আয়াত।

১৫. গোলাম রসুল, বিশ্ব মরমী চিন্তাধারায় রুমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৯।

১৬. R. A. Nicholson, Rumi Poet and Mystic, Revised Edition, Allen and Unwin Ltd, London, 1950.

১৭. সাইদুর রহমান, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৮।

১৮. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, প্রথম সংস্করণ, মহসীন এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ১৭।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২০. Margaret Smith, Readings From the Mystics of Islam, First Edition, Luzac & Company Ltd. London, 1950, Page 1.

২১. D. P. Chattopadhya, Lokayata, A Study in Ancient Indian Materalism, Second Edition, People's Publishing House, New Delhi, 1959, Page 13.

২২. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত), বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৪৮।

২৩. শরীফ হারুন, দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, প্রথম প্রকাশ, উচ্চারণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৪।

২৪. Radhakrishnan, Religion & Society, Fifth Impression, George Allen and Unwin Ltd. London, 1966, Page 104.

২৫. Bhagavan Das, Essential Unity of All Religions, Fifth Edition, The Theosophical Publishinng House, Madras, 1955, Page XV.

২৬. অর্জুন বিকাশ চৌধুরী, ভারতীয় দর্শন, তৃতীয় সংস্করণ, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ . ২৪

২৭. অর্জুন বিকাশ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ . ৪।

২৮. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩,পৃ. ১১০।

৩০. শরীফ হারুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩১. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫।

৩২. ধর্ম্মপাল ভিক্ষু, সধর্ম্ম রত্নমালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

৩৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), মাধবাচার্য বিরচিত সর্বদর্শন সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮৫৮. পৃ. ৮।

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জীবনী সংগ্রহ, অষ্টম সংস্করণ, চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১–৪২।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩৬–৩৭।

৩৮. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩৯. শরীফ হারুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
৪০. প্রাগুক্ত।
৪১. S. N. Dasgupta, History of Indian Philospohy, Vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain, 1922, Page 451-452.
৪২. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, দশম সংস্করণ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৯৬।
৪৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।
৪৪. গীতা, ৩/৩।
৪৫. গীতা, ৫/৫।
৪৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
৪৭. K. S. Joshi, On the Meaning of Youga Philosophy East & West, (Journal of Oriental and Comparative Thought), XV, No. 1, January, 1965, Page 54.
৪৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
৪৯. শ্বেতাশ্বর, ২/৬–৭, ২/১৫, কঠ, ৬/৩ ইত্যাদি।
৫০. বৃহদারণ্যক, ৪/৪/৫, ৩/৭/১৪।
৫১. ছান্দোগ্য, ৬/৮/৭।
৫২. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1. George Allen & Unwin Ltd. London, Page 271.
৫৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৮–২৮৪।
৫৪. প্রাগুক্ত।
৫৫. বৃহদারণ্যক, ১/৪/১—৫।
৫৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫।
৫৭. রামেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।
৫৮. বিধুশেখর ভট্টাচার্য, উপনিষদ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ. ৯–১০।
৫৯. প্রাগুক্ত।
৬০. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রগুক্ত , পৃ. ৪০০।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০—৪০১।
৬২ বাংলা বিশ্বকোষ, পৃ. ৬৪৮।
৬৩. আবদুল হক ফরিদী প্রমুখ (সম্পাদিত), সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা , ১৯৮২, পৃ. ৪৯৪।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।
৬৬. সাইদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
৬৭. R. A. Nicholson, The Idea of Personality in Sufism, Fisrt Edition, Cambridge University Press, London, 1923, Page 3, 4, 37.
৬৮. কেনেথ ডব্লিউ মরগান (সম্পাদিত) , ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, মুয়াযযম হুসায়ন খান প্রমুখ (অনূদিত), দ্বিতীয় প্রকাশ, মদিনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ . ১৬০–১৬৭।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

৭০. সাঈদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ . ঐ।
৭১. আহমদ শরীফ,বাংলার সূফী সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ভূমিকা–ঘ।
৭২. Mary Boyce, Zoroastrians, First Edition, Routlege & Kegan Paul, London, 1979, Page 150-51.
৭৩. J. A. Boyle (Edited), The Cambridge History of Iran, Vol. 5, First Edition, Syndics of the Cambridge University Press, London, 1968 , Page 451.
৭৪. Ibid.
৭৫. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৭৬. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪০–৪৯।
৭৭. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৭৮. Shashibhusan Dasgupta, Obscure Religious Cults, Reprinted, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1976, Page 167.
৭৯. মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮–১১৫।
৮০. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮–৪৫।
৮১. R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, Ibid, Page 17.
৮২. মুহন্দ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮—৪৫।
৮৩. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৭৮।
৮৪. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভলিউম নং ১৪, ১৯৪৮, পৃ. ৫০।
৮৫. খোন্দকার রফিউদ্দীন (সম্পাদিত), মহত পদাবলী, প্রথম সংস্করণ, সম্পাদক– প্রকাশিত, যশোর, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ভূমিকা।
৮৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রথম সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৫৩।
৮৭. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারমণি, দ্বিতীয় খণ্ড,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ২৪।
৮৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), লঘু সংস্করণ, সাহিত্য আকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৬৩, পৃ. ৬০৫।
৮৯. আহমদ শরীফ, বাউল তত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪১।
৯০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০–৪১।
৯১. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।
৯২. মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
৯৩. S. Radhakrishnan, History of Philosophy Eastern and Western, Third Impression, George Allen & Unwin, London, 1967, Page 240-256.
৯৪. মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।
৯৫. আবি আদুল্লাহ, প্রসঙ্গ : সংস্কৃতি আর্য বনাম অনার্য, প্রথম প্রকাশ, সাফা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ . ১৬৯।
৯৬. আহমদ শরীফ, বাংলার সূফী সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ, ভূমিকা —স।
৯৭. প্রাগুক্ত।

খোদা বকশ শাহের জীবন-কথা

লালন-ঘরানার যে সব সাধক লালন-সঙ্গীত জনপ্রিয় করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, খোদা বকশ শাহ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমূল্য শাহ, বেহাল শাহ, শুকচাঁদ শাহ প্রমুখের পরেই যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে আসে, তিনি খোদা বকশ শাহ। লালন-সঙ্গীতের মৌলিক ধারাটি তিনি ধরে রেখেছিলেন। এই মহান সাধকের জীবন-কথা উপস্থাপন তাই অতি জরুরি।

খোদা বকশ শাহের আসল নাম খোদা বকশ বিশ্বাস। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ কফিলউদ্দিন বিশ্বাস। 'বিশ্বাস' হচ্ছে তাঁদের বংশগত পদবি। ফকিরি পোশাক (খেরকা-খেলাফত) ধারণের পর খোদা বকশ বিশ্বাসের নাম হয় 'খোদা বকশ শাহ'।[১]

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার কররাজাহাপুর গ্রামে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের (১৯২৮ খ্রি:) ৩০ চৈত্র এই মরমী কবির জন্ম হয়। কররাজাহাপুরের পার্শ্ববর্তী ঘোলদাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যায়।[২]

সে সময় জাহাপুর ও পার্শ্ববর্তী আইলহাস-লক্ষ্মীপুর এবং ঘোলদাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকটি যাত্রাদল ছিল। বালক খোদা বকশ এই সব যাত্রাদলের অভিনয় ও গানে আকৃষ্ট হন। তিনি যাত্রাদলে যোগ দেন। তাঁর ছিল অসাধারাণ সুরেলা কণ্ঠ। তিনি প্রথমে ছোট-খাট অভিনয় করতেন। পরে বিবেকের ভূমিকায় বিবেক-সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যাত্রাদলে তাঁর সঙ্গীত-জীবন অতিবাহিত হয়।[৩] সতেরো বছর বয়সে খোদা বকশ ভাবসঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

আলমডাঙ্গা থানার পাশেই ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানা। এ থানার চটকাবাড়িয়া গ্রামে ছিল পূর্বোক্ত মরমী সাধক শুকচাঁদ শাহের বাড়ি। শুকচাঁদ শাহের গান শুনে খোদা বকশ মুগ্ধ হন। তিনি শুকচাঁদ শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী এই শিষ্যকে যথার্থ শিল্পী রূপে গড়ে তোলার জন্যে শুকচাঁদেরও আগ্রহ জন্মে। তিনি তাঁর সঙ্গীত-গরু অমূল্য শাহের আখড়ায় খোদা বকশকে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গীত-পিপাসু খোদা বকশকে পেয়ে অমূল্য শাহ খুশি হন। নিজের আশ্রয়ে রেখে তিনি তাঁকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন।[৪]

উল্লেখযোগ্য যে, লালন-সঙ্গীতের যে জনপ্রিয় ধারা উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রবাহিত হয়, অমূল্য শাহ সে ধারার স্রষ্টা ও প্রধান পুরুষ। পূর্বে লালন-সঙ্গীত ও অন্যান্য ভাবসঙ্গীত মরমী সাধকের আখড়ায় সীমাবদ্ধ ছিল। একতারা বাজিয়ে সাধকগণ ভক্তদের মজলিশে এ গান পরিবেশন করতেন। ভাবসঙ্গীত তখন কেবল সাধন-সঙ্গীত ও তত্ত্বগীতি হিসেবে বিবেচিত হতো। তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ ও তাঁদের শিষ্যরা ছিলেন এ সঙ্গীতের শ্রোতা ও সমঝদার। জনসাধারণ এ গানের বহিরঙ্গ কিংবা অন্তরঙ্গ মর্ম অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন না। তাঁদের কাছে এর মর্মার্থ পৌঁছে দেবার জন্যে সাধক শিল্পীদেরও কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নি। মোটকথা, তখন ভাবসঙ্গীত ছিল তত্ত্বকথার

বাহন। এর সাংগীতিক মূল্য কিংবা সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা তেমন ছিল না। শুধুই সঙ্গীত হিসেবে এ সঙ্গীতকে গণমনে পৌঁছে দেবার মতো যোগ্য কণ্ঠশিল্পীরও অভাব ছিল । অমূল্য শাহ সে অভাব পূরণ করেন। খোদা বকশ এই অমূল্য শাহের সঙ্গীত-শিষ্য হয়ে যান। অমূল্যও খোদা বকশকে সার্থক ভাবসঙ্গীত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বদ্ধপরিকর হন।

খোদা বকশ তাঁর প্রবল গ্রহণ-ক্ষমতা গুণে শীঘ্রই অমূল্য শাহের প্রিয় সাগরেদ হয়ে ওঠেন। অমূল্য শাহ দিনরাত পরিশ্রম করে খোদা বকশকে প্রশিক্ষণ দান করতে থাকেন। অতি অল্প সময়ে খোদা বকশ ভাবসঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।

কণ্ঠসঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা লাভের চরম মুহূর্তে গুরুর আদেশে খোদা বকশকে সংসার -জীবনে প্রবেশ করতে হয়। রাহেলা খাতুন নামে এক মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন। এ মহিলার সহযোগিতা ও সমমর্মীতা খোদা বকশের জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। জাহাপুর গ্রামে পৈত্রিক বাস্তুভিটায় খোদা বকশ একটি সাধনপীঠ গড়ে তোলেন। গুরু শুকচাঁদ থেকে প্রাপ্ত সাধনতত্ত্ব অনুসারে একটি নির্জন হুজরাখানায় তিনি সাধনা করতেন। এ সাধনা মূলত লালন-ঘরানা অনুসারী ফকিরি সাধনা। নির্জন হুজরাখানা ছেড়ে কখনো কখনো তিনি আখড়া প্রঙ্গণে দণ্ডায়মান কামিনি গাছের নিচে বসেও সাধনা করতেন। ভাবের উদয় হলে একতারা-বায়া বাজিয়ে লালন-দুদ্দু-পাঞ্জুর গান গাইতেন। সাধুসেবায় (ফকিরি মজলিশে) আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন গ্রামে যেতেন। ঐ সব সাধুসেবায় তিনি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। বেহাল শাহ, গহোর শাহ ,রসিক শাহ, লায়লা বেগম প্রমুখ সাধক তাঁর প্রতিপক্ষরূপে গান করতেন। তাঁর ভরাট কণ্ঠ এবং অপূর্ব পরিবেশন-ক্ষমতা হাজার হাজার শ্রোতাকে মুগ্ধ করতো।[৫]

খোদা বকশ শাহ একশত চারজন মহতের গান জানতেন। লালন-সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রধান বিষয়। প্রায় পাঁচশত লালন-সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এ ছাড়া দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, জহরদ্দি শাহ, গোপাল শাহ, বাউল শাহ, অনন্ত গোস্বামী, রাজকৃষ্ণ খ্যাপা, গোবীন গোঁসাই, রামলাল গোস্বামী, গোঁসাই গোপাল, রাধার শ্যাম, লাল শশী, কুবীর গোঁসাই, যাদুবিন্দু, হাউড়ে গোঁসাই, জাহ্নবী, মফিজুদ্দিন, কাজেম শাহ, হাতেম শাহ, অমূল্য শাহ, বেহাল শাহ, শুকচাঁদ শাহ, পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস, কালু শাহ, আহসান আলী প্রমুখের গানও তিনি জানতেন। খোদা বকশের সঙ্গীত সংগ্রহ এবং আয়ত্ত করার দক্ষতা দেখে লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ তাঁকে 'সঙ্গীতসাগর' উপাধিতে ভূষিত করে। স্মরণ করা যায় যে, ১৯৭৪ সালে ঢাকায় লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই খোদা বকশ এ পরিষদের সঙ্গীত-উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লালন-জন্মভূমি হরিশপুর গ্রামে 'পাঞ্জু শাহ সেবা-সংস্কৃতি সংঘ' গঠিত হবার পর এ সংস্থায়ও তিনি অন্যতম উপদেষ্টারূপে কাজ করেন।[৬]

উল্লেখ্য, হরিশপুর গ্রামের সঙ্গে খোদা বকশের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। হরিশপুরের স্বনামধন্য মরমী সাধক পাঞ্জু শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীনকে খোদা বকশ খুব শ্রদ্ধা করতেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত সাধুসেবায় রফিউদ্দীনের সহযাত্রীরূপে তাঁর যোগদান ছিল সাধারণ ব্যাপার। 'খোদা বকশ না থাকলে সাধুসেবা পূর্ণাঙ্গ হয় না'— রফিউদ্দীন অনেক সময় এ রকম মন্তব্য করতেন।

কুষ্টিয়ার লালন-মাজারে বছরে দু-বার সাধুসেবা হয়। সাধুসেবা দুটি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১ কার্তিক (লালন-মৃত্যুবার্ষিকী) এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (দোল পূর্ণিমায়)। দুটি অনুষ্ঠানেই খোদা বকশ হাজির থাকতেন। এ ছাড়া লালন-মাজারে অনুষ্ঠিত অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

১৯৭৬ সালে খোদা বকশ ফকিরি পোশাক (খেরকা-খেলাফত) গ্রহণ করেন। তাঁর ফকিরি পোশাক গ্রহণ উপলক্ষে তাঁর আখড়া-বাড়িতে অসংখ্য ফকির-দরবেশের সমাবেশ হয়। ঐ দিন থেকে তিনি সাধক খোদা বকশ শাহ রূপে পরিচিত হন।[৭]

১৯৮৩ সালের ৯ জুন খোদা বকশ শাহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে যোগদান করেন।[৮] এখানে তাঁকে লালন-সঙ্গীতের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়। ঢাকাস্থ শিল্পীদের লালন-সঙ্গীত প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ওপর। অল্পদিনেই তাঁর যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। অনেক ছাত্রছাত্রী তাঁর প্রশিক্ষণে লালন-সঙ্গীত রপ্ত করতে শুরু করেন। এ সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চন্দনা মজুমদার, মনোয়ারা বেগম, কাননবালা সরকার প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময় লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ-পরিচালিত লালন-সঙ্গীত একাডেমীতেও খোদা বকশ সঙ্গীত-প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। লালন পরিষদের শিল্পী পান্না বিশ্বাস, দিল আফরোজ রেবা, অঞ্জু জোয়ার্দার প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে লালন-সঙ্গীতে তালিম নেন। ঢাকায় এসে খোদা বকশ শাহ প্রথমে পাঞ্জু শাহ সেবা-সংস্কৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার খায়রুল আনামের বাসভবনে অবস্থান করেন। পরে তিন-চার বছর তিনি শিল্পী চন্দনা মজুমদারের পিতা নির্মল মজুমদারের বাসায় থাকেন। এখানে তিনি বেশ সুখেই ছিলেন।[৯]

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত-শিক্ষক থাকাকালে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সুধীন দাশের সঙ্গে খোদা বকশ শাহের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। সুধীন দাশ খোদা বকশের কণ্ঠে প্রায় দু'শো লালন-সঙ্গীত রেকর্ড করেন। টেপে ধারণকৃত এ গানগুলোর সুর থেকে সুধীন দাশ প্রস্তুত করেন লালন-সঙ্গীতের স্বরলিপি। খোদা বকশ শাহের সংগৃহীত এবং তাঁর কণ্ঠে গীত পঁচিশটি লালন-সঙ্গীতের স্বরপিপি লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক ঢাকা থেকে ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লালন পরিষদের সভাপতি হিসেবে উক্ত 'লালন সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ' সম্পাদনার ভার পড়ে আমার ওপর। আমি নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। স্বরলিপিকর হিসেবে সুধীন দাশের নাম এবং সঙ্গীত-সংগ্রাহক ও কণ্ঠদাতা হিসেবে খোদা বকশ শাহের নাম গ্রন্থের শিরোনাম-পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।[১০]

১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী খোদা বকশ শাহকে বাংলা একাডেমীর 'ফেলো' পদ প্রদান করে।[১১] আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদ প্রদান করা হয়। তখন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা। বাংলা একাডেমীর বটমূলে অনুষ্ঠিত উক্ত 'ফেল'-পদ-প্রদান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী। বাংলা একাডেমীর এ স্বীকৃতিতে খোদা বকশের জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। দেশে-বিদেশে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পায়। ঠিক এ সময়েই তিনি বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত লালন-

সঙ্গীত শিল্পীরূপে স্বীকৃতি পান। ঐ দুই প্রচার-মাধ্যম থেকে তাঁর কণ্ঠে বহুসংখ্যক লালন-সঙ্গীত পরিবেশিত হতে থাকে। বিভিন্ন মঞ্চ অনুষ্ঠানেও তাঁকে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতে দেখা যায়। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লালন-সঙ্গীত বিশারদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮৬ সালের শেষ দিকে খোদা বকশ শাহ হৃদরোগে আক্রান্ত হন।[১২] ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে। এ সময় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডমীর পরিচালক ওস্তাদ ওমর ফারুকের প্রচেষ্টায় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্যে অর্থ বরাদ্দ হয়। কিছু দিন পর তিনি অনেকটা সুস্থ হন এবং ডাক্তারদের পরামর্শে গ্রামের আখড়ায় গিয়ে বাস করতে থাকেন।[১৩] আরো একটু সুস্থ হবার পর তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর কাজে আবার যোগদান করেন। নির্মল মজুমদারের বাসায় পূর্বের মতো তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এখানে তিনি বেশ যত্নেই ছিলেন। কিন্তু দেহ-মন তাঁর আর চলতে চাইছিল না। এদিকে তাঁর চাকুরির মেয়াদও শেষ হয়ে আসে। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চাকুরি ছেড়ে নিজস্ব আখড়ায় চলে যান।[১৩]

এরপর কয়েকবার তিনি ঢাকায় আসেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঢাকায় থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কররাজাহাপুরের আখড়ায় তাঁর দিন কাটতে থাকে। চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর ইত্যাদি শহরের কয়েকজন ডাক্তারের কাছেও তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তবে শরীর তাঁর আর সুস্থ হয় না। এ সময় মাঝে মাঝে দু-একটি সাধুসেবায় তিনি যেতেন, কিন্তু গান গাইতেন না। খুব বেশি অনুরোধ এলে একটি মাত্র গান পরিবেশন করতেন।

১৯৮৯ সালের শেষ দিকে খোদা বকশ শাহ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলা-হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে।[১৪] অর্থাভাবে ঢাকায় এসে চিকিৎসা হবার মতো সুযোগ তাঁর আর হয় না। পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসুস্থতার খবর পরিবেশিত হতে থাকে। কিন্তু সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো সংস্থা তাঁর চিকিৎসার জন্যে সহযোগিতার হাত বাড়ায় নি। অবশেষে ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি) ১ মাঘ খোদা বকশ শাহ ইহলোক ত্যাগ করেন।[১৫] শেষ বিদায়ের সময় তাঁর স্ত্রী রাহেলা খাতুন, পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাস এবং কন্যা মালঞ্চ তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। নিজস্ব আখড়াবাড়ির প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিরোধানের পর দেশের নানা সংস্থা খোদা বকশ শাহের মূল্যায়নের চেষ্টা করে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯১ সালে খোদা বকশকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত সংগ্রহের উদ্যোগ গৃহীত হয়। তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে বিভিন্ন সঙ্গীতাসরে আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকে। খোদা বকশের গুণ-গরিমার কথা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

খোদা বকশ শাহ আজ আর ইহজগতে নেই। তিনি এখন পরলোকের বাসিন্দা। তিনি না থাকলেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানবিক গুণাবলী তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়ে গেছে।

খোদা বকশ শাহ ছিলেন অসাধারণ বিনয়ী এবং কোমল স্বভাবের অধিকারী। মিষ্টভাষী, সদালাপী, সত্যবাদী এই সাধক আজো কিংবদন্তির নায়ক হয়ে আছেন তাঁর এলাকায়। মাত্র ৬২ বছর তাঁর জীবনকাল। এরই মধ্যে তিনি যে সব সঙ্গীতবাণী দান করে গেছেন, তা থেকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। লালন শাহী ঘরানার ভাবগীতিকার হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন একদিন হবেই—এ আশা করতে পারি অনায়াসে। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর শতাধিক সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। এতে তাঁর প্রতিভার কিছুটা পরিচয় মিলবে। আগামী প্রজন্মের গবেষকগণ তাঁর জীবন ও সঙ্গীত নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করবেন বলে মনে করি।

তথ্যনির্দেশ

১. নিজস্ব সংগ্রহ, কথক—আবদুল মালেক বিশ্বাস, পিতা—হুজুর আলী বিশ্বাস, বয়স ৮৫ বছর, গ্রাম-কররাজাহাপুর, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা। তথ্য-সরবরাহ তারিখ ১৫. ৩. ৯৫।

২. কবির জন্ম-তারিখ, লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য কবির সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ, ঢাকা, ১০. ২. ৮৫।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) ভিত্তিক তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ১৫. ৩. ৯৫।

৬. নিজস্ব সংগ্রহ, কথক—খোন্দকার খায়রুল আনাম, পিতা-খোন্দকার রইচউদ্দিন, গ্রাম-হরিশপুর, থানা-হরিণাকুণ্ডু, জেলা-ঝিনাইদহ, বয়স ৬১, পেশা-চাকুরি, তথ্য-সরবরাহ তারিখ, ঢাকা, ১৮. ৫. ৯৫।

৭. খোদা বকশের ফকিরি পোশাক ধারণের তথ্য সরবরাহ করেছেন খোদা বকশ-পত্নী রাহেলা খাতুন, তথ্য-সরবরাহ তারিখ ১৫. ৩. ৯৫।

৮. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নথিপত্র থেকে এ তথ্য সংগৃহীত। তাং ৩০. ৬. ৯৬।

৯. শিল্পী চন্দনা মজুমদারের পিতা নির্মল মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ৬. ৮. ৯৫।

১০. লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'লালন সঙ্গীত স্বরলিপি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ.২।

১১. বাংলা একাডেমীর রেকর্ডপত্র থেকে এ তথ্য সংগৃহীত, তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ১০. ৬. ৯৬, তথ্য সরবরাহ করেন বাংলা একাডেমীর পরিষদ উপবিভাগের উপপরিচালক আবদুল হান্নান ঠাকুর।

১২. খোদা বকশ শাহ যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রউফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

১৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর রেকর্ডপত্র ঘেটে এ তথ্য সংগৃহীত। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ৩০. ৬. ৯৬।

১৪. বর্তমান গ্রন্থকার ১৯৮৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর হরিণাকুণ্ডু (ঝিনাইদহ) নিবাসী বিশিষ্ট কবি, শিক্ষাবিদ ও ফোকলোর সংগ্রাহক মোহাম্মদ খোদা বকশকে নিয়ে মোটর সাইকেলযোগে কররাজাহাপুরে খোদা বকশ শাহকে দেখাতে যান। খোদা বকশ শাহ তখন ফরিদপুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ফলে তাঁর সাথে গ্রন্থকারের ঐ দিন দেখা হয় নি।

১৫. খোদা বকশ শাহের পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সৌজন্যে এ তথ্য সংগৃহীত। কবির মৃত্যু-সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

খোদা বকশের দীক্ষাগুরু শুকচাঁদ শাহ

মরমী কবি খোদা বকশ শাহের গুরু শুকচাঁদ শাহ। লালন-সঙ্গীত ও অন্যান্য মরমী গানের জগতে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় সঙ্গীতসাধক মহলে আজো তাঁর কথা শোনা যায়।

শুকচাঁদ শাহ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খ্রি.) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার চটকাবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] চটকাবাড়িয়া গ্রামটি হরিণাকুণ্ডু থানা-পরিষদ কার্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বসংলগ্ন। থানা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন থেকে দশ-পনরো (হাটা পথে) মিনিটের রাস্তা পাড়ি দিলে শুকচাঁদ শাহের আখড়ায় পৌঁছনো যায়।[২]

শুকচাঁদ শাহের পিতা শীতল মণ্ডল চটকাবাড়িয়ার একজন বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর চার পুত্র। এঁদের নাম যথাক্রমে খোশাল মণ্ডল, ধতু বিশ্বাস, আবাদান মণ্ডল এবং শুকচাঁদ শাহ। শুকচাঁদ শাহের বাল্য নাম ছিল শুকুর মণ্ডল। ফকিরি মত গ্রহণ করার পর তিনি শুকচাঁদ শাহ নামে অভিহিত হন।[৩]

শুকচাঁদ বাল্যকালে কোনো বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পান নি। মাঠের কাজে ভাইদের সহায়তা এবং গোচারণ করেই তাঁর দিন কাটে। কাজের অবসরে শিক্ষিত প্রতিবেশীদের কাছে যাতায়াত করে তিনি সামান্য লেখাপড়া শেখেন। তথাপি কৃষিকাজই ছিল তাঁর পেশা।

কৈশোরের শেষভাগে শুকচাঁদ শাহের বিয়ে হয়। কুষ্টিয়া জেলার সুগ্রীবপুর-মধুপুর (হরিণারায়নপুরের নিকট) নিবাসী হারাধন মণ্ডলের কন্যা শাহারণ নেছা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই মহিলার চেহারা ছিল কালো। এ জন্যে শুকচাঁদ তাঁর নাম রাখেন কালিদাসী। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত ভাবসঙ্গীত শিল্পী কালিদাসী (আইলচারা, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া) থেকে এ কালিদাসী আলাদা। শিল্পী কালিদাসী ভাবসঙ্গীত-শিল্পী অমূল্য শাহের সঙ্গে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁকে আইলচারার 'দাসী' বলা হতো। শুকচাঁদ-পত্নী কালিদাসীর কোনো সন্তান হয় না। শুকচাঁদ তখন রঙ্গনেছা নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মহিলা এক সন্তানের জননী হন। এঁর নাম দুখী মামুদ। গ্রামের লোকেরা তাঁকে দুখী শাহ বলে ডাকে।

স্মরণ করা যায় যে, প্রখ্যাত ভাবসঙ্গীত শিল্পী অমূল্য শাহ ভাবসঙ্গীত পরিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই আসতেন হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে। হরিশপুরের আলীম শাহ ছিলেন অমূল্য শাহের নিকট আত্মীয়। আলীম শাহের আখড়ায় অনুষ্ঠিত এ রকম একটি ভাবসঙ্গীতের আসরে অমূল্য শাহের গান শুনে শুকচাঁদ মুগ্ধ হন।[৪] ভাবসঙ্গীতের শিল্পী হবার বাসনা জাগে তাঁর মনে। তিনি অমূল্য শাহের পিছু নেন।

হরিশপুরের অনুষ্ঠান শেষে অমূল্য শাহ চলে যান কুষ্টিয়া জেলার শংকরদিয়া গ্রামে নিমাই শাহের আখড়ায়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভাবসঙ্গীত। শুকচাঁদ সেখানেও অমূল্য শাহের গান শোনেন। আসর শেষে গভীর রাতে অমূল্যর সাথে তাঁর আলাপ হয়। তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বলেন। শুকচাঁদের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পেয়ে অমূল্য শাহ শুকচাঁদকে সঙ্গীত-শিষ্য

রূপে গ্রহণ করেন। শুকচাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অল্পদিনে তিনি ভাবসঙ্গীতের একজন দক্ষ শিল্পীরূপে গড়ে ওঠেন। বিভিন্ন আসরে তিনি ভাবসঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তাঁর সঙ্গীত-গুরু অমূল্য শাহের কাছে দরবেশী মতে দীক্ষিত হন।[৫]

সে সময় হরিশপুরের তিন মাইল উত্তরে হরিয়ারঘাট গ্রামে খোদা বকশ শাহ ছিলেন লালন-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী। তিনি তাঁর গুরু মনিরুদ্দিন শাহ (লালন-শিষ্য)-এর নিকট থেকে অসংখ্য লালন-সঙ্গীত প্রাপ্ত হন। অমূল্য শাহ হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের নিকট থেকে বহু লালন-সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। শুকচাঁদ শাহ অমূল্য শাহের নিকটে এই সব লালন-সঙ্গীতে তালিম নেন। এক পর্যায়ে শুকচাঁদ শাহ খোদা বকশ শাহের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে খোদা বকশের ভাণ্ডার থেকেও অনেক লালন-সঙ্গীত আত্মস্থ করেন। ধীরে ধীরে শুকচাঁদ শাহ দক্ষ সঙ্গীত-শিল্পী হয়ে ওঠেন।[৬]

শুকচাঁদ যখন নামকরা শিল্পী, ঠিক সেই সময় বানু নামে এক সুন্দরী মহিলার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। বানুর পিতার নাম আবদুর রহমান মণ্ডল। আবদুর রহমান চুয়াডাঙ্গা জেলার গড়গড়ি পুটিমারি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। শুকচাঁদের গানে মুগ্ধ হন বানু, আর বানুর রূপেগুণে মুগ্ধ হন শুকচাঁদ। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাঁরা।

বিয়ের পর বানু বেশিরভাগ সময় শুকচাঁদের সাথেই থাকতেন। বিভিন্ন সাধুসেবায় যেতেন, গানের সাথে মন্দিরা বাজাতেন। মাঝে মাঝে ফকিরি মজলিশের তদারকিও করতেন।

কোনো এক সাধুসেবায় লালন-সঙ্গীত ভাণ্ডারী খোদা বকশ শাহের সাথে বানুর পরিচয় ঘটে। ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে গভীর আন্তরিকতা। খোদা বকশ শাহের প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে বানু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বানুর প্রভাবে শুকচাঁদও খোদা বকশের শিষ্য হয়ে যান।[৭]

শুকচাঁদ মূলত অমূল্য শাহের শিষ্য ছিলেন। তাঁকে ছেড়ে খোদা বকশের কাছে যাওয়ায় অমূল্য একটু মনক্ষুণ্ন হন। কিন্তু বানুর মধুর ব্যবহারে অমূল্য সব ভুলে যান। এ সব তথ্যের মূলে অবশ্য কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই, জনশ্রুতিই এর মূল ভিত্তি। তবে অমূল্য-খোদা বকশ-শুকচাঁদ সম্পর্কিত নানা কিংবদন্তি হরিণাকুণ্ডু-আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) অঞ্চলে এখনো প্রচলিত।

বানুকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে শুকচাঁদ তাঁর গ্রামের বাড়ি ত্যাগ করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর গ্রামে তৈরি হয় তাঁর আখড়াবাড়ি। বানুকে নিয়ে এ আখড়ায় তিনি বাসবাস করতে থাকেন। গ্রামের (চটকাবাড়িয়ার) বাড়িতে থাকেন তাঁর দুই স্ত্রী ও পুত্র দুখী শাহ।[৮]

ফরিদপুর আখড়ায় থাকাকালে শুকচাঁদের সঙ্গীতচর্চা বৃদ্ধি পায়। পাশেই ছিল প্রখ্যাত ভাবসঙ্গীত শিল্পী বেহাল শাহের আখড়া। বেহালের দীক্ষাগুরু ছিলেন ছমিরচাঁদ শাহ। ছমিরচাঁদ ছিলেন চৌধুরী ঘরানার শিষ্য। ওদিকে শুকচাঁদ ছেউড়িয়া ঘরনার (লালন-ঘরানার) শিষ্য হয়ে গেছেন। তবে বেহাল-শুকচাঁদ দুইজন দুই ঘরানোর শিষ্য হলেও ভাবসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তাঁরা ছিলেন গভীর আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ। অসংখ্য সঙ্গীতাসরে তাঁরা সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। বস্তুত বেহাল-শুকচাঁদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার স্পৃহা ও সঙ্গীত উপস্থাপন রীতি সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি বর্তমান।

শুকচাঁদ শাহ দীর্ঘজীবী সাধক ছিলেন না। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের (১৯৫০ খ্রি.) ১০ বৈশাখ শুক্রবার তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[৯] শেষ বিদায়ের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৪৩ বছর।

চুয়াডাঙ্গা শহরের নিকটস্থ গোপীনাথপুর গ্রামে তাঁর মাজার বর্তমান। শুকচাঁদের শেষ বিদায়ের সময় বানু ফরিদপুর আখড়াবাড়িতে ছিলেন। সম্প্রতি বানুও দেহত্যাগ করেছেন। ফরিদপুর আখড়ায় বর্তমানে বিশেষ কেউ আর থাকে না। চটকাবাড়িয়া গ্রামে শুকচাঁদের পৈতৃক বাস্তুভিটেয় শুকচাঁদ-পুত্র দুখী শাহ এখনো বসবাস করছেন।

শুকচাঁদ শাহের অনেক শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে হরিণাকুণ্ডু থানার ভবানীপুর নিবাসী খোরশেদ শাহ, চটকাবাড়িয়ার জিনাতুল্লাহ্ লস্কর, ইশেলমারীর ভেলু শাহ, মেহেরপুরের ঝড়ু শাহ, বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য খোদা বকশ শাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শুকচাঁদ শাহের ভণিতায় কিছুসংখ্যক ভাবসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গেছে। সংখ্যায় বেশি না হলেও গুণে ও মানে এগুলো অতুলনীয়। একটি গানে আছে—

গুরুতত্ত্ব জানরে আমার মন।
জানলে পরে মরণ হরে
পালায় রে শমন॥[১০]

আর একটি গানে সাধক বলেছেন—

জানগা আগে মানষের বেনা
মানুষের নাই জাতির বালাই
মানুষ ভজলে যায় রে জানা॥[১১]

গুরুতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব গানের মতো দেহতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি গানও তিনি রচনা করেন। তাঁর গানগুলো কবিত্ব এবং ভাবসম্পদে অপূর্ব।

মরমী কবি খোদা বকশ এই ভাবসাধকের সার্থক অনুসারী ছিলেন। শুকচাঁদের মত ও পথ অবলম্বন করেই তিনি জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ভাবসঙ্গীত জগতে এবং সাধনমার্গে একটি বিশেষ আসনে তাঁর অধিষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। তত্ত্বজ্ঞ সাধক হিসেবে খোদা বকশের (শুকচাঁদ শিষ্য) নাম লালন-ঘরানার ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে বলে আশা করি। এ প্রসিদ্ধির মূলে ছিল গুরু শুকচাঁদের প্রাণঢালা আশীর্বাদ— কথাটি অবশ্যই স্মরণীয়।

তথ্যনির্দেশ

১. খোদা বকশ শাহ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য, ২৮. ১০. ৮৭।
২. নিবন্ধকারের সন্ধানলব্ধ (ফিল্ডওয়ার্ক) তথ্য থেকে উদ্ধৃত।
৩. শুকচাঁদ শাহের পুত্র দুখী শাহ ফকিরের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ২৮. ১০. ৮৭।
৪. সাধক শিল্পী বেহাল শাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ২৫. ১২. ৮৬।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. খোন্দকার আহাম্মদ আলী থেকে প্রাপ্ত । তথ্য-প্রাপ্তির তারিখ ৭.১০.৮৮।
৮. শুকচাঁদ শাহের পুত্র দুখী শাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-প্রাপ্তির তারিখ ১১. ৫.৮৯।
৯. খোদা বকশ শাহের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ২৮.১০.৮৭।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।

খোদা বকশের সঙ্গীত-গুরু অমূল্য শাহ

মরমী কবি খোদা বকশ শাহের দীক্ষাগুরু ছিলেন শুকচাঁদ শাহ। শুকচাঁদ শাহ যোগ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে খোদা বকশ ভাবসঙ্গীতে তালিম নেন। তাঁকে আরো দক্ষ-শিল্পী তৈরি করার জন্যে শুকচাঁদ তাঁকে তৎকালীন ওস্তাদ-শিল্পী অমূল্য শাহের কাছে পাঠান। বস্তুত অমূল্য শাহ ছিলেন শুকচাঁদের সঙ্গীত-গুরু ও দীক্ষাগুরু। অমূল্য শাহের যোগ্যতা ও সঙ্গীত-দক্ষতা সম্পর্কে শুকচাঁদ-পরিচিতি প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অমূল্য শাহের সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপনা করা যাচ্ছে।

অমূল্য শাহ ১২৮৬ বঙ্গাব্দের (১৮৭৯ খ্রি.) ১৭ অগ্রহায়ণ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার অন্তর্গত নওদা-গাঁ নামক পল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ খোশতোন আলী এবং মাতার নাম রাহাতন নেছা। খোশতোন আলী ছিলেন গুণীব্যক্তি। তাঁর একটি যাত্রাদল ছিল। এ কারণেই খোশাতোন আলী তাঁর এলাকায় খোশতোন অধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন।[২]

খোশতোন অধিকারী দুই পুত্রের জনক। তাঁদের নাম যথাক্রমে আমির আলী ও ওয়াকিল আলী। এই আমির আলী পরবর্তীকালে অমূল্য শাহ নামে অভিহিত হন। আসলে অমূল্য তাঁর গুরুদত্ত নাম। মরমী ভাবসাধানায় অসাধারণ ও কণ্ঠসঙ্গীতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করায় তাঁর দীক্ষাগুরু প্রখ্যাত সাধক জহুর শাহ তাঁকে 'অমূল্য' নামে ভূষিত করেন। বস্তুত সমকালীন যশোর-কুষ্টিয়ার ফকির সমাজে অমূল্য শাহ ভাবসঙ্গীতের প্রধান পুরুষ রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার হয়েছিলেন। তাঁর গুরুদত্ত 'অমূল্য' নাম সার্থক হয়েছিল।

বাল্যকালে অমূল্য তাঁর গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সঙ্গীত শিক্ষায় ব্রতী হন। উত্তরাধিকার-সূত্রে একটি সঙ্গীত-ঐতিহ্য তাঁর মানসে জড়িত ছিল। সেই সাথে অনুকূল পরিবেশ ও আঞ্চলিক প্রভাব সবিশেষ কার্যকর হয়েছিল। সমগ্র মহেশপুর অঞ্চল তখন ছিল সঙ্গীতের লালনক্ষেত্র। গ্রাম্য জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা এর মূল কারণ। এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মহেশপুরের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা সঙ্গীতচর্চার উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে একমনে সাধনা করতেন। উক্ত পরিবেশে অমূল্য শাহের জীবন গড়ে ওঠে।[৩]

সে সময় হরিদাশ বৈরাগী ছিলেন মহেশপুরের নামজাদা সঙ্গীত-শিক্ষক। সর্বসাধারণে তাঁকে 'ওস্তাদ ট্যানাই' বলে ডাকতো। অমূল্য এঁরই কাছে সঙ্গীত-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে, অতি অল্প সময়ে তিনি রাগসঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সেতার, এসরাজ, তবলা ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর দক্ষতা জন্মে।

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি চলে যান কলকাতায়। সেখানে বড় বড় কালোয়াত এবং নামকরা ওস্তাদের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন। ঐ সময় তাঁর বয়স উনিশ কিংবা বিশ বছর।

কলকাতায় থাকাকালে বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের বৈষ্ণব-বাউলগণের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি কীর্তন ও বাউল গানের প্রতি আসক্ত হন। ঝিনাইদহের আঞ্চলিক গানের প্রতিও তিনি নাড়ীর টান অনুভব করেন। দেশজ সঙ্গীতের প্রবল আকর্ষণ তাঁকে ঘরে ফিরতে বাধ্য করে।

অমূল্য ফিরে আসেন নওদা গাঁ'য়। বৃদ্ধ পিতার সাহায্যকল্পে সংসার তদারক করা তাঁর জন্যে জরুরি হয়ে পড়ে। পিতা তাঁকে সংসারি করতে মনস্থ করেন। তিনিও সংসার-জীবনে প্রবেশে অভিলাষী হন। অতঃপর জরিতন নেছা নামে এক শিল্পী মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। জরিতনের পৈত্রিক নিবাস ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত বণ্ডবিল গ্রামে। এই মহিলা চমৎকার বীণা বাজতেন। এ জন্যে অমূল্য আদর করে তাঁর নাম রাখেন 'বীণা'। অমূল্যর সঙ্গীত-জীবনে এই মহিলার প্রভাব যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল।[৪]

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ জেলাব্যাপী একটি সঙ্গীতধারা প্রবহমান ছিল। ঝিনাইদহ সদরে পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাসের জারিগান এবং হরিণাকুণ্ডু-শৈলকুপা থানার সর্বত্র লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, জহরদ্দি শাহ ইত্যাদি সাধকের ভাবসঙ্গীত লোকমনে স্থায়ী রসসঞ্চারী হয়েছিল। হরিণাকুণ্ডুর হরিশপুরে পাঞ্জু শাহের আখড়া ছিল এসব সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। এ গ্রামে অনেক শিল্পীও ছিলেন। আলীম শাহ ছিলেন এ ধরনের একজন কণ্ঠশিল্পী। তিনি বেহালা বাজিয়ে গান করতেন। দৈবক্রমে তিনি অমূল্য শাহের ভায়রা হয়ে পড়েন। অমূল্য-শ্যালিকা আলীম-পত্নী মজিরণ নেছাও ছিলেন কণ্ঠশিল্পী এবং মন্দিরাবাদিনী।

ভায়রা-বাড়ি বেড়াতে এসে অমূল্য শাহ হরিশপুরের মরমী সঙ্গীতচর্চার পরিবেশ লক্ষ্য করেন। ভাবসঙ্গীত চর্চার ব্যাপকতা দেখে তাঁর ভাল লাগে। আলীম শাহের মাধ্যমে অমূল্য শাহ পাঞ্জু শাহের আখড়ায় পরিচিত হয়ে ওঠেন। পাঞ্জু শাহের পুত্র খোন্দকার শামসুদ্দীন এবং খোন্দকার রফিউদ্দীন অমূল্যকে স্বাগত জানান। পাঞ্জু শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র খোন্দকার লুৎফর রহমানও ছিলেন শিল্পী। তাঁর সঙ্গে অমূল্য শাহের হৃদ্যতা জন্মে। ফলে তিনি বেশিরভাগ সময় হরিশপুর কাটাতে থাকেন। হরিশপুরের প্রভাব তাঁর সঙ্গীত-জীবনকে আরো সম্ভাবনাময় করে তোলে।

হরিয়ার গ্রামে খোদা বকশ শাহ ছিলেন লালন-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী। হরিশপুর থেকে হরিয়ারঘাটের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। হরিশপুর ও হরিয়ারঘাটের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগাযাগ ছিল এবং আলীম শাহ বিভিন্ন সাধুসেবায় খোদা বকশ শাহের সঙ্গে মিলিত হতেন। একটি গভীর আত্মীয় সম্পর্কও তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। এই সূত্র ধরে একদিন অমূল্য শাহ তাঁর ভায়রা আলীম শাহকে নিয়ে খোদা বকশ শাহের হরিয়ারঘাটের আখড়ায় যান। অমূল্য শাহের সুরেলা কণ্ঠের পরিচয় পেয়ে খোদা বকশ শাহ অভিভূত হন। তিনি তাঁর সংগৃহীত লালন-সঙ্গীত ঐ কণ্ঠে তুলে দিতে মনস্থ করেন। অমূল্য শাহ নিজেও এমনি

একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এবারে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি পশ্চাদপদ হলেন না। হরিয়ারঘাটে অবস্থান করে তিনি লালন-সঙ্গীত সংগ্রহ এবং সুর আয়ত্ত করলেন মনের মতো।[৫]

লালন-সঙ্গীতে বিস্তর অধিকার লাভের পর অমূল্য শাহ এ সঙ্গীতের শ্রোতা সৃষ্টিতে মন দেন। শ্রোতার মনে আকর্ষণ বৃদ্ধির আশায় তিনি আসরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের রীতি প্রবর্তন করেন। ডান হাতে একতারা, বাম হাতে বায়া বাজিয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের একটি নতুন ধারা তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি হয়। বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের বাউলদের অনুকরণে ঝিনাইদহ-যশোর এবং কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে লালন-সঙ্গীতের জোয়ার বইয়ে দিতে বেশি সময় লাগে না তাঁর। উল্লেখ্য, পূর্বে সাধুসেবায় কিংবা আখড়ায় বসে বড় আকারের গোপীযন্ত্র (একতারা) বাজিয়ে সাধকগণ ভাবে তন্ময় হয়ে লালন-সঙ্গীত এবং পাঞ্জু-দুদ্দুর গান গাইতেন। গুরু-শিষ্য এবং তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ও তাঁদের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে এ গান সীমাবদ্ধ ছিল। অমূল্য শাহ এ ভক্তিগীতিকে সকলের বোধগম্য করার জন্যে একে সাধুর আখড়া থেকে নিয়ে এলেন সর্বসাধারণের আসরে। প্রশ্নোত্তরে পরিবেশনের প্রথা প্রবর্তন করে তিনি এ গানে আনলেন নতুন ব্যঞ্জনা। আগে থেকেই এ সব গান বিভিন্ন দাড়া বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিনি এ শ্রেণী-বিভাগকে আরো সুসংবদ্ধ এবং সুশৃংখল করেন। তখন থেকেই ভাবসঙ্গীত আল্লাহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পারাপারতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, গোষ্ঠতত্ত্ব ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়। কোন্ তত্ত্বের গান শ্রোতারা শুনতে চান, আসরে গিয়ে তিনি প্রথমেই তা জেনে নিতেন। এতে শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপিত হতো।

একজন প্রশ্ন করবেন, অন্যজন উত্তর দিবেন— এ জন্যে আসরে অন্তত দুজন শিল্পীর প্রয়োজন। এ প্রয়োজন অনুভব করে অমূল্য শাহ শিল্পী তৈরিতে মন দিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তৈরি হলো বেশ কিছু শিল্পী। এঁদের মধ্যে কালিদাসীর নাম বিশেষ স্মরণীয়। এ মহিলা একতারা-বায়া নিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে অমূল্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তখন মাইকের প্রচলন ছিল না। খালি কণ্ঠে গান গেয়ে হাজার হাজার শ্রোতাকে খুশি করতে হতো। অমূল্য শাহের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ জোরালো। ফলে শ্রোতারা অনায়াসে তাঁর গান শুনতে পেতো। তাছাড়া তাঁর মধ্যে এমন এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, তিনি আসরে উঠে দাঁড়াতেই হাজার হাজার শ্রোতা নীরব হয়ে যেতো। তাঁর এক-একটি কথা যেন অমৃতবর্ষী বাণীরূপে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করতো। এমন কি তাঁর নাম শুনে তাঁকে এক নজর দেখার জন্যেও দুরদূরান্তর থেকে লোক আসতো।[৬]

অমূল্য এবং কালিদাসীর গানে আকৃষ্ট হয়ে কিছু প্রশিক্ষণার্থীও এসে জোটেন। এঁদের মধ্যে বেহাল শাহ, গহোর শাহ, শুকচাঁদ শাহ, রসিক শাহ, মহরালী শাহ, বশীর শাহ, খোরশেদ শাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লখযোগ্য। উল্লিখিত সঙ্গীত-শিষ্যদের মধ্যে বেহাল এবং শুকচাঁদ শিল্পী হিসেবে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। এঁদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্যেও অসংখ্য লোকের ভীড় জমতো। আসরে প্রতিপক্ষ শিল্পী না থাকলে বেহাল, শুকচাঁদ উভয়ে অমূল্য শাহের প্রতিপক্ষ শিল্পীরূপে অবতীর্ণ হতেন। গুরু-শিষ্যের পাল্লা-প্রতিযোগিতা আসরে এক অপূর্ব ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করতো।

অমূল্য শাহের সমকালে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে পাঁচটি প্রধান ফকিরি-ঘরানা ছিল। এ গুলো হচ্ছে হরিশপুরের ঘর, ছেঁউড়িয়ার ঘর, চৌধুরীর ঘর, দরগাপাড়ার ঘর এবং ঘোলদাড়ির ঘর। হরিশপুরের ঘরের সাধক পাঞ্জু শাহ, ছেউড়িয়ার ঘরের সাধক লালন শাহ, চৌধুরীর ঘরের সাধক উজল চৌধুরী, দরগাপাড়ার ঘরের সাধক মুচাই শাহ এবং ঘোলদাড়ির ঘরের সাধক পাঁচু শাহ। এই ঘোলদাড়ির ঘরের উত্তরসাধক জহুর শাহের কাছে অমূল্য শাহ দীক্ষা গ্রহণ এবং তাঁরই হাতে তিনি খেরকা (ফকিরি পোশাক) গ্রহণ করেন। তবে সাধনা ও ফকিরি তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের ঘোষপাড়ার প্রখ্যাত দরবেশ আউলচাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় যাতায়াত করতেন। এ জন্যে অনেকে তাঁকে আউলচাঁদের উত্তরসূরি সতীমার অনুসারী বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু অমূল্য শাহের সঙ্গীতশিষ্য বেহাল শাহের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, অমূল্য শাহ যথার্থই ঘোলদাড়ির ঘরের সাধক এবং জহুর শাহ তাঁর দীক্ষাগুরু।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ভাবসঙ্গীত-ভুবনে অমূল্য শাহের বিচরণ একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাঁরই উদ্যোগে লালন-সঙ্গীতসহ যাবতীয় ভাবসঙ্গীত একটি বিশেষ জনপ্রিয় সাঙ্গীতিক মর্যাদা লাভ করে। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীতের মতো লালন-সঙ্গীত বর্তমানে বাংলা সঙ্গীত জগতে যে বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে, অমূল্য শাহের কল্যাণেই তা সম্ভব হয়েছে-এ কথা অমূলক নয়।

এই সাধক ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন নির্লিপ্ত এবং বিষয়-বিরাগী। বৈষয়িক কোনো লোভ-মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। সঙ্গীত-চর্চার অবসরে যে সময় তিনি পেতেন, সে সময়ে আখড়ায় বসে ভক্তদের সাথে তত্ত্বকথার আলাপ করতেন। প্রতিবেশীরা এবং গ্রামের জনসাধারণ তাঁর মধুর সাহচর্য লাভের আশায় তাঁর কাছে আসতো। তাঁর একটি মাত্র পুত্র-সন্তান ছিল। তিনি আদর করে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দুলাল'। দুলালও পিতার মতো সঙ্গীত-শিল্পী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি গ্রাম্য দাঙ্গায় দুলাল নিহত হন। পুত্রশোকে অমূল্য শাহ অধীর হয়ে পড়েন। দুলাল মাতা বীণাকে নিয়ে তখন তিনি বিভিন্ন শিষ্যবাড়ি ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে তাঁর পরপার-যাত্রার সময় আসে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের (১৯৫২ খ্রিঃ) ১৭ জ্যৈষ্ঠ অমূল্য শাহ ইহলোক ত্যাগ করেন।[৮] এ সময় তাঁর স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়াকিল আলী জীবিত ছিলেন। বর্তমানে এঁরা আর কেউ ইহজগতে নেই। ওয়াকিল আলীর পুত্র সোনাউল্লাহ নওদা গাঁ'য় আজো বর্তমান রয়েছেন। অমূল্য শাহের মৃত্যু হয় পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রামে তাঁর এক শিষ্য-বাড়ি। সেখানে তাঁর মাজার আছে।

অমূল্য শাহ যখন লালন-সঙ্গীত জগত থেকে বিদায় নেন, তখন তিনি রেখে যান তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁর দীক্ষিত শিষ্য নিমাই শাহের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বেহাল, শুকচাঁদ ও অন্যান্য অনেকেই তাঁর ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছিলেন। অমূল্য শাহের সঙ্গীতশিষ্য বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত ব্যক্তিত্ব খোদা বকশ শাহের কথা আরো বেশি স্মরণীয়। অমূল্যর ভাব, তাল, মান, সুর খোদা বকশ যেভাবে ধরে রেখেছিলেন, সেভাবে ধরে রাখতে আর কেউ পারেন নি। খোদা বকশের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, অমূল্যর

শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অতি উত্তম। কঠিন সুর ও দুর্বোধ্য তাললয়কে তিনি সহজ করে উপস্থাপন করতেন। শিক্ষার্থী যাতে সহজে ধরতে পারে, অমূল্য সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা দিতেন। এরই ফলে খোদা বকশ খুব কম সময়ে সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুদক্ষ যন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। এখানেই যোগ্য সঙ্গীত-গুরু হিসেবে অমূল্য শাহের কৃতিত্ব।

অমূল্য শাহ লালন-সঙ্গীতের যুগস্রষ্টা সাধক পুরুষ। তিনি তো ঝিনাইদহের অধিবাসী ছিলেন। লালন-মাজার ছেঁউড়িয়াতে তাঁর প্রভাব কতখানি ছিল— এমন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, লালন-শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় অমূল্য শাহ ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। কেননা ছেঁউড়িয়াতে লালন-শিষ্য ভোলাই শাহের প্রভাবই বেশি ছিল। কিন্তু ভোলাই শাহের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কেউই নামকরা কণ্ঠশিল্পী ছিলেন না। দু-একজন যাঁরা সামান্য গান-বাজনা করতেন, তাঁদের গায়কী এবং উপস্থাপন পদ্ধতি সাবেককালের রীতি-পদ্ধতির উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। তথাপি অমূল্য শাহের রীতি পদ্ধতি ছেঁউড়িয়ায় উপেক্ষিত থেকে গেছে।

অমূল্য-অনুসারী বেহাল-শুকচাঁদ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে তাঁদের আখড়া নির্মাণ করেন । এখানে তাঁরা তাঁদের সঙ্গীত-গুরু অমূল্য শাহের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। ওদিকে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে লালন-সঙ্গীত চর্চা ব্যাহত হয়। ফলে, এক সময় লালন-সঙ্গীত মূলত আলমডাঙ্গার গান হয়ে ওঠে। কারণ অমূল্য-পরবর্তী অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠ-শিল্পী বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত খোদা বকশ নিজেও আলমডাঙ্গা থানারই বাসিন্দা ছিলেন। সেজন্যে বেহাল-শুকচাঁদ-খোদা বকশ পরিবেশিত লালন-সঙ্গীত যে আলমডাঙ্গার গান বলে অভিহিত হয়, তা অনেকটাই সত্য।

পরবর্তী পর্যায়ে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় 'লালন একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মকছেদ আলী সাঁই এবং তাঁরই ছাত্রী ফরিদা পারভিনের আবির্ভাবে ছেঁউড়িয়ার তথা কুষ্টিয়ার লালন-সঙ্গীত কুষ্টিয়ায় ফিরে গেছে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত-চর্চার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান স্বীকৃত। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মকছেদ আলী সাঁই এবং তাঁর সঙ্গীত-ছাত্রী ফরিদা পারভিন পরিবেশিত লালন-সঙ্গীত সুর-ছন্দ এবং গায়কী বিচারে অমূল্য শাহের ধারাভিত্তিক। কারণ মকছেদ আলী সাঁই নিজে বেহাল শাহ এবং নিমাই শাহের নিকট থেকে লালন-সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সুতরাং এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান লালন-সঙ্গীতের জনপ্রিয় ধারাটি অমূল্য শাহ থেকে প্রবাহিত। এখানেই অমূল্য শাহের সঙ্গীত-সাধনার সার্থকতা।

পরিশেষে বলতে হয়, অমূল্য শাহ শুধু সঙ্গীত শিল্পীই ছিলেন না, তিনি একজন গীতিকারও ছিলেন। তাঁর গানগুলোর মধ্যে 'পাখি উড়ে গেল, সাধের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া' এবং 'তোরা ধর গো ধর আমার প্রাণবন্ধুরে'— গান দুটি বেশ শ্রুতিমধুর ও প্রাণবন্ত। বাংলা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ-প্রকল্প গ্রহণ করে লোকমুখে ছড়িয়ে থাকা অমূল্য শাহের গানগুলো সংগ্রহ

করা আবশ্যক। তাহলে ভাবসঙ্গীতের বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে অমূল্য শাহের মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। খোদা বকশ শাহকে জানা ও বুঝার প্রয়োজনে অমূল্য শাহকে জানা ও বুঝা অতি জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

১. নিজস্ব সংগ্রহ : ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত তথ্য। অমূল্য শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ মোহাম্মদ সোনাউল্লা-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ ৫. ১০. ৮১।
২. প্রাগুক্ত।
৩. মরমী সাধক বেহাল শাহের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। ১৯৭৬ সালে আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে বনমালী শাহের আখড়ায় অনুষ্ঠিত ১ পৌষের সাধুসেবা (ফকিরি মজলিশ) থেকে সংগৃহীত।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. খোন্দকার রফিউদ্দীনের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। ১৯৭৮ সালে হরিশপুরের বাড়িতে অন্তরঙ্গ বৈঠকের সময় সংগৃহীত। সংগ্রহ তারিখ ২. ১. ৭৮.।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. মরমী সাধক বেহাল শাহের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ১০. ১. ৭৬.।
৮. নিজস্ব সংগ্রহ : ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) থেকে প্রাপ্ত তথ্য। শাহ মোহাম্মদ সোনাউল্লাহ, তারিখ ৫. ১০. ৮১।

খোদা বকশের দাদা-গুরু হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ

বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত খোদা বকশ শাহের গুরুর গুরু (দাদা-গুরু) ছিলেন হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ। লালন-ঘরানার শিষ্যদের মধ্যে এই খোদা বকশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। লালন-সঙ্গীত এবং অন্যান্য মরমী সাধকের গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২৭২ বঙ্গাব্দের (১৮৬৫ খিস্টাব্দ) ১০ মাঘ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিয়ারঘাট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে খোদা বকশ জন্মগ্রহণ করেন।[১] হরিয়ারঘাট গ্রামটি ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কুমারনদের তীরে অবস্থিত। পূর্বকাল থেকেই এ গ্রামের পরিবেশ মরমী সাধনার অনুকূল ছিল। এ গ্রামে খোদা বকশের আবির্ভাব এরই ফলশ্রুতি — এ কথা বলা যায়।

খোদা বকশ শাহের পিতার নাম জমিরুদ্দিন মণ্ডল, মাতার নাম শাবজান নেছা এবং পিতামহের নাম মেছের বিশ্বাস। তাঁর আরো চার ভাই ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে এলাহি বকশ মণ্ডল, জাহা বকশ মণ্ডল, এমান বকশ মণ্ডল ও দিদার বকশ মণ্ডল। এ ছাড়া আছিরণ নেছা, সুন্দরী নেছা, মছিরণ নেছা ও রাহাতন নেছা নামে তাঁর চার ভগ্নীও ছিলেন। বয়সে খোদা বকশই ছিলেন সকলের বড়।[২]

কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত পশ্চিম আবদালপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোদা বকশের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তখন বেনালী পণ্ডিত ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। খোদা বকশ এঁর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। যথাসময়ে এখানকার শিক্ষা শেষ করে তিনি জোড়াদহ (থানা—হরিণাকুণ্ডু, জেলা-ঝিনাইদহ) উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দুঃখের বিষয় মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তাঁর আর পড়াশোনা হয় না। পিতার অকাল মৃত্যুতে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

অসময়ে সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ে। বিদ্যালয়-জীবন পরিত্যাগ করে তিনি সংসার-জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কাহিনী শোনা যায়। তিনি তিনবার বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র এবং অন্য দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই কন্যার জন্ম হয়।

খোদা বকশ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সমাজে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ কারণে তিনি পশ্চিম আবদালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তাঁর ছিল একটি স্নেহপরায়ন মন। ছাত্রগণকে তিনি নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত অংকনশিল্পী ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ আলী হোসেন, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ এবাদত আলী খান এবং গ্রাম-প্রধান নূর বকশ, আফাজদ্দিন মোল্লা, আমজাদ হোসেন প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যানুরাগী খোদা বকশের প্রাণে ধর্মীয় অনুভূতিও ছিল প্রবল। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং মরমী সাধনার ফল্গুধারায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। সে সময় হরিয়ারঘাটের পার্শ্ববর্তী মালিপাড়া গ্রামে বাস করতেন লালন-শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ। মনিরুদ্দিন শাহ অধিকাংশ সময়ই তদীয় দীক্ষাগুরু লালন শাহের আখড়ায় হাজির থাকতেন। খোদা বকশ শাহ একদিন লালন-আখড়ায় উপস্থিত হয়ে মনিরুদ্দিন শাহের সাথে দেখা করেন। বিভিন্ন কথার আলাপকালে তিনি মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্য হতে চান। মনিরুদ্দিন শাহ তখন খোদা বকশকে পরীক্ষার জন্যে লালন শাহের হুজরাখানার ভেতরে নিয়ে যান। লালন শাহ তখন খোদা বকশকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। খোদা বকশের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তিনি খুশি হন। অতঃপর তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করার জন্যে তিনি মনিরুদ্দিন শাহকে নির্দেশ দেন। খোদা বকশের অভিলাষ পূর্ণ হয়। তিনি মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অধ্যাত্ম সাধন-পথে অগ্রসর হন।[৩]

খুব শীঘ্রই সিদ্ধসাধক হিসেবে খোদা বকশের নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হন লালন শাহী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ দরবেশ। পৌঢ় বয়সে তিনি খেরকা গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মানুরাগের পরিচয় পেয়ে বহু ধর্মপরায়ন ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই শিষ্যগণের মধ্যে ভিকুউদ্দিন শাহ, শুকচাঁদ শাহ, মাদার শাহ, জিনাত শাহ, দেলবার শাহ, আবুল হোসেন শাহ, জেহের আলী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, অমর ভাবসঙ্গীত-শিল্পী অমূল্য শাহ নিজেও খোদা বকশের কাছে লালন-সঙ্গীতে তালিম নেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ অমূল্য শাহের পরিচিতির মধ্যে রয়েছে।

খোদা বকশ শাহ শুধু সাধকই ছিলেন না, তিনি কণ্ঠশিল্পীও ছিলেন। বহুসংখ্যক মরমী সঙ্গীত তিনি রচনাও করেন। তাঁর সঙ্গীতগুলো লালনশাহী ভাবধারায় পুষ্ট। এ সঙ্গীতের সুর, ছন্দ এবং বাণীভঙ্গি লালন-সঙ্গীতের অনুরূপ। তবে এগুলো যে হুবহু লালন-সঙ্গীতের অনুকরণ, তাও বলা যায় না। প্রতিটি সঙ্গীতে খোদা বকশের পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান এবং রচনা-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ সব সঙ্গীত হরিয়ারঘাট অঞ্চলে আজো লোকমুখে ছড়িয়ে আছে।[৪]

একটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে এই যে, খোদা বকশ শাহ তাঁর দীক্ষাগুরু মনিরুদ্দিন শাহের নিকট থেকে যে সিজরানামা (গুরুকুললিপি) লাভ করেন, পরবর্তীকালে ঐ সিজরানামার অনুলিপি লালন-ঘরানার ফকিরগণের কাছে পাওয়া গেছে। অদ্যাবধি ঐ সিজরানামা লালন-প্রশিষ্যগণ অনুসরণ করে আসছেন। সুতরাং এই সিজরানামা বিচারে বলা যায় যে, খোদা বকশ শাহ ও তাঁর দাদাগুরু লালন শাহ একই মত ও পথের অনুসারী। সে পথ যে চিশতিয়া তরিকার নিজামী শাখাভিত্তিক সুফি সাধনার পথ, তা বলাই বাহুল্য।[৫]

জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর নির্জন সাধনায় কাটে। উপাসনাদি শেষ করে তিনি একতারা নিয়ে গান গাইতেন। স্বরচিত সঙ্গীতগুলো খাতায় লিখতেন। গুরুর খাতা থেকে লালন-সঙ্গীত সংগ্রহ করে বড় বড় খাতায় তুলতেন। বহু ভাবসঙ্গীত-শিল্পী তাঁর কাছে গান শেখার জন্যে আসতেন। লালন-সঙ্গীত বর্তমানে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, খোদা বকশ শাহের সংগ্রহ-সংরক্ষণ কার্যাবলী তাতে বিশেষ মদত জুগিয়েছে— এ কথা বললে বেশি বলা হয় না।

এই মরমী কবির দিন ফুরিয়ে আসে। তাঁর পরপার যাত্রার সময় হয়। অবশেষে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ৩ আষাঢ় খোদা বকশ শাহ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬] হরিয়ারঘাটে তাঁর নিজস্ব আখড়াবাড়ির প্রাঙ্গণে তিনি সমাহিত আছেন। তাঁর মাজারটি পাকা করে বাঁধানো হয়েছে। প্রতি বছর ৩ আষাঢ় কবির মাজারে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

একটি কথা স্মরণীয়। তা হচ্ছে এই যে, হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের রচিত সঙ্গীত এবং বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত কখনো কখনো মিশে গেছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। বর্তমান খোদা বকশ শাহ হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত সংগ্রহ করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন — এমন মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন। আসলে এ কথা সত্য নয়। উভয় সাধকের সঙ্গীত একইভূত হয় নি। বর্তমান খোদা বকশ শাহ হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত নিজের সঙ্গীত বলে চালানোর চেষ্টা করেন নি। তা ছাড়া হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ বর্তমান খোদা বকশের গুরুর গুরু (দাদাগুরু)। গুরুর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস মরমী সাধকদের অন্তরের ধর্ম। গুরুর গুরু (দাদাগুরু) তাঁদের কাছে আরো শ্রদ্ধার পাত্র। এ শ্রদ্ধা নষ্ট করা তাঁদের ধর্ম নয়। আমাদের আলোচ্য খোদা বকশ এ ব্যাপারে আরো সজাগ ছিলেন। অসাধারণ ভয়ভক্তি, বিনয়-নম্রতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং এই মহত মানুষটি তাঁর দাদা-গুরুর সঙ্গীতকে নিজের সঙ্গীত বলে চালিয়ে দিয়েছেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ আলী হোসেন, গ্রাম : দোবিলা, থানা : হরিণাকুণ্ডু, জেলা : ঝিনাইদহ, বয়স : ৭০, পেশা : শিক্ষকতা, এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ৫.২.৯৬

২ মুহম্মদ এবাদত আলী, গ্রাম : দোবিলা, থানা : হরিণাকুণ্ডু, জেলা : ঝিনাইদহ, বয়স : ৬৮, পেশা : শিক্ষাকতা, এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ৫.২.৯৬

৩. ফরিদপুর (আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা) নিবাসী বেহাল শাহ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ ৬. ৯.৭২

৪. মুহম্মদ মনসুর আলী, গ্রাম : পশ্চিম আবদালপুর, থানা ও জেলা : কুষ্টিয়া-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তারিখ ৬.২.৯৬

৫. খোদা বকশ শাহ, গ্রাম : কররাজাহাপুর, থানা : আলমডাঙ্গা, জেলা : চুয়াডাঙ্গা-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-সংগ্রহ তাং ৫.৯.৭২

৬. প্রাগুক্ত।

বাংলা সাহিত্যে লালন শাহের উত্তরাধিকারী ও খোদা বকশ শাহ

সাধক লালন শাহ উনিশ শতকের (১৭৭২-১৮৯০) কবি। তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা, জীবন-দর্শন ও অধ্যাত্ম-শক্তি বহু গুণী ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে লালনের সাক্ষাৎ শিষ্য হয়ে তাঁরই সাধানক্ষেত্র ছেঁউড়িয়ায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর তিরোধানের পরেও এঁদের কেউ কেউ ছেঁউড়িয়ার আখড়াধারী সাধকরূপে কাল কাটিয়েছেন। লালনের সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে যাঁদের পরিচয় জানা যায়, তাঁদের মধ্যে দুদ্দু শাহ, মনিরুদ্দিন শাহ, ভোলাই শাহ, শীতল শাহ, দয়াল শাহ, মানিক শাহ (মানিক পন্ডিত), মলম শাহ প্রমুখ সাধক সবিশেষ স্মরণীয়।[১] এই সব সাধক লালন-পরবর্তী সময়ে বাংলার ফকির সমাজে লালনের অধ্যাত্ম ভাবসাধনা অনুসরণ করে চলতে প্রয়াস পান। কোনো কোনো সাধক স্বরচিত ভাবগীতির মধ্যদিয়ে লালনশাহী চিন্তাধারায় স্বকীয় সাধনালব্ধ প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি আরোপ করে মরমী ধারায় বিশেষ অবদান রেখেছেন।[২]

লালনের সমমর্মী কিছুসংখ্যক সাধক লালন-মতাদর্শ, তথ্য ও সত্য জীবন সাধনার আদর্শ হিসেবে তাঁদের জীবনে প্রতিফলিত করেন। লালনশাহী ভাবসঙ্গীত পরিবেশন এবং তত্ত্বালোচনা তাঁদের নিত্য কর্মসূচি ছিল। এঁরা ছিলেন লালনের ভাবশিষ্য। এই শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে পাঞ্জু শাহ, জহরুদ্দি শাহ, কাজেম শাহ, রমজান শাহ, সৈয়দ শাহ কাছেম আলী, মফিজউদ্দিন শাহ, শামসউদ্দিন খোন্দকার, গোপাল শাহ, মদন দাশ গোস্বামী (মদন বাউল), যাদুবিন্দু, কুবীর গোঁসাই, রাধার শ্যাম, রাধাকৃষ্ণ গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, গগণ হরকরা প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩] এই সাধকগণের কেউ কেউ লালনের জন্মভূমি হরিশপুরে আখড়া নির্মাণ করে বসবাস করতেন। অনেকে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, পাবনা, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে থাকতেন। কারো কারো বংশধর আজো জীবিত।

লালন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বড় ভাই আলমেরও কোন বংশধর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু লালনের মধ্যম ভ্রাতা কলমের বংশাবলী আজো দীন-দরিদ্রভাবে হরিশপুরে বসবাস করছেন।[৪]

সুধীসমাজে ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিক মহলে লালনের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। ফলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক লালন-প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষ করে লালনশাহী বাউল-সুর তাঁদেরকে ঘরছাড়া খ্যাপা বাউলে পরিণত করেছে।[৫]

লালন শাহের উত্তরাধিকারী বলতে লালন-ভ্রাতা কলমের বংশধরগণ, লালনের সাক্ষাৎ শিষ্য ও সঙ্গীত শিষ্যবৃন্দ, ভাবশিষ্যমণ্ডলী এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি-সাহিত্যিকগণ, যাঁরা তাঁর প্রভাবে প্রবাবিত, তাঁদের সকলকেই বুঝায়। এঁদের মধ্যে বিশেষ

জনপ্রিয় যাঁরা, তাঁদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করছি। সবশেষে খোদা বকশ শাহকে তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরছি।

লালন শাহের বংশধরগণ

কলম

লালন শাহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতেন। হরিশপুরের ইতিহাসে তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সম্ভবত কলকাতাতেই তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়।

সাধক লালনও নিঃসন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে হরিশপুরের গোলাব শাহের কন্যা (মেছের শাহর ভগ্নী)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু অকালে ঐ মহিলা ইন্তেকাল করেন।[৬] ছেঁউড়িয়াতে লালনের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কোনো স্ত্রীর গর্ভেই লালনের কোনো সন্তান হয় নি।

লালনের মধ্যম ভ্রাতা কলম হরিশপুরে কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ বিষয়ে সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে। কলমের এক কন্যা ছিল, নাম তাঁর ময়না বিবি। কলমের মৃত্যুর পর এই মহিলা অতি দীনভাবে হরিশপুরে বাস করেন।

ময়না বিবি

হরিশপুরের প্রাচীন লোকেরা বলেন, 'লালন-ভ্রাতা কলম-দুহিতা ময়না বিবি' সকলের কাছে 'দবিরের মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। ময়না বিবির এক পুত্র দুই কন্যা ছিল। তারা যথাক্রমে দবিরুদ্দিন, কুলসুম ও সাগরী। হরিশপুরের মরমী সাধক খোন্দকার রফিউদ্দীন বলেন, "দবীরের মা নামে পরিচিতা এই মহিলাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মহিলা বলতেন, 'লালন শাহ আমার আপন চাচা'। ইনি দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং হরিশপুরেই ইন্তেকাল করেন।"[৭]

রমজান

লালন-ভ্রাতা কলমের পুত্র রমজান। প্রথম জীবনে ইনি হরিশপুরেই বাস করতেন। পরবর্তীকালে আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) থানার ডামেশ গ্রামে চলে যান। সেখানে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।[৮] ঐ গ্রামে এ সম্বন্ধে আজো কিছু কিংবদন্তি শোনা যায়। তবে প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

সাগরী বিবি

সাগরী ময়না বিবির কন্যা। ঝিনাইদহের খাজুরা গ্রামে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর তিনি একমাত্র কন্যা ছবিরণ নেছাকে সঙ্গে নিয়ে হরিশপুর পৈত্রিক ভিটেই চলে আসেন। হরিশপুরে এখনো বহু ব্যক্তি জীবিত আছেন, যাঁরা সাগরীকে দেখেছেন।

ছবিরণ নেছা বিবি

সাগরী বিবির একমাত্র কন্যা ছবিরণ নেছা। হরিশপুর নিবাসী আইজুদ্দিনের সঙ্গে ছবিরণের বিয়ে হয়। আইজুদ্দিনের আর্থিক অবস্থা প্রথম দিকে ভাল ছিল। কালক্রমে তিনি অন্ধ হয়ে যান। আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। তখন তাঁর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় দাঁড়ায় ভিক্ষা। পুত্র ক্ষেপু প্রথমে গৃহস্থ বাড়ি রাখাল থাকেন ও পরে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করেন। দুর্ভাগ্যবশত গ্রাম্য কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে ক্ষেপু নিহত হন। তখন ছবিরণ অসহায় হয়ে পড়েন। ১৯৭০ সালে কলেরা রোগে আইজুদ্দিন মারা যান। অবশেষে ১৯৭২ সালের ১৭ জুন ছবিরণও ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব বাংলা একাডেমীর প্রতিনিধি হিসেবে লালন সাহিত্যের তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ-মানসে হরিশপুর সফর করেন। এ সময় তিনি ছবিরণ ও আইজুদ্দিনের সঙ্গে এক অন্তরংগ সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। লালন সম্বন্ধে ছবিরণ ও তাঁর স্বামীর বক্তব্য অধ্যাপক আবু তালিব লিপিবদ্ধ করেন এবং নমুনাস্বরূপ ছবিরণ, আইজুদ্দিন ও ক্ষেপুর ফটো গ্রহণ করেন।[৯] কুষ্টিয়ার অধ্যক্ষ আফছারউদ্দিন শেখও এই ছবিরণের সাক্ষাৎকার নেন। ১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল হরিশপুরে যখন লালন শাহের দ্বিশতম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়, তখন কলকাতা থেকে আগত ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, ঢাকা থেকে আগত অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, সাংবাদিক আসফ-উদ-দৌলা প্রমুখ ক্ষেপুর দুই পুত্র, এক কন্যার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি তাঁরা হরিশপুরে এতিম-অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছেন।[১০]

কতিপয় বিশিষ্ট লালন-শিষ্য

দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১৯)

লালন-শিষ্যদের মধ্যে মরমী কবি দুদ্দু শাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ফকির-সমাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর গুরুভক্তি ও রচনা-শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে লালন শাহ তাঁকে 'বাপ' বলে সম্বোধন করতেন।

দুদ্দু শাহ জাতিতে মুসলমান। তাঁর প্রকৃত নাম দবিরুদ্দিন। ফকিরি মতে দীক্ষিত হবার পর তিনি দুদ্ মল্লিক বা দুদ্দু শাহ নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ ঝড়ুমণ্ডল এবং চাচার নাম জিন্দার আলী বিশ্বাস। লালন শাহের জন্মভূমি হরিশপুর সংলগ্ন বেলতলা গ্রামে ১৮৪১ সালে দুদ্দু শাহের জন্ম হয় এবং ১৯১৯ সালে তাঁর জীবনাবশান ঘটে।[১১] বেলতলায় পৈত্রিক বাস্তুভিটেই তিনি সমাহিত আছেন। দুদ্দু-জনক ঝড়ুমণ্ডল একজন কৃষক ছিলেন। তাঁর চার পুত্র ছিল। তাঁদের নাম যথাক্রমে মধু মণ্ডল, পিরু মণ্ডল, গরাই মণ্ডল এবং দুদ্দু শাহ। বয়সে দুদ্দুই কনিষ্ঠ। হরিশপুর শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। দুদ্দু অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর ছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করেন। স্থানীয় আলেম-মৌলবিগণের কাছে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। হরিশপুর

নিবাসী মদনদাস গোস্বামী তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ এবং চৈতন্যচরিতামৃত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। মোট কথা, দুদ্দু শাহ বাল্য থেকেই একজন পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠেন।

তখন হরিশপুরে বহু সাধু-দরবেশের বসতি ছিল। এঁদের সংস্পর্শে এসে দুদ্দু শাহ ভাববাদী হয়ে ওঠেন। ফকিরি মতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সদগুরুর সন্ধান করতে থাকেন। এ সময় তিনি দেশভ্রমণে বের হন এবং যশোর-নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে অবশেষে তৎকালীন মহকুমা শহর কুষ্টিয়ায় আগমন করেন। এখানে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় সাধক- প্রবর লালনের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। দুদ্দু লালনের সঙ্গে ধর্মালোচনায় রত হন। শেষে এই আলোচনা তর্কযুদ্ধে পরিণত হয়। তর্কে দুদ্দু পরাস্ত হয়ে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দুদ্দু শাহ নিজেই বলেছেন —

বাহাছ করিতে এসে বয়াত হইনু,
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।[১২]

ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় গুরুসেবায় (পিরের পায়রবি) দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে দুদ্দু ঘর-সংসারে ফিরে আসেন এবং বেলতলায় আবার বসবাস শুরু করেন।

হরিশপুর নিবাসী সাধক পাঞ্জু শাহের সঙ্গে দুদ্দু শাহের বেশ হৃদ্যতা জন্মে। বয়সে তিনি পাঞ্জু শাহ অপেক্ষা বড় ছিলেন। তবে, ভাবগীতির স্রষ্টা এবং চিশতিয়া খান্দানী ফকির হিসেবে উভয়ের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য ও সদ্ভাব দেখা যেত। সাধক দুদ্দু শাহ লালন শাহের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন। স্বভাব কবিত্ব তাঁকে অসংখ্য সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা লাভ করেছি মূল্যবান মরমী সংগীতসম্ভার। সারা জীবন অসংখ্য ভাবগান ছাড়াও তিনি কয়েকখানা কাব্য রচনা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁর কাব্যগুলো সব উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কেবল 'লালন-চরিত' ও 'নূরে মোহাম্মদী' নামীয় দু-খানা পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৩] 'লালন-চরিত' পাণ্ডুলিপিটি ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব যথাক্রমে 'সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মাসিক মদিনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।[১৪]

দুদ্দু শাহের ভাষা প্রাণবান, ছন্দ উর্মিমুখর ও রচনাশৈলী অভিনব। নমুনাস্বরূপ তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি —

নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও আমায়॥
তবে দয়াময় তোমায় জানা যায়॥
স্বভাব দোষে আমারই মন,
বাগ ছেড়ে বিবাগে গমন,
হীন হয়েছি ভজন-সাধন
দাও চরণ স্ব-করুণায়॥

সাধনে পারগ যে জন,
ভক্তি-বলে পায় সে চরণ,
সাধনহীন না পেলে চরণ,
কে বলে করুণাময়॥
জগতকে করিতে তারণ,
প্রতিজ্ঞা তোমার নিরূপণ,
গুরু-রূপ করিয়া ধারণ,
কৃপাসিন্ধু জানি তোমায়॥
পতিত যদি পতিত রবে,
প্রতিজ্ঞা পালন কৈ হবে,
দুদ্দু কয় কলঙ্ক রবে,
পতিত-পাবন নাম কই রয়॥[১৫]

মনিরুদ্দিন শাহ (১৮২০-১৯০৫)

লালন শাহের আর একজন উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন মনিরুদ্দিন শাহ। তাঁর আসল নাম ছিল মনিরুদ্দিন বিশ্বাস। ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার মালিপাড়া গ্রামে ১৮২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দ মণ্ডল এবং পিতামহের নাম হিসাবউদ্দিন মণ্ডল। মনিরুদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। তিনি পশ্চিম আবদালপুর (কুষ্টিয়া) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। তৎকালীন অতটুকু বিদ্যাই জীবনযাত্রা নির্বাহে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।[১৬]

মনিরুদ্দিন শাহ সে সময় ঐ অঞ্চলের মধ্যে বিজ্ঞ, শক্তিমান এবং সম্মানী লোক বলে গণ্য হন। সংসার-জীবনে তিনি কর্তা ছিলেন। উপযুক্ত কর্তৃত্ব সত্ত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছয়াদ্দির সাথে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। ছয়াদ্দির হাতে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন শাহের আখড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর গুণগ্রামের পরিচয় পেয়ে লালন তাঁকে শিষ্য করেন। লালন যখন মুখে মুখে গান রচনা করতেন, তখন মনিরুদ্দিন তা খাতায় লিখে রাখতেন।

মনিরুদ্দিন শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি লালন-সঙ্গীতের শ্রুতি-লিপিকর হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি লালন শাহের সিজরানামা বা সিলসিলা প্রণয়ন। বলাবাহুল্য, এই সিজরানামা অনুসারে লালন শাহ চিশতিয়া খান্দান এবং নিজামিয়া গোরোভুক্ত ফকির ছিলেন, এটাই প্রমাণিত হয়।[১৭]

মনিরুদ্দিন শাহ হরিণাকুণ্ডু থানার হিংয়েরপাড়া গ্রামে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। মনিরুদ্দিন শাহ কিছুসংখ্যক ভাবগীতি রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর কয়েকজন শিষ্য ছিলেন। হরিয়ারঘাট (হরিণাকুণ্ডু থানা) নিবাসী খোদা বকশ শাহ ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। বলাবাহুল্য, খোদা বকশ শাহের প্রধান শিষ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর গ্রামের ভাবগীতির গায়ক শুকচাঁদ (শুকুর আলী) শাহ এবং

শুকচাঁদ শাহের শিষ্য, খোদা বকশ বিশ্বাস ওরফে খোদা বকশ শাহ (যাঁকে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা)।

মনিরুদ্দিন শাহ ১৯০৫ সালে ইহলীলা ত্যাগ করেন। ছেঁউড়িয়াতে তাঁর মাজার বর্তমান আছে। লালন শাহের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মনিরুদ্দিন শাহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভোলাই শাহ (১৮৪৫-১৯৪০)

ভোলাই শাহ ১৮৪৫ সালে (১২৫২ বঙ্গাব্দে) কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী উদিবাড়ি মজমপুর গ্রামে এক তন্তুবায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাহাদুর শাহ। তাঁর পিতাও একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক ছিলেন। পৈত্রিক প্রভাবে ভোলাই শাহের মনেও ঐকান্তিক ভক্তি উদয় হয়। তাঁরই সন্ধান-মানসে তিনি ছেঁউড়িয়ায় গিয়ে লালন শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাধন-ভজনে তিনি এত দক্ষতা অর্জন করেন যে, লালন তাঁকে আপন ঔরসজাত সন্তান বলে মনে করতেন। নিজের পালিতা কন্যা পিয়ারী বেগমের সাথে ভোলাই শাহের বিয়ে দেন।[১৮]

ভোলাই শাহ অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। লালন-সঙ্গীত ভাবের আবেগে তিনি একতারা সহযোগে গাইতেন। সংসার ত্যাগী সাধক হলেও তিনি জীবিকার জন্যে নানা প্রকার কাজ করতেন।

লালন শাহের পরলোকগমনের পর শীতল শাহ এবং ভোলাই শাহ ছেঁউড়িয়ার আখড়া তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ফকির মহলে শীতল শাহ 'বড় ফকির' এবং ভোলাই শাহ 'ছোট ফকির' বলে পরিচিত ছিলেন।

ভোলাই শাহ ৯৫ বছর বয়সে ১৯৪০ সালে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দে) ৯ অগ্রহায়ণ সোমবার ইহলোক ত্যাগ করেন। ভোলাই শাহর মৃত্যুর ৩/৪ বছর পরে তাঁর স্ত্রী পিয়ারী বেগমের ভবলীলা সাঙ্গ হয়।[১৯]

কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় ভোলাই শাহের বহু শিষ্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কোকিল শাহ, ইসমাইল শাহ, সখাতুল্লাহ শাহ, গোলাম ইয়াছিন শাহ প্রমুখ ছিলেন প্রধান। ভোলাই শাহ কিছুসংখ্যক ভাবগীতি রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত একটি গান উদ্ধৃত করা হলো—

পাঁকে পাঁকে তার ছিড়ে যায় দৌড়াদৌড়ি সার॥
মনের অনুরাগ তরীতে একান্ত চিত্তে হও রে সওয়ার॥
ছয় রিপুকে বশ করিয়া
নামের পেরেক দাও আটিয়া
হিংসা নিন্দা কাঠ কাটিয়া
পোক্ত কর তরী তোমার॥
শুদ্ধ রাগের কর পাটাতন
গুণ-মাস্তুলে কপির সৃজন
চল যেথায় মানুষ-রতন
ধর্ম-বাদাম দিয়ে এবার॥

মানুষ-রতন কাঁচা সোনা
জীবন থাকতে তা দেখলাম না
ভোলাই বলে উর্ধ্বরতি, জ্বালাও বাতি
ঘুচবে মনের অন্ধকার॥[২০]

পাঁচু শাহ (১৮২৩-১৯২৮)

পাঁচু শাহ ১৮২৩ সালে (১২৩০ বঙ্গাব্দ) কুষ্টিয়া জেলার উজানগ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্গত সোনাইডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জমীর মিস্ত্রী। পাঁচুর পূর্বপুরুষ হরিণারায়ণপুরের নিকটবর্তী ঢলনগর গ্রামে বাস করতেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। আলামপুর (কুষ্টিয়া) স্কুল থেকে পাঁচু মাইনর পাশ করেন।[২১]

কমলাপুর ইউনিয়নের জোতপাড়া গ্রামে পাঁচুর বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম ফেলানী নেছা। পাঁচুর মৃত্যুর আগেই তাঁর স্ত্রী মারা যান। এই মহিলা সতীসাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন।

মনের স্বাভাবিক আকর্ষণে ধর্মলাভের প্রেরণায় পাঁচু মরমী সাধক লালন শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাবভক্তির জন্যে তিনি লালন শাহের অন্যতম প্রিয় শিষ্য বলে গণ্য হন। লালন এই প্রিয়ভক্তের বাড়িতে ঘোড়ায় চ'ড়ে যাতায়াত করতেন বলে শোনা যায়। লালন শাহের জীবিতকালে পাঁচু শাহ প্রায়ই ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় থাকতেন। গুরুর তিরোধানের পর তিনি সোনাইডাঙায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

পাঁচু শাহের অনেক শিষ্য-সাগরেদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভাদু মোল্লা (বংশীতলা), আদু ফকির (চৌড়হাস), নাসের শাহ (ছেঁউড়িয়া), ছমির শাহ (ভাদালিয়া), আলী বিশ্বাস (ভাদালিয়া) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবাংলায় রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলেও তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের লোকই তাঁর কাছে অধ্যাত্ম-উপদেশ গ্রহণ করতেন।[২২]

পাঁচু শাহের পুত্র জয়নাল শাহ পিতার মত ও পথ অনুসরণ করে সিদ্ধ সাধক হয়েছিলেন। জয়নাল শাহ লালন-শিষ্য মহরম শাহের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জয়নালের জন্ম ১৮৫৫ সালে এবং মৃত্যু ১৯২০ সালে। পাঁচুর ভ্রাতুষ্পুত্র সাবের মিস্ত্রীও একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক ছিলেন। সাবের মিস্ত্রীর কন্যা বছিরণ নেছা বর্তমানে এই মতাবলম্বী সাধিকা।

পাঁচু শাহ ১৯২৮ সালে ১০৫ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। পাঁচু রচিত অনেকগুলো ভাবগান আছে। নমুনাস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি —

মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে, হায়রে॥
যে ধারার সঙ্গে আছে মানুষ, ধর সে ধারায় রে॥
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগের ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
সেই নদীতে বাঁধ বাঁধিলে
মানুষ ধরা যায় রে॥

যখন নদীর হুমা ডাকে
ঐহিক পড়ে বিষম পাঁকে
কামকুম্ভীরে এসে তাকে
অমনি ধরে খায় রে॥
লালন শাহ বলে রে পাঁচু
বুদ্ধি তোর নাইরে কিছু
রসামৃত পান করিলে
মৃত্যু হরণ হয় রে॥[২৩]

লালন শাহের সঙ্গীতশিষ্য-প্রশিষ্যগণ

পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪)

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামটি পাঞ্জু শাহের বাসস্থান। তাঁর পবিত্র সমাধিভূমিও এখানে। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা। ১৮৫১ সালে (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) ঐ গ্রামে (শৈলকুপা) তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম খাদেম আলী খোন্দকার। পাঞ্জু শাহ ছিলেন পাঠান বংশীয় জমিদার-নন্দন। তাঁরই ভাষায় তাঁর বংশ পরিচয় উদ্ধৃত করছি —

পাঠান কুলেতে জন্ম জানিবা আমার।
হপ্তম কুরছি নাম লিখি পর পর॥
নেয়াবেশ খাঁর বেটা দুদ্দু নাম তাঁর।
এলেছ খাঁ তাঁর বেটা আফজাল আর॥
আবজাল খাঁর বেটা ছোবহান খোন্দকার।
তিনা হতে খোন্দকারী দাদাজী আমার॥
খাদেম আলী খোন্দকার মেরা বাপজান।
তার বেটা হীন পাঞ্জু অতি হতজ্ঞান॥
হীন পাঞ্জু খোন্দকার আল্লার গোলাম।
সাত পুরুষের নাম হইল তামাম॥[২৪]

খাদেম আলী খোন্দকার খুবই ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সংসারের প্রতি উদাসীন করে তুলেছিল। ফলে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত পাঁচ শ' বিঘা খামার সম্পত্তি, কয়েক হাজার টাকা আদায়ের জমিদারী কিছুরই প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। এ সুযোগে তাঁরই বেতনভুক্ত গোমস্তা সম্পত্তির সেস বাকি ফেলেন। বাকি সেস-আইনের আওতায় ফেলে 'গোমস্তা মশাই' খাদেম আলী খোন্দকারের বহু সম্পত্তি আপন স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নামে খরিদ করে নেন।

সম্পত্তির মোট অংশ যখন এভাবে কর্মচারীর কুক্ষীগত হয়ে গেছে, তখন জনৈক হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি খোন্দকার সাহেবকে এ কথা জানান। খোন্দকার সাহেব তখন তাঁর গোমস্তা মশাইকে কঠোর হুঁশিয়ারী সংকেত দেন। গোমস্তা তখন খোন্দকার সাহেবের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করলে খাদেম আলী সাহেব শিশুপুত্র পাঞ্জু ও ওছিমকে নিয়ে হরিশপুর চলে যান।

পারিবারিক নিয়ম অনুসারে বাল্যকাল থেকে পাঞ্জু শাহকে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জু শাহ কৈশোরে স্বচেষ্টায় হরিশপুর নিবাসী মহর আলী বিশ্বাসের কাছে বাংলা ভাষা শেখেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি সংসারজীবন শুরু করেন। ২৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। হরিশপুর তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সকল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান এ গ্রামে মিলিতভাবে বাস করতেন। সুফি ফকিরদের মধ্যে জহরদ্দি শাহ, পিজিরদ্দিন শাহ, লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ প্রমুখ সুফিতত্ত্ববিদ দরবেশ এবং হিন্দুদের মধ্যে মদনদাস গোস্বামী, যদুনাথ সরকার, হারানচন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি সমবেতভাবে বৈষ্ণবসাহিত্য, বেদান্ত, ইসলামের সুউচ্চ তাছাওয়াপের সুগভীর তত্ত্বালোচনায় তৃপ্তি লাভ করতেন।

পাঞ্জু শাহ কৈশোর কাল থেকেই সুফিমতবাদ, ভক্তিমূলক ভাবগান এবং তাছাওয়াপ তত্ত্বে বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। হরিশপুর নিবাসী হিরাজতুল্লাহ খোন্দকার তাঁর মুরশিদ বা দীক্ষাগুরু ছিলেন। পাঞ্জু শাহের ভাষায় তাঁর মুরশিদের পরিচয় এরূপ —

গুরুজীর নাম লিখি করিয়া ছালাম।
হয়ে আছে হীন পাঞ্জু যাহার গোলাম॥
জানিবে যে খোন্দকার হিরাজতুল্লায়।
আমার গুরুজি তিনি বড় দয়াময়॥
মোকাম তিনার যে হরিশপুর গ্রাম।
অধীনের তথা বাসা জানিবে তামাম॥[২৫]

বলাবাহুল্য, পাঞ্জু শাহের গানের ভণিতায় 'হিরুচাঁদ' পাওয়া যাচ্ছে। এই 'হিরুচাঁদ' হিরাজতুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত নাম। এ সম্বন্ধে পাঞ্জু নিজেই বলেছেন —

হিরাজতুল্লাহ খোন্দকার, তিনার কদম সার
করিলে পাইব পরওয়ার।
তিনি ত আল্লার অলি, হিরুচাঁদ গানে বলি,
তা বিনে না দেখি কিনার॥[২৬]

গুরুর আশীর্বাদে পাঞ্জুর আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটে। তাঁর মহত-চরিত্র, ধর্মতত্ত্বে অগাধ জ্ঞান দেখে বহু ব্যক্তি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পৌঢ় বয়সে পাঞ্জু শাহ খেরকা-খেলাফত অর্থাৎ ফকিরি পোশাকাদি গ্রহণ করে পূর্ণ ফকিরি জীবনযাপন করতে থাকেন। তাঁর ফকিরি জীবন বনবাসী বা সংসারত্যাগী জীবন নয়। তিনি খেলাফতধারী ফকির হয়েও বিচিত্র কর্মমুখর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, সমাজ, জীবন ও জগত তাঁর আশাবাদী মানসক্ষেত্রকে ভাববাদের সমৃদ্ধ ফসলে ভরিয়ে তুলেছিল, যেখানে তিনি দেহ থেকে দেহাতীত, কামনা থেকে নিষ্কাম এবং ঐহিক থেকে পারত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

পাঞ্জু শাহের শিষ্যগণের মধ্যে রহিম শাহ, আরমান শাহ, সদয় শাহ, আনার শাহ, হিরু শাহ, (বসন্তপুর), মাতাম শাহ, হায়দার শাহ, জুমমন শাহ (খোরাসান), আঁধারী শাহ, ফিকির শাহ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জু শাহের দুজন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে খোন্দকার শামসউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি ও ভাবগীতি রচয়িতা ছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে খোন্দকার রফিউদ্দীন, খোন্দকার শফিউদ্দিন, খোন্দকার রইচউদ্দীন এবং জয়তুন নেছা জন্মগ্রহণ করেন। বহু গুণে গুণমান এই তাপস ১৯১৪ সালে (১৩২১ বঙ্গাব্দ) ২৮ শ্রাবণ ৬৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মাজার হরিশপুরে বিদ্যমান। প্রতি বছর ৭ আষাঢ় এখানে মরমী সাহিত্য সম্মেলন এবং স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[২৭]

পাঞ্জু শাহের কবি-প্রতিভা ও বাংলার সাধক সমাজে তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা নির্ণয় প্রসঙ্গে রফিউদ্দীন (সাধক ও লেখক) বলেন, 'বাংলার সুফি ফকিরদের মধ্যে লালনের স্থান সর্বোচ্চ, কিন্তু লালনের তিরোধানের পর যিনি সারা বাংলায় ফকির মহলে লালনের মতই উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন, তিনি ফকির পাঞ্জু শাহ। লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হতেই প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত পাঞ্জু শাহ অনেকটা লালনের শূন্য স্থান পূরণ করে রেখেছিলেন। লালনের মতো তাঁর রচিত গান বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায় এবং ফকির মহলে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়।'[২৮]

পাঞ্জু শাহের সাহিত্যকর্ম ব্যাপক না হলেও সমৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গীতের সুর মরমে গিয়ে আঘাত করে এবং হৃদয়তন্ত্রীতে ভাবের আবেশে অপূর্ব ঝংকার তোলে। অসার সংসার-দর্পণে মানব-জীবনের যথার্থ কর্তব্যটি যেন ছায়াছবির মতো ফুটে ওঠে।

সাধকপ্রবর লালনের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে পাঞ্জু শাহ সঙ্গীত-সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বৃদ্ধ বয়সে লালন শাহ ছেঁউড়িয়ায় একসাধু সভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় তিনি প্রশ্নমূলক দুটি গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত রসিক বৈষ্ণব ও ওলি-দরবেশগণের কাছে গান-দুটির জবাব চান। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের আকুল আহ্বান সত্ত্বেও যখন কোনো সাধক উক্ত গান দুটির জবাব দিতে পারেন না, তখন তরুণ সাধক পাঞ্জু শাহ ঐ গান দুটির জবাব দেন। গান শুনে লালন সেই বৃদ্ধ বয়সেও 'কে রে বাবা, আয়, আমার কাছে আয়' বলে পাঞ্জু শাহকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর পাঞ্জু শাহকে লালন-পরবর্তী সময়ের ফকির সমাজের নেতা মনোনীত করে তিনি ঐ সভাতেই তা ঘোষণা করেন।[২৯] সেই থেকে পাঞ্জু শাহ আজীবন লালন-পরবর্তী সাধকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী ছিলেন। সুধী সমাজের অবগতির জন্যে লালনের গান-দুটির একটি এবং পাঞ্জু কর্তৃক তার জবাব এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

প্রশ্ন : লালন —

কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ করে॥
শুনলে জ্ঞান হয়, তাইতে সুধাই
যে জান সে বল মোরে॥
হাওয়া রুহু লতিফারা
হুজুরের কারবারী তারা
বে-মুরিদ হলে এরা
হুজুরে কি থাকতে পারে॥

মুরশিদ বালকা এই দুই জনে
বসত করে কোন মোকামে
জানলে আঁধার যেত মনে
দেখতাম কুদরত আপন ঘরে॥
নতুন সৃষ্টি হলে পরে
মুরশিদ লাগে শিক্ষার তরে
বলে লালন সব পুরাতন
নতুন সৃষ্টি হচ্ছে কেরে॥[৩০]

উত্তর : পাঞ্জু শাহ—

মুরশিদ তত্ত্ব কে সুধায়, চিনতে নারে॥
যে সুধায় জ্ঞান পাবার আশে
সে কি পুরাতন নহে রে॥
রুহু ইনছানি হায়ানি
মুরশিদ-বালকা এ দুই শুনি
লেখে ফোরকানে।
মহামায়া রিপুর ভোলে
হায়ানি পড়ে গোলমালে
আপন মুরশিদ ইনছানিরে
না চিনে পড়েছে ফেরে॥
হাওয়া লতিফা রুহানি
সবের মুর্শিদ হয় ইনছানি
পূর্ব-পরে তাই।
মুহম্মদী রুহু রহে রে
ইনছানি লা-মোকাম নূরে
হায়ানি কালেবে থেকে
না চিনে মুরিদ হয় রে॥
বে-মুরিদ অজুদেতে
কেহ নাই, তা সত্য বটে
চিনারই দরকার।
দয়া করে মুরশিদ দেখায়
তারে মুরশিদ বলিতে হয়
পাঞ্জু বলে আঁধার ঘুচায়
থাকব তাঁর চরণ ধ'রে॥[৩১]

পাঞ্জু শাহ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাধক লালন শাহের গানের উত্তর দেবার মধ্যদিয়ে তাঁর যে সঙ্গীত-স্রষ্টার জীবন শুরু হয়, পরবর্তীকালে আত্মিক সাধনায় তা আরো

সার্থক ও সুন্দর হয়ে অসংখ্য মরমী গান রচনায় নিয়োজিত হয়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে জাতি বর্ণ ও গোত্রের অতীত এক শাশ্বত মানব-সমাজের জয়-কীর্তন আজ আমাদের মনে নিবিড় শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। পাঞ্জু শাহের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সাহিত্যকীর্তি তাঁর 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' কাব্য (রচনা কাল ১৯০৭)।[৩২] তাঁর গানগুলোও বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। বাউলের সুর, কীর্তনের ভাব, গজলের তান এবং ক্লাসিকের লয় সংযুক্ত হয়ে তাঁর গানগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। একজন কবি, সংস্কারমুক্ত চিন্তাশীল মানুষ, সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক, শুচিশুদ্ধ দরবেশ এবং লালন শাহের অদ্বিতীয় সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলার মরমী সাহিত্যে পাঞ্জু শাহের নাম চিরস্মরণীয়।

ওছিমুদ্দিন খোন্দকার (১৮৫৬-১৮৯১)

বাংলাদেশের সিদ্ধ-পুরুষদের মধ্যে দরবেশ ওছিমুদ্দিন খোন্দকার অন্যতম। তাঁর অধ্যাত্ম-শক্তি, সাধনা ও মনোবল ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন বাক্যসিদ্ধ তাপস। তাঁর অলৌকিক শক্তিমত্তার অনেক কাহিনী অদ্যাবধি কিংবদন্তি আকারে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এই শক্তিমান সাধক পাঞ্জু শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি সাধারণের কাছে 'ওছিম শাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে (১২৬৩ বঙ্গাব্দ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩] তিনি যখন একেবারেই শিশু, তখন তাঁর পিতা খাদেমালী খোন্দকার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হয়ে শৈলকুপা (ঝিনাইদহ) পরিত্যাগ করে জমিদারী ফেলে রেখে হরিশপুর গ্রামে গিয়ে দরিদ্রহালে বাস করতে থাকেন।

বাল্যকালে ওছিম সামান্য আরবি-ফারসি শিক্ষা করেন। অতঃপর হরিশপুরের তৎকালীন পরিবেশের প্রভাবে গানের দলে যোগ দেন। কথিত আছে যাত্রাদলে তিনি ছিলেন কণ্ঠশিল্পী।

পরবর্তীকালে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে তিনি বারো বছর আসামের জঙ্গলে নির্জন তপস্যায় অতিবাহিত করেন। কামরুপ, কামাক্ষ্যা প্রভৃতি স্থানে তিনি আত্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করার সাধনায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন এবং সিদ্ধি লাভ করেন।

দীর্ঘদিন পর তিনি বাড়ি ফিরে বিয়ে করেন এবং সংসারী হন। মন যার ঘর ছাড়া ছন্নছাড়া, তিনি কি আর ঘরে মাথা দিতে পারেন? ওছিম শাহ মাথায় দীর্ঘ জটা, মুখে দাড়ি, হাতে চিমটা, গায়ে খেরকা, কাঁধে আঁচলা-ঝোলা, পায়ে খড়ম দিয়ে মজ্জুব হালে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মে মাত্র। তাঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

এই মহাসাধক ১৮৯১ সালে ইহালোক ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত কোনো ভাবসঙ্গীত নেই।[৩৪] তবে পাঞ্জু শাহ-রচিত সব গানেই তিনি সুরারোপ করেছেন। ভাবগীতির সুরশিল্পী হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। সত্যের অনুরোধে অতি বিনয়ে জানাতে পারি যে, এই মহামান্য দরবেশের পুত্র খোন্দকার লুৎফর রহমান ইহলোক ত্যাগ করেছেন। লুৎফর রহমানের পুত্র খোন্দকার আহাম্মদ আলী এবং এই নগণ্য লেখক (খোন্দকার রিয়াজুল হক) আজো জীবিত।

শামসউদ্দিন খোন্দকার (১৮৭৭-১৯৪৮)

সাধক পাঞ্জু শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শামসউদ্দিন খোন্দকার। ১২৪৪ (১৮৭৭ ইং) বঙ্গাব্দের ৮ অগ্রহায়ণ তিনি হরিশপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৫]

শামসউদ্দিন বাল্যকালে শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। তিনি অত্যন্ত শ্রুতিধর ও মেধাবী ছিলেন। নিম্নপ্রাথমিক পাশ করার পর তিনি আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন।

যৌবনে ঝিনাইদহ জেলার বাকুয়া গ্রামে বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর সাত-আটটি সন্তান জন্মে। তাঁদের মধ্যে খোন্দকার গোলাম কুদ্দুস আজো জীবিত।

খেরকা গ্রহণ করে তিনি পূর্ণ ফকিরি জীবন যাপন করেছেন। পিতার মত ও পথ অনুসরণ করে মরমী সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। কুষ্টিয়া জেলার দহকুলা গ্রাম-নিবাসী সৈয়দ শাহ কামালউদ্দিন তাঁর দীক্ষাগুরু (মুরশিদ) ছিলেন।

তিনি বেশ কিছু ভাবসঙ্গীত রচনা করেন। 'রফিউদ্দীনের ভাবসঙ্গীত' নামীয় মরমী সঙ্গীত সংকলনে (প্রথম সংস্করণ) ঐ গানগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রখ্যাত দরবেশ ও সাধক কবি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের (১৯৪৮) ২২ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ইহলোক ত্যাগ করেন।[৩৬] লালন শাহের সঙ্গীত-অনুসারী মরমী কবি হিসেবে শামসউদ্দিন খোন্দকার সার্থক।

খোন্দকার রফিউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৯)

খোন্দকার রফিউদ্দীন পাঞ্জু শাহের মধ্যম পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শামসউদ্দিন খোন্দকার এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রইচউদ্দিন খোন্দকার। বাংলা ১৩১১ সালের (১৯০৪) ৫ অগ্রহায়ণ বিকাল ৪টার সময় রফিউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন।[৩৭]

নয় কিংবা দশ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। প্রথমে শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় (হরিশপুর) পরে জোড়াদহ হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রিপ্রাপ্তি তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। কারণ দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

সংসার জীবন, সমাজ, দেশ-কাল-পাত্র নিয়ে চলেও পিতার মত ও পথ আঁকড়ে ধরে তিনি পারত্রিক মংগলের পথে চলতে চেয়েছেন সারা জীবন। কোনো বাধাবিঘ্নই তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি।

তাঁর অধ্যাত্ম শিক্ষক বা মুরশিদ (দীক্ষাগুরু) ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার দহকুলা গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত সুফি সাধক, আস্তানা বাটীর পিরকেবলা হজরত মৌলানা সৈয়দ শাহ কাছেম আলী। গুরুর আশীর্বাদে তাঁর জীবন ধন্য হয়। তাঁর পুত চরিত্র, গভীর তত্ত্বজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয়ে বহু লোক তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রওশন আলী সরকার (পাবনা), হেদায়েতুল্লা (রাজশাহী), জোনাব আলী মল্লিক (ফরিদপুর, ঢাকা বেতার

শিল্পী), পিজির শাহ (কুষ্টিয়া) ইত্যাদি ছিলেন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনো সারা বাংলায় এই সাধকের অসংখ্য শিষ্য রয়েছেন।

রফিউদ্দীন শুধু একজন সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ফোকলোর সংগ্রাহক এবং লোকসাহিত্য গবেষক। তদীয় পিতা পাঞ্জু শাহের 'ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর' কাব্যের এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে প্রথম তিনি সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেন।[৩৮] বাংলা একাডেমী, ঢাকা বেতার প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বহুবার তিনি লালন-পরিচিত বিষয়ক বক্তৃতা রাখেন।[৩৯] তাঁরই প্রচেষ্টায় লালন-গবেষণা অনেকটা সার্থক হয়েছে। নিজস্ব ভূমিকা এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি লালন-জীবনী সম্বলিত 'ভাবসঙ্গীত' নামীয় একখানা সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়।[৪০] লালন, পাঞ্জু প্রমুখ সাধক কবিগণের যথার্থ উত্তরসূরি সাধক রফিউদ্দীন। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি এই মরমী সাধক দেহত্যাগ করেন। হরিশপুর পাঞ্জু শাহের মাজারের পাশে তাঁর মাজার বর্তমান আছে।

জহরদ্দি শাহ (১৮৪২-১৯০৮)

লালন শাহের আর একজন ভাবশিষ্য ছিলেন সাধক কবি জহরদ্দি শাহ। যতদূর জানা যায়, তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া। তাঁর পিতা মেছের শাহ চিশতিয়া খান্দানী ফকির ছিলেন। জহরদ্দি শাহ পৈত্রিক সূত্রে মরমী চিন্তাধারা লাভ করেন। পরবর্তীকালে ইনি লালন শাহের সঙ্গীত রচনারীতি ও ভাবধারায় যথেষ্ট প্রভাবিত হন।

মেছের শাহ হরিশপুরে আখড়া তৈরি করে বসত করতে থাকেন। পাঞ্জু শাহের আখড়া-বাড়ির পাশেই এ আশ্রম ছিল। হরিশপুরের মরমী আবহাওয়ায় জহরদ্দি বড় হয়ে ওঠেন। বিবাহ করে পিতার অবর্তমানে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন।

জহরদ্দি শাহ উজল শাহ নামে জনৈক খ্যাতনামা দরবেশের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, সদগুরুর প্রভাবে তিনি তত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষ ও ভাবগীতির রচয়িতা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। জহরদ্দি শাহ অত্যন্ত অনুরাগী সাধক ছিলেন। দরবেশ পাঞ্জু শাহের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব জন্মে। পাঞ্জু শাহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি ভাবগান রচনা করতেন। এই মহান সাধক এবং সুফিতত্ত্ববিদ ১৮৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৮ সালে পরলোক গমন করেন।[৪১] তাঁর রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি —

জানতে হয় নবীজীর বেনা।।
(খোদার) নুরেতে নুরনবী পয়দা
নবীর নুরে ছার দুনিয়া।।

নবী পয়দা হন নূরে
সে ভেদ অতি গভীরে
রাগ দেহ ছিল পূর্বে রাগেরই ঘরে
নবী জন্মিল আবদুল্লার ঘরে
তারে কেউ মানে কেউ মানে না।।

নবী আলাহেচ্ছালাম
লেহাজ চার মোকাম
কোন্ মোকামে থেকে নবী
ধরিলেন খাস্ নাম

জানলে সে নাম, হবে খোশ নাম
পানা দিবে সাঁই রব্বানা।।

হুয়াল আওয়ালে নবী
হুয়াল বাতেনে নবী
জাহেরাতে সেই নবী হয়
আদম ছফি।
আখেরাতে নবী পাখি,
জানগে নবীর উপাসনা।।

নবী আপনি মকবুল
নবী খোদারই মকবুল
করলেন কিনা করলেন নবী
সেই কথাটি স্থুল।
জহর বলে দেহ পয়দা কিসে
বাপের বীজে জানঘটনা।।[৪২]

আরো কতিপয় সাধক

সৈয়দ শাহ কাছেম আলী (১৮৫৩-১৯৩৪)

কুষ্টিয়া সদর থানার এলাকাধীন দহকুলা গ্রামে ১২৬০ (১৮৫৩ ইং) সালে এই সুফি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ শাহ গোলাম আলী। তাঁর আরো তিন ভাই ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে সৈয়দ শাহ হাসেম আলী, দরবেশ কামালউদ্দীন ওরফে মনসুর আলী এবং সৈয়দ শাহ ইবনে আলী।

কাছেম আলী বয়সে সকলের বড়। গ্রামের মক্তবে এবং কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় তাঁর ভাল দখল ছিল। তাঁর রচনাবলীতেই এ প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি খোরাসান নিবাসী অন্ধ হাফেজ নামে পরিচিত জনৈক সুফি সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফাত প্রভৃতি সব স্তরেই তিনি সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলো জলসায়-মৌলুদ, হরিসভা, সবুরের গুণ, মৌলুদ শরীফ, দেল পিঞ্জিরা, শ্রীশ্রী কৃষ্ণকথা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে 'জলসায় মৌলুদ' গ্রন্থখানা ছাপা হয়েছিল। বাকিগুলো প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির

সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৪৩] ১৯৩৪ সালে এই সুফি সাধক ইহলোক ত্যাগ করেন। দহকুলায় তাঁর মাজার বর্তমান রয়েছে।

পাগলা কানাই : (১৮০৯-১৮৮৯)

কবি পাগলা কানাই লালনশাহী ভাবধারায় কিংবা বাউল সুরে সঙ্গীত রচনা করেন নি। তিনি ধুয়া ও জারিগানের বয়াতি ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে মরমী ভাবের সাধনা ও ঐশী প্রেমের যে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়, তাতে তাঁকে কবি লালনের সমসাময়িক একজন গীতিকার হিসেবে স্বীকার না করে উপায় নেই।[৪৪]

১৮০৯ সালে (১২১৬ বঙ্গাব্দে) ইনি ঝিনাইদহ জেলার নেবুতলা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহারা হয়ে বেড়বাড়ি গ্রামে ভগ্নী স্বরনারী বেগমের আশ্রয়ে ছোট ভাই উজলসহ লালিত পালিত হন। তাঁর মূল নাম কানাই শেখ। তিনি সর্বক্ষণ খোদার ইশকে পাগল এবং ভাবে বিভোর থাকতেন। ফলে, তিনি পাগল কানাই বা পাগলা কানাই নামে অভিহিত হন।

তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। নিরক্ষর গ্রাম্য কবিও যে কত চমৎকার গীতিকবিতা রচনা করতে পারেন, তা তাঁর গানগুলো দেখলে বুঝা যায়।

এই কবি ১৮৮৯ সালে (১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ়) ইহলোক ত্যাগ করেন। লালন অপেক্ষা ৩৭ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও পাগলা কানাই লালনের ১ বছর আগেই মারা যান।[৪৫] তবে তাঁর রচিত সঙ্গীত সুরে, ছন্দে, তালে, মাত্রায় অপূর্ব। তাঁর শিষ্য-সাগরেদদের মধ্যে কালাচাঁদ বয়াতি, হাকিম শাহ, করিম বিশ্বাস, কমরদ্দিন বয়াতি তাঁর সুর ইত্যাদি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজো এ শ্রেণীর বয়াতি গ্রামবাংলায় অনেক স্থানে দেখা যায়।[৪৬]

গোঁসাই গোপাল (১৮৬৯-১৯১২)

গোঁসাই গোপাল ১২৭৬ বঙ্গাব্দে (১৮৬৯) জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা গঙ্গাস্নানের শুভক্ষণে কবিতীর্থ শিলাইদহ গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সাধক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামলাল জোয়ার্দার। রামলাল লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথের সমসাময়িক ছিলেন।[৪৭]

গোপাল ছিলেন খোরশেদপুর এম. ই. স্কুলের ছাত্র। সহপাঠীর সঙ্গে মারামারি করে তিনি স্কুল ছেড়ে দেন। পরে মায়ের কাছে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। কলকাতায় জুটমার্কেটিং বিভাগে এক বছর চাকরি করেন। এক বছর পর চাকরি ছেড়ে বাড়ি আসেন।

এক দরবেশের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। সহজিয়া বৈষ্ণব-ধর্মভিত্তিক তাঁর সাধনা হলেও গোঁসাই গোপাল নির্ভেজাল মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কাছে জাতিভেদ বলে কিছুই ছিল না। বহু মুসলমানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পরপারের পাথেয় সঞ্চয়-মানসে তাঁর উপদেশ মতো কাজ করতেন।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পাঁচুখ্যাপা, বিহারীলাল খ্যাপা, পূর্ণানন্দ খ্যাপা প্রভৃতির নাম বিশেষ স্মরণীয়। গোঁসাই গোপাল বাউল সুরের পাঁচ শতাধিক গান রচনা করেছিলেন। তাঁর গানে ব্যবহৃত উপমা, রূপক ও অলংকারাদি বড় চমৎকার।[৪৮]

এই মহাসাধক ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২) ১৯ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার শুভক্ষণে পরলোক -গমন করেন।

লালন-প্রভাবিত আধুনিক কবি-সাহিত্যিক

ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেক কবি-সাহিত্যিক লালনশাহী মরমী ধারা অনুসরণ করে কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এসব কবি-সাহিত্যিক উনিশ শতকের আধুনিকতা স্বীকার করেও তাঁদের সাহিত্য-কর্মে যে ব্যক্তিনিষ্ঠ অত্মোপলব্ধি এবং পারত্রিক মঙ্গল বিষয়ক চিন্তাধারা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন, তার মূলে লালনশাহী প্রভাব কার্যকর ছিল, এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা।[৪৯] বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কয়েকজন কবি যাঁদের উপর লালনশাহী প্রভাব পড়েছিল, তাঁদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রামমোহন রায় লালনের সমসাময়িক ছিলেন। তবে তিনি ৫/৬ মাসের ব্যবধানে লালনের অগ্রজ। লালন-প্রভাব তাঁর উপর এসেছিল কিনা, বলা কঠিন। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অনুরাগী হয়েও প্রাচ্য সুফি-সাহিত্যের, বিশেষ করে হাফিজ-সাদীর কাব্য-কাননের একজন উন্মত্ত মধুপ ছিলেন। লালনও ছিলেন হাফিজ, সাদী, রুমী প্রমুখ সুফি সাধকের রচনার বিশেষ অনুরাগী। এর ফলে রামমোহনের সাহিত্য এবং লালন-সাহিত্য এক সুরে বেজে উঠেছে। রামমোহনের 'তুহফাত-উল-মুয়াহিদিন' গ্রন্থের সঙ্গে লালন-সঙ্গীতের সাদৃশ্য নিতান্ত সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিও এড়ায় না। উভয়ের রচনা পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে এরূপ গভীর বিশ্বাস জন্মে যে, খুব সম্ভব উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটেছিল।[৫০] একটুখানি নমুনা দিচ্ছি—

রামমোহন—

আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে থাকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে
কর অভিপ্রায়?

লালন—

প্রতিমা গড়ায় ভাস্করে
মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার গুরু বলে তারে
এমন পাগল কে দেখছে।[৫১]

প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে উভয়েরই মতামত উপরিউক্ত ছত্রসমূহে ফুটে উঠেছে। এমনিতর অনেক বিষয়েই দুই মনীষীর সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী রবীন্দ্র-কবিগুরু। বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ গীতি কাব্যধারার ইনিই আদি প্রবর্তক। বাউল সুরের মধুর গান রচয়িতা এবং নদীয়ার গণমানুষের কবি লালন ও তাঁর গীতিধারায় বিহারীলাল প্রভাবিত হন। তারই ফলে বাংলার সুধীসমাজ পেল 'বাউল বিংশতি', 'সাধের আসন', 'সারদামঙ্গল' ইত্যাদি কাব্য। লালন-প্রভাব তাঁর উপর কতখানি কার্যকর ছিল, তা জানা যায় উভয়ের রচনার সাদৃশ্য দেখে।

বিহারীলাল—

ধেয়ায় কাহারে দেবী
নিজে আমি জানিনে,
কবিগুরু বল্মিকীর
ধ্যান-ধনে চিনিনে।

লালন—

আমি একদিন না দেখলাম তারে॥
বাড়ির কাছে আরশীনগর
পড়শী বসত করে॥[৫২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ লালন শাহের কতটা সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা নিয়ে আমাদের সুধী মহলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকলেও তাঁর শিলাইদহে (কুষ্টিয়া) প্রবাসকালে মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে লালনশাহী সমাজের একতারা তাঁকে কিভাবে পাগল করে তুলেছিল এবং তিনি একের পর এক অপূর্ব কাব্যফসলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন সমৃদ্ধ করে তুলছিলেন এবং কিভাবে তাঁর মানসলোকে পলি জমে জমে ধীরে ধীরে লালনের মনের মানুষতত্ত্ব প্রভাবে জীবন-দেবতার চর জেগে উঠেছিল, রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের কাছে তা আজ বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়।

কবিগুরুর সাহিত্য-জীবনে এ কালের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে লালনশাহী সঙ্গীতের প্রভাব কিভাবে 'জীবন-দেবতা' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তাঁর লণ্ডনে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে।

সমালোচকের উক্তি বা গবেষকদের ধারণা বাদ দিয়েও কবিগুরুর নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত করেই এ কথার সত্যতা যাচাই করা যায় যে, তিনি লালন ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের ভাব-সাধনা ও মরমী চিন্তাধারায় সত্যিই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবিগুরু বলেন, 'তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে,
দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, তং বেদ্যং পুরুষং বেদনা যে মৃত্যুর পরিব্যথা। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জান নইলে যে মরণ বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তাঁর গেও সুরে, সহজ ভাষায়— যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা। অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর-তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। অন্তরতর যদমাত্ম। উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।'[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ লালনশাহী অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার সার্থক উত্তরসূরি— এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কত বছর আগে কবিগুরুই বাউল পদাবলীর প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা বলে গেছেন। তাঁর ভাষায় — 'আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছিলাম। শিলাইদহে বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত।'[৫৪]

লালনশাহী প্রভাবে কবিগুরু রচনা করেন বাউল (১৯০৫), আত্মশক্তি এবং মানুষের ধর্ম (১৯৩৩)। এগুলো নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ফসল ও ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনমূলক গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ লালন শাহের গান, এর সুর, ছন্দ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়েও একাধিকবার মন্তব্য রেখেছেন। শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রচারের নিমিত্ত তিনিই ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় লালনগীতি প্রকাশ করে এই সাধককে বাংলা সাহিত্যে-স্থায়ী আসন দেবার প্রস্তাব করেন।[৫৫] আধুনিক বাংলার সাহিত্য-সমাজে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে লালনশাহী ভাবসঙ্গীতের যথার্থ অনুসারী।

কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬)

১২৪০ বঙ্গাব্দে (১৮৩৩ খ্রি.) কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর পিতার নাম হলধর মজুমদার এবং মাতার নাম কমলিনী। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হওয়ায় তাঁর হৃদয় ভাবপ্রবণ হয়ে গড়ে ওঠে।[৫৬] সে কারণে ভবিষ্যৎ জীবনে সংসার, সমাজসেবা, পত্রিকা প্রকাশনা (গ্রামবার্তা প্রকাশিকা) ইত্যাদি কাজের মাঝেও মরমী ভাবসাধনা তাঁর অন্তরকে ব্যাকুল করে তোলে। দৈবক্রমে সাধক লালনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। শ্রদ্ধেয় রায় জলধর সেন এ বিষয়ে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনার অবতারণা করেছেন — 'সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালীর অদূরবর্তী কালীগঙ্গা তীরে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা বলা কঠিন, তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন।'[৫৭]

এই সাক্ষাৎকার ঘটে ১২৮৭ সালে (১৮৮০) কোনো এক সময়ে কুমারখালীতে। এই সাক্ষাৎকারের ফলে কাঙাল হরিনাথের 'ফিকির চাঁদ ফকিরের বাউল দল' গঠিত হয়। এই দলের মারফত সমকালীন হিন্দুসমাজে লালনশাহী ভাবগানের বিস্তার ঘটে। সারা বাংলাদেশে বাউল-ভাববন্যা দেখা দেয়।

কাঙালের রচনার মধ্যে বাউল সঙ্গীত (১৮৮০-৮৪), কাঙাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১৮৮৬-৯৩), আধ্যাত্ম আগমনী (১৮৮৫) ইত্যাদি বাউল সুরের মাধুর্যে ভরপুর।[৫৮] কাঙাল-রচিত বাউল সুরের কতিপয় গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি —

ক. ওহে, দিনত গেল, সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি তোমারে॥

খ. মাটি হতে দেহ তব মাটি হবে জান না,
মাটি হবার আগে তবে কেন মাটি হও না॥[৫৯]

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, সাহিত্য-সমাজে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন, সুসাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন, বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র রায় তন্দ্রাচার্য, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব রায় প্রমুখ মনীষী বাউল সুরের মধুর সঙ্গীত-স্রোতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন। লালন শাহের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে যে কত গভীর হয়েছিল, তা এই সুধী-সাহিত্যিকদের জীবন-কথা ও সাহিত্য-কর্ম পর্যালোচনা করলে জানা যায়।

লালন শাহের উত্তরাধিকারী বলতে তাঁর ভ্রাতৃ-বংশধর, তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ও উপশিষ্য, ভাবশিষ্য, সঙ্গীতশিষ্য, অন্যান্য তাপস এবং আধুনিক বেশ কিছুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিককে বুঝায়। এ ছাড়া আরো বহু সাধুসন্ত ও ফকির-দরবেশ লালনের উত্তরাধিকারী হিসেবে আজো রয়েছেন। কেউ কেউ পরলোকে যাত্রা করেছেন। খোদা বকশ শাহ এঁদেরই উত্তরসূরি। মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্য হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ। এই খোদা বকশের শিষ্য শুকচাঁদ শাহ। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত খোদা বকশ শাহ শুকচাঁদ শাহের শিষ্য। লালনের উত্তরাধিকারী হিসেবে আর যাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে আমরা দিয়েছি, তাঁদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব খোদা বকশের জীবন ও মানসে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের বহু গান খোদা বকশ আয়ত্ত করেছিলেন। আসরে সে সব গান তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করতেন। লালন-শিষ্য ভোলাই শাহ এবং লালনের সঙ্গীত-শিষ্য পাঞ্জু শাহের গানও তিনি মধুর সুরে গাইতেন। কাঙাল হরিনাথের অনেক গান খোদা বকশের সংগ্রহে ছিল। বকশ-রচিত অনেক গানে কাঙালের গানের সুর ও ছন্দের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এ সব বিবেচনা করে খোদা বকশ শাহকে লালনের সার্থক উত্তরসূরি বলতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ আবূ তালিব লালন, শাহ ও লালন গীতিকা, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৫০-৫২।

২ খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

৩. আবুল আহসান চৌধুরী, লোকঐতিহ্য পত্রিকা (কুষ্টিয়া, সম্পাদনা— আনোয়ারুল করীম), প্রথম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ভাদ্র (১৯৭৯-৭২), পৃ. ৫৩।

৪. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, প্রকাশকাল, ১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৩।

৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন মানস ও বাংলা সাহিত্য (পূর্বাচল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৯, পৃ. ৭-৮।

৬. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালান শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, ১৯৭২ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৮।

৭. খোন্দকার রফিউদ্দীন-এর মৌখিক বিবৃতি, তাং ২/৮/১৯৭২।

৮. আইজুদ্দিনের মৌখিক বিবৃতি, তাং ১৬/১০/১৯৭২।

৯. মুহম্মদ আবূ তালিব এঁর বিবৃতি, দ্রষ্টব্য, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ (ছবিরণ, আইজুদ্দিন ও খেপুর ছবি আছে), পৃ. ১৯।

১০. লালন শাহের দ্বি-শততম জন্ম স্মরণোৎসব পালিত হয়, লালনের জন্মভূমি—হরিশপুরে, সাধকের জন্মভিটেই, বাংলা ১৩৭৯ সালের ২৫ চৈত্র, (৮/৪/১৯৭৩)।

১১. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, যশোর, ১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ১৭৫।

১২. ক. দুদ্দু শাহ, লালন-চরিত (পাণ্ডুলিপি), রচনা— ১৩০৩ বাং, অনুলিপি প্রকাশ করেন—এস.এম. লুৎফর রহমান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা (১৩৭৪ = ১৯৬৭)।
খ. সম্পাদনা, মুহম্মদ আবূ তালিব, মাসিক মদিনা, একাদশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৩. 'লালন-চরিত' নামীয় পাণ্ডুলিপি দুদ্দু শাহ কর্তৃক রচিত। পাণ্ডুলিপির প্রথম সন্ধান লাভ করেন নদীয়া জেলার চরব্রহ্মনগর নিবাসী জনৈক রামচন্দ্র মন্ডল, ১৩৫১ (১৯৪৪)। তাঁর কাছ থেকে এটি সমকালীন বাংলা একাডেমীর লোকসাহিত্য সংগ্রাহক লালনপন্থী সাধক 'নারকেল বেড়ে হরিশপুর' (যশোর) নিবাসী শাহ লতিফ আফি আনহু সংগ্রহ করেন। তাঁর কাছ থেকে উক্ত পুথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস.এম. লুৎফর রহমান সংগ্রহ করেন।

১৪. এস.এম. লুৎফর রহমান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, (১৩৭৪ = ১৯৬৭)।

১৫. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৬. খোন্দকার রিয়াজুল হক, বাংলার বাণী, ৯ মার্চ, ১৯৭৪।

১৭. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১ম খণ্ড, ভূমিকা—ঙ।

১৮. আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলার বাণী, ৪ নভেম্বর, ১৯৭৩।

১৯. ভোলাই শাহর জন্ম-মৃত্যু তারিখ আবুল আহসান চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। দ্রষ্টব্য—কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, কুষ্টিয়া, ১৯৭৪, পৃ. ২০৭।

২০. আবুল আহসান চৌধুরী সংগৃহীত। নিবন্ধকার কর্তৃক ফকিরদের শ্রুতি অনুসারে লিখিত।

২১. আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বদেশ, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

২২. পূর্বোক্ত।

২৩. আবুল আহসান চৌধুরীর সৌজন্যে গানটি প্রাপ্ত।

২৪. পাঞ্জু শাহ, ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, ঝিনাইদহ, ১৯৬১, পৃ. ১০৭।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।
২৭. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, যশোর, ১৯৬৬, পৃ. ২য় খণ্ড, 'গ'
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. 'ক'।
২৯. মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।
৩০. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, যশোর, ১৯৬৬, পৃ. ১ম খণ্ড, ২৫, গান নং-৬৭।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২য় খণ্ড-৫৩।
৩২ পাঞ্জু শাহ, ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৯৬১, পৃ. ১০৯।
৩৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, ১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।
৩৪. খোন্দকার আহমদ আলী, মৌখিক বিবৃতি, ১৬/১২/৭০ ইং।
৩৫. জন্মসাল তাঁদের পারিবারিক হিসাব মোতাবেক।
৩৬. এই সাধকের মৃত্যুর তারিখে তাঁর কাছে নিবন্ধকার উপস্থিত ছিলেন।
৩৭. খোন্দকার রফিউদ্দীন, মৌখিক বিবৃতি, ১/১২/৭০।
৩৮. পাঞ্জু শাহ, ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, ঝিনাইদহ, ১৯৬১।
৩৯. খোন্দকার রফিউদ্দীন, বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জুলাই, ১৯৬১।
৪০. ভাবসঙ্গীত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৬৬।
৪১. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি হরিশপুর : ১৯৭২, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১।
৪২. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত : দ্বিতীয় সংস্করণ, (৩য় খণ্ড), পৃ, ১৬।
৪৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহের পুণ্যভূমি : হরিশপুর, ১৯৭২, পৃ. ১ম খণ্ড-৩৭।
৪৪. মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই, ১ম সংস্করণ, জীবনী অংশ দ্রষ্টব্য ।
৪৫. ঝিনাইদহের পার্শ্ববর্তী বেড়বাড়ি গ্রামে কবির মাজারগাত্রে খোদিত তারিখ অনুসারে।
৪৬. মকবুল হোসেন, পাগলা কানাইয়ের মানস দ্রষ্টব্য।
৪৭. আবুল আহসান চৌধুরী, কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, পৃ. ২৪২।
৪৮. আনোয়ারুল করীম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, পৃ. ২৮০।
৪৯. পূর্বাচল পত্রিকা, লালন চরিতের উপাদান তথ্য ও সত্য, ৩য় বর্ষ, মাঘ, ১৩৮১, পৃ. ২৭।
৫০. পূর্বোক্ত।
৫১. তুলনাটি মুহম্মদ আবু তালিবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৫২ পূর্বোক্ত।
৫৩. রবীন্দ্রনাথ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের হারামণি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ১ এবং ২।
৫৪. পূর্বোক্ত, প্রথম পৃষ্ঠার ৪র্থ ছত্র থেকে ১২ শ' ছত্র।
৫৫ মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত হারামণি, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১।
৫৬ সতীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কাঙাল হরিণাথ রচিত 'মাতৃ মহিমা', পৃ. ৩।
৫৭. রায় জলধর সেন, কাঙাল হরিণাথ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩।
৫৮. সতীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কাঙাল হরিনাথ রচিত 'মাতৃমহিমা', পৃ. ২৩।
৫৯. পূর্বোক্ত।

খোদা বকশের আত্মদর্শন

দর্শনশাস্ত্রের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা-নির্দেশ আজো সম্ভব হয় নি। ব্যক্তি মানুষের মনের অভিজ্ঞতার যে ফল কোনো আপ্তবাক্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে মনীষার জগতে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই দর্শন বলা হয়।[১] এ মনীষার মধ্যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ফল এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ফল রয়েছে। আবার মনজাত জ্ঞানের ফলও রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন — তিনটে থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে এভাবে যেমন বিভাগ করা যায়, তেমনি ফলের পার্থক্য অনুসারে জড়বাদ, চৈতন্যবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিভাগ করা চলে।[২]

তবে এ বিভাগগুলো খুব স্পষ্ট নয়। জড়বাদ এখন প্রকৃতিবাদে রূপান্তরিত হয়ে মানব-জীবন ও মানব-মানসের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে প্রস্তুত। তেমনি ভাববাদও বাস্তববাদের কতকগুলো দাবি স্বীকার করে নিতে আগ্রহী। পূর্বে স্বজ্ঞাজাত জ্ঞানকে অকৃত্রিম সত্তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ বলে ভাবা হতো। এখন স্বজ্ঞাকে সেরূপ না ভেবে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচালিত জ্ঞান বলে ধারণা করা হয়। স্বজ্ঞালব্ধ বিষয় এখন আর সব সময়েই পরম ব্রহ্ম নন। তিনি বিরাট জীবনীশক্তিও হতে পারেন।[৩]

এ সব বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যেও একটি বিষয় সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে চিন্তার জগতে দর্শনের স্বকীয়তা। বস্তুত দর্শনে আপ্তবাক্যের কোনো স্থান নেই। এ সূত্রের আলোকে বিচার করলে খোদা বকশ শাহকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায়, সেটাই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্য সব দার্শনিকের মতো খোদা বকশ শাহ একক ও স্বমতাবলম্বী। তিনি পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকগণের মতো কেবল মানসের মাধ্যমে সত্য লাভের চেষ্টা করেন নি। সত্য লাভের জন্যে তিনি দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানাবিধ মাধ্যমের বিকাশ ঘটানোর সাধনা করেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি প্রাচ্যদেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীদের সমগোত্রীয়। বিশেষত মরমী কবি লালন শাহের সাথে তাঁর চিন্তাধারার অপূর্ব সাজুয্য লক্ষ্য করা যায়।

লালন ছিলেন উনিশ শতকের দার্শনিক কবি। যদিও বাংলা সাহিত্যের তখন আধুনিক কাল, তবুও মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয়। তাঁর মানসে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের চিন্তাধারাতে কোনো স্পষ্ট বিভাগ ছিল না। এ জন্যে বিভাগজনিত প্রশ্ন লালনের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। লালন-পরবর্তী মরমী কবি পাঞ্জু শাহের ক্ষেত্রেও এ বিভাগ ধরা পড়ে নি, যদিও পাঞ্জু উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দেড় দশক পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমাদের আলোচ্য মরমী কবি খোদা বকশ শাহের ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ কোনো বিভাগ দেখতে পাই নে। বিশ শতকের আশির

দশক পর্যন্ত তাঁর জীবন চলমান থাকলেও তাঁর মধ্যে লালন-পাঞ্জুর দর্শন-প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় সাধনার ধারায় যেভাবে ব্রহ্ম বা শূন্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, লালন সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর পক্ষে আত্মজ্ঞান হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। মনে হয় এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে তিনি হজরত আলীর একটি বিখ্যাত বাণীর অনুসারী। হজরত আলী বলেছিলেন — 'মান আরাফা নফসুহু, ফাকাদ আরাফা রব্বোহু'। অর্থাৎ যে তার নিজেকে জেনেছে, সে তার রব (সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালন ও বিবর্তনকারী)-কে জেনেছে।[৪] এতে যে ইঙ্গিত আছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেহেতু নফস (ব্যক্তিসত্তা) ও রব উভয়ই অভিন্ন ; লালনের বিভিন্ন গানে সেহেতু এ সত্যটির প্রতি রয়েছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। 'এই মানুষের আছে রে মন, যারে বলে মানুষ-রতন'[৫]— সে প্রত্যয়েরই অভিব্যক্তি। যদিও সুফিতত্ত্বে এবং ভারতীয় দর্শনে 'আত্মানাম বিদ্ধি' (আত্মাকে জান) বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবুও লালনের মতো এত স্পষ্ট ভাষায় অন্য কেউ এ 'মানুষ-রতন-তত্ত্ব' প্রকাশ করেন নি।[৬]

দর্শনের এ সূত্র সম্বন্ধে লালন শাহের সঠিক ধারণার নির্দেশ রয়েছে অন্যান্য লালন-সঙ্গীতে। আত্ম-সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি সঙ্গীতে লালন বলেন —

'সিরাজ শাহ বলে রে লালন
গুরুপদে ডুবে আপন

আত্মার ভেদ জানলে না,
আত্মা আর পরমাত্মা
ভিন্ন-ভেদ জেনো না।।'[৭]

তা হলে দেখা যায়, আত্মতত্ত্ব সন্ধানকারী হওয়া সত্ত্বেও লালন ছিলেন গুরুবাদী সাধক। গুরুবাদ আবার দর্শনশাস্ত্রে সর্বদায় বর্জনীয়। তবে লালনের এ গুরুবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে সিরাজ শাহের কোনো স্পষ্ট মতবাদ পাওয়া যায় না। বরং লালনই সিরাজের তরফ থেকে নিজেকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। তেমনি গুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে তাঁর মতবাদের সম্প্রসারণও ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে লালনের জীবনে সিরাজ শাহ লালনের সমালোচনারই একটি জীবন্ত রূপ।[৮]

লালনকে যদি হিগেলীয় দ্বান্দ্বিক ন্যায় শাস্ত্রের অস্তিত্ব বলা যায়, তা হলে সিরাজকে সে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষ বলা যায়। তবে সমন্বয় লালনই করেছেন। এ জন্যে এতদ্দেশীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে লালন-দর্শনের সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[৯]

এ কথা অবশ্য সত্য যে, লালনের দর্শনকে দর্শনের কোনো বিশিষ্ট ছকের মধ্যে ফেলা যায় না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও স্বজ্ঞা কোনো কিছুকেই অস্বীকার করেন নি। তবু তাঁর ঝোঁক থেকে বলা যায়, তিনি ছিলেন স্বজ্ঞাবাদী এবং মানুষ-রতন সন্ধানের জন্যে একটি মরমী দৃষ্টি বিকাশের সাধনায় মশগুল।[১০] এ সাধনারই ফলশ্রুতি হচ্ছে তাঁর দ্বৈতবাদ। অথচ তিনি যে

মানুষের সন্ধানে রত ছিলেন, তাকে মানবাত্মা থেকে পৃথক বলে গণ্য করা যায় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। একটি গানে তিনি বলেন —

চিনি হওয়া মজা, কি খাওয়া মজা।
দেখ দেখি মন কোনটা মজা।।
সালোক্য সামীপ্য
সার্ষ্টি স্বারূপ্য
মুক্তি আদি।
এ সব মুক্তি পায়
তারাও হয়ে রয়
জমের প্রজা।।
নির্বাণ মুক্তি সেধে সেতো
জানায় যায় সে পশুর মতো
মুক্তি হওয়া।
চিনিতে চিনি খায়
কিভাবে তাতে যায়
সুখ দুঃখ বোঝা।।
সমঝে ভবে কর ভজন
যাতে মেলে গুরুর চরণ
অটল ধ্বজা।
সিরাজ সাঁই কয় কারণ
শোনরে অবোধ লালন
ছাড় জল সেঁচা।।[১১]

এখানে লালন দ্বৈতবাদ সমর্থন করেছেন। দ্বৈতবাদ অনুসারে জড় ও মন বা বস্তু ও আত্মা— এ দুই হলো এ জগতের আদিম উপাদান। দৃশ্যমান জগতের মূলে দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তা বিরাজমান — জড় ও মন বা বস্তু ও আত্মা। লালন মানবাত্মাকে পরমব্রহ্মে সম্পূর্ণ লীন করতে চান নি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে তিনি সব সময়ই একটা পার্থক্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে — ঐ পরমতত্ত্বে সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য লাভ হলেও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।[১২] লালন-পরবর্তী কবি পাঞ্জু শাহের রচনায়ও একথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর মতে যতই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা হোক না কেনো, জন্মমৃত্যু পরিহার করা যায় না। পাঞ্জু শাহ বলেন —

পুণ্যমুক্তি যতই কর মন,
কোনো ধর্মে হয় না জন্ম-মৃত্যু যে খণ্ডন।[১৩]

আমাদের আলোচ্য কবি খোদা বকশ শাহ এ মতেরই সমর্থক। তিনিও দ্বৈত অনুষঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন নি। জন্ম-মৃত্যু কোনো পুণ্যেই খণ্ডন হয় না — এ কথাই তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায় —

জন্ম মৃত্যু খণ্ডন হবে কিসে,
ভেবে পাইনে আমি তার দিশে।[১৪]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নির্বাণ লাভ করতে চান। নির্বাণ হচ্ছে জীবাত্মার মধ্যে বিরাজিত রিপুগুলোকে ধ্বংস করে সৎ প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ এবং আনন্দময় জীবন যাপন করার সাধনা। এরূপ অবস্থায় জীবাত্মার পক্ষে তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সাধনা করা দরকার। তবে তা সম্ভব নয়। কারণ লালনের নিজেরই ধারণা ছিল, একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই তিনি বলেন —

কুল্লে সাইন মুহিত খোদা
আপনি জবানে কয়।
এ কথা যার নাই রে বিচার
পড়িয়ে সে গোল বাধায়॥
আকার সাকার নয়, নিরাকার
এক আল্লাহ জগতময়,
নির্জন ঘরে রূপ নিহারে
এক বিনে কি দেখা যায়।[১৫]

এ ক্ষেত্রে লালন সেই নিরাকার পরম খোদাকেই একমাত্র সত্তা বলে ধারণা করেছেন। খোদা বকশের মধ্যেও ঐ একই চিন্তাধারা কার্যকর দেখতে পাই। তিনি বলেন —

নিরাকার সেই সত্তা ভজ একমনে।
আলাকুল্লে সাইন মুহিত বলিছে কোরানে॥[১৬]

সেই পরম এলাহি একমাত্র সত্তা বলে স্বীকৃত। ফলে মানবাত্মার পক্ষে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কি সম্ভব? যুক্তির দিক থেকে তা সম্ভব নয়। অথচ সে ঐক্যই হচ্ছে ব্রহ্মবাদীদের লক্ষ্য। 'জগত একটি প্রতিভাস, এর মধ্যে আত্মাও একটি প্রতিভাস'— এ হচ্ছে ব্রহ্মবাদীদের গোড়ার কথা। তবে তাঁদের মধ্যে একটু পার্থক্য বর্তমান। জগত সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাকে 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম' বলা যায়। জগতের যে ক্ষেত্রে যে গুণ নেই, আমরা তাতে সে গুণ আরোপ করছি।

অন্যদিকে মানবাত্মার অস্তিত্ব সত্য। তবে তাকে যেভাবে দেখা উচিত, আমরা সেভাবে দেখছি না। একটি সাদা ধবধবে শঙ্খকে হলদে শঙ্খ বলে ধারণা করলে যে ভুলের সৃষ্টি হয়, জীবাত্মার জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সে ভুলই হচ্ছে।

সে ভুল না হয় স্বীকার করাই হলো। কিন্তু যদি চরাচরে আল্লাহ মুহিত হন, তা হলে তার পাশে জীবাত্মার অস্তিত্ব বিরাজ করা কি সম্ভবপর? এ প্রশ্ন পূর্বাপর অমীমাংসিত থেকে গেছে এবং থাকবেও। তাই দেহের নানা কোঠায় লীলাবিহারী পরমাত্মার সন্ধানী লালন ও তাঁর ভাবানুসারী খোদা বকশ প্রথমত অতি সূক্ষ্ম দৈহিক লতিফাগুলোর বিকাশের আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত সেগুলোর মাধ্যমে 'মনের মানুষ' বা 'মানুষ রতন' বা 'অধর মানুষ' সন্ধান করে পরম তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন।

তবু খোদা বকশ দ্বৈত অনুষঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন নি, যদিও তত্ত্বের দিক থেকে তিনি সর্বশেষ পর্যায়ে ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। তবে এতেও তাঁর দার্শনিক মতবাদ একটি অনড় মতবাদে পরিণত হয় নি। কারণ প্রচলিত ধারায় তত্ত্বজ্ঞানীদের মতো যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তিনি

এসব তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে কাব্যের আকারে তা প্রকাশ করেছেন। খোদা বকশের দর্শনে তাই অসঙ্গতি থাকলেও তাঁর জীবনের সঙ্গে এ মতবাদের অসামঞ্জস্য নেই। কারণ তিনি সত্যকে শুধু প্রতিষ্ঠা করতেই চান নি বা অনুভব করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে জীবনে রূপায়ণের সাধনাও করেছেন। খোদা বকশের 'মানুষতত্ত্ব' সাধনা খুবই উল্লেখযোগ্য। একটি গানে তিনি বলেছেন —

এই মানুষে আছে মানুষ
মানুষ ধরলে যায় জানা,
ভাবের মানুষ দেখতে বেহুঁশ
মানুষ ছাড়া কিছু নাই॥[১৭]

সেই পরম মানুষকে, হৃদয়বিহারী প্রেমাস্পদকে খুঁজে বের করার জন্যে তাঁর আকুলি-বিকুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বস্তুত খোদা বকশ তাঁর দর্শনে ইন্দ্রিয়, যুক্তি, স্বজ্ঞা ইত্যাদি কোনো কিছুকেই অস্বীকার করেন নি। তবে তিনি প্রধানত স্বজ্ঞাবাদী এবং 'মানুষ রতন' সন্ধানী ছিলেন। এই 'মানুষ রতন' সন্ধান করতে খোদা বকশকে মানুষ-গুরুর সন্ধান করতে হয়েছে। শেষে খোদা বকশ ভারতীয় সাধকদের 'গুরুবাদ' এবং আরব-পারস্যের সুফিদের 'পিরবাদ' বা 'মুরশিদতত্ত্ব' গ্রহণ করেছেন। সব মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব নিহিত আছে। তথাপি যাঁরা ধ্যান-ধারণা ও ঐশ্বরিক প্রেমসাধনায় তাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করতে পারেন, তাঁরাই আসলে 'আল ইনসানুল কামেল' বা 'পূর্ণ-মানব'। 'প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টাই গুরুরূপে মানুষকে সাধনপথে পরিচালনা করেন। সুফিতত্ত্বে গুরুর ব্যাখ্যা এই।'[১৮] খোদা বকশ এ তত্ত্বেরই সাধক ছিলেন।

উল্লেখ্য, সুফিদের ধারায় দেখা যায়, তাঁরা শরিয়তকে অস্বীকার করে নানাবিধ শরিয়ত-বিরোধী উক্তিও করেছেন। এঁদের মধ্যে মনসুর হাল্লাজ, বায়েজিদ বোস্তামী, ইবনুল ফরিদ, জালালউদ্দিন রুমী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনসুরের 'আনাল হক' (আমিই সত্য), ইবনুল ফরিদের 'আনাহিয়া' (আমিই সেই সুন্দরী নারী), বায়েজিদের 'সুবহানী' (আমিই পবিত্র) ইত্যাদি শরিয়ত-বিরোধী উক্তি। তেমনি জালালউদ্দিন রুমীর 'আমিই মদ' উক্তিও সম্পূর্ণ শরিয়ত পরিপন্থী। তবে এঁরা শরিয়তের বিরুদ্ধে আত্মোপলব্ধিজাত সত্য প্রচার করলেও শরিয়তের প্রতিকূল কোনো আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। তাছাড়া এঁরা কোনো অভিনব আচার-অনুষ্ঠানের সাধকও ছিলেন না।[১৯]

খোদা বকশ শাহের জীবন-চরিত, ধর্মনীতি ও সঙ্গীত-ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনি প্রথম থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত শরিয়তকে অস্বীকার করেন নি। তবে, তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিয়তের জ্ঞান যে নিতান্ত অপ্রতুল, তা তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

দর্শন-তত্ত্ব হিসেবে খোদা বকশ যে পথ ধরেছেন, সেটি হচ্ছে জ্ঞানের পথ। এই জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মানব-দেহেই বিভিন্ন মোকাম-মঞ্জিল রয়েছে। এগুলোকে জাগ্রত করলে এদের মাঝেই বিশ্বস্রষ্টার রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মরমী সাধকেরা এ মোকামগুলোকে বলেন লতিফা। লতিফা আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা, আলম-ই-আমর এবং আলম-ই-খাল্‌ক। উভয় বিভাগের লতিফাগুলো আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা —

ক. আলম-ই-আমর : কলব, রুহ্, ছির, খফি, আখফা।

খ. আলম-ই-খাল্‌ক : নফ্‌স, আব, আতশ, খাক্, বাত্।

আলম-ই-আমর নামকরণের অর্থ এই যে, স্রষ্টা রোজ-ই-আজলে অর্থাৎ সৃষ্টি-দিবসে 'কুন' বা 'হও' এই আমর বা আদেশ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন বলে এগুলো আলম-ই-আমরের লতিফা। এই লতিফাগুলো অতি সূক্ষ্মসৃষ্টির নিদর্শন। লতিফ শব্দের অর্থও সূক্ষ্মবস্তু।[২০]

অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ রুহকে আকার ও নিরাকারের মধ্যবর্তী করে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, আকার সংলগ্ন অবস্থায় সে হবে সাকার এবং নিরাকার সংলগ্ন অবস্থায় সে হবে নিরাকার। পুনরায় স্বীয় সমীপে উপস্থিত করার জন্যেই তাকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আলম-ই-খাল্‌ক-এর লতিফাগুলো স্থূল সৃষ্টির নিদর্শন বা ভৌতিক। প্রথম লতিফাগুলো আলম-ই-মালাকুতের বা ফিরিশতাদের জগতের এবং দ্বিতীয়গুলো আলম-ই-নাছুতের বা স্থূল জগতের।[২১]

দেহতত্ত্বের এই সব সূক্ষ্ম কথা খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতে বিধৃত। মোকাম-মঞ্জিল ছাড়াও আট কুঠরি, নয় দরজা, চব্বিশ চন্দ্র, ষটচক্র ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে ও সাধনা করে খোদা বকশ শাহের যে সহজ সত্যের উপলব্ধি এসেছে, তা তাঁর জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, খোদা বকশ ছিলেন মরমী কবি লালন শাহের ঘরানা অনুসারী। ফলে লালন-জীবন ও লালন-দর্শন তাঁর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। খোদা বকশ শাহের প্রভাবও পড়েছে তাঁর অনুসারীদের উপর। ফলে খোদা বকশ শাহের আত্মদর্শনের মাধ্যমে একটি ঐতিহ্যবাহী মরমী দর্শন ও আত্মতত্ত্বমূলক চিন্তাধারার প্রবাহ বয়ে চলেছে নিরন্তর অবিরাম গতিতে। এটাই তাঁর আত্মদর্শনের বৈশিষ্ট্য।

তথ্যনির্দেশ

১. Frank Thilly, A History of Philosophy (Revised by Ledger Wood), Third Edition, Central Book Depot, Ellahabad, 1973, Page 281.

২ Ibid.

৩. Ibid. Page 282-283.

৪. শাহ আবদুর রহমান, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, শরফুল ইনসান (হামিদুর রহমান সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৮৭, পৃ. ৪।

৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দর্শন শাস্ত্র ও লালন-মনীষা, লালন পরিষদ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৪১।

৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০, গান নং ২০৬।

১২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৩. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, পৃ. ১৩, গান নং ২২।

১৪. খোদা বকশ শাহ, বর্তমান গ্রন্থের সঙ্গীত অংশ দ্রষ্টব্য, গান নং ১৪৫।

১৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০, গান নং ১৫।

১৬. খোদা বকশ শাহ, বর্তমান গ্রন্থের সঙ্গীত-অংশ দ্রষ্টব্য, গান নং ১৪৬।

১৭. প্রাগুক্ত, ঐ, গান নং ১২।

১৮. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৭১।

১৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২০. মোহাম্মদ আবদুল করিম, এরশাদে খালেকিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, রুবি বুক হাউস, যশোর, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৪-২৫।

২১. প্রাগুক্ত।

বাউলতত্ত্ব ও খোদা বকশ শাহ

পটভূমি-অংশে বাউল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আরো একটু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। কারণ লালন-পরবর্তী সাধকগণের চিন্তাধারায় বাউল মতবাদ ও বাউল দর্শন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে দেখতে পাই। লালন শাহের সঙ্গীতে (যে সব লালন-সঙ্গীত মুদ্রিত হয়েছে) 'বাউল' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।[১] কিন্তু লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের গানে বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই।
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই॥
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসিমালা অনুষ্ঠান সদাই॥
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গী তাই॥[২]

দুদ্দু শাহ এখানে বাউল ও বৈষ্ণবের পার্থক্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন। স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবরা মালা-তিলক-কণ্ঠিধারী, পঞ্চতত্ত্বে বিশ্বাসী। অন্যদিকে মানুষ-ভজন হচ্ছে বাউলদের সাধনা, যেখানে বস্তু সংরক্ষণে নারী-সঙ্গিনী আবশ্যক।

দুদ্দু শাহের রচনায় বাউল সম্পর্কে আরো তথ্য আছে। জীবের জীবন যাতে উৎপত্তি হয়, বাউল সেই বস্তুর সাধনা করেন। দুদ্দুর ভাষায় —

যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবনই তীর্থ-ধর্ম-পথ
এই কথা বাউলের মত॥[৩]

বাউল তাই জীবন-সাধক। জীবন-সাধনা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সাধনা। জীবনই তীর্থ-ধর্ম, জীবনই সকল পথের শ্রেষ্ঠ পথ। বীরভদ্রের দরবেশী বাউল-পন্থা অনুসরণের কথাও দুদ্দু শাহের গানে আছে। লালন-সঙ্গীতে কিন্তু এ সব কিছুই বলা হয় নি। এতে বোঝা যায় যে, লালন অন্তত বাউল মতবাদ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তাঁর অনুসারী দুদ্দু বাউল-তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে 'বাউলধর্ম' নামে কোনো পৃথক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য দুদ্দুর ছিল এমন কোনো প্রমাণ মেলে না। আবার বাউল-দল গঠন করার কোনো পরিকল্পনাও তাঁর ছিল এমন

প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মনে হয় দুদ্দুর সমকালে (লালন-পরবর্তীকালে) 'বাউল' কথাটি বহুল প্রচলিত হয়। বাংলার সর্বত্র অসংখ্য সাধকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। লালন-অনুসারীদেরকে বাউল বলে অভিহিত করা হতে থাকে। এরই ফলে দুদ্দু শাহ বোধ হয় বাউল-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তাঁর গানে।

খোদা বকশ শাহ দুদ্দু শাহের প্রশিষ্য নন। তিনি মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্য হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের শিষ্য শুকচাঁদ শাহের সাক্ষাৎ অনুসারী (শিষ্য)। মনিরুদ্দিন শাহ সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন না। তিনি লালন-সঙ্গীতের লিপিকর ছিলেন। লালন শাহের তিরোধানের পর ছেঁউড়িয়ার আখড়া ছেড়ে এসে নিজের বাড়িতে থাকাকালে তিনি লালন-সঙ্গীত জনপ্রিয় করার জন্যে সচেষ্ট হন। সেই সূত্রে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে লালন-সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ে। মনিরুদ্দিন শাহের শাখার শিষ্যগণ সঙ্গীতচর্চাকেই তাঁদের প্রধান কাজ বলে ধরে নেন। এ সঙ্গীতচর্চা হরিণাকুণ্ডু থানার হরিয়ারঘাট, হরিশপুর, জোড়াদহ, পোড়াহাটি, হরিণাকুণ্ডু এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার ফরিদপুর, জামজামী, ছত্তরপাড়া, ঘোলদাড়ি, কুষ্টিয়ার শংকরাদিয়া ইত্যাদি গ্রামে ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। খোদা বকশ ঘোলদাড়ি ও তার আশেপাশের গ্রামের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে হরিণাকুণ্ডু-হরিশপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। উপরিলিখিত গ্রামগুলোতে যে সব ফকির-দরবেশ ছিলেন, তাঁরা চলার পথে লালন-পন্থা অনুসরণ কতটা করতে পেরেছিলেন, তা বলা কঠিন। কারণ লালন শাহের পরে ছেঁউড়িয়া-কেন্দ্রিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ লালন-মতবাদ প্রচারকের আবির্ভাব ঘটে নি।

এ জন্যে লালন-অনুসারীরা ফকির, দরবেশ, বাউল ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে থাকেন। খোদা বকশ শাহের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। তিনিও নিজেকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নিজেকে তিনি ফকির বলে পরিচয় দিয়েছেন। পণ্ডিত সমাজ-আরোপিত 'বাউল' শব্দটির প্রতিও তাঁর কোনো অনীহা ছিল না। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তিনি যখন 'লালন-সঙ্গীত শিক্ষক' পদে চাকুরী করেন, তখন তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশার যে সুযোগ আমাদের হয়েছিল, তা থেকেও দেখেছি যে তিনি 'বাউল' কথাটিকে অপছন্দ করেন নি। আবার 'ফকির' কথাটির প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের সংকলন-অংশে 'বাউল' শিরোনামে তাঁর চারটি গান সংকলিত হয়েছে। এই চারটি গানে তিনি 'বাউল' শব্দের ব্যবহার করেন নি। এগানগুলোতে তিনি মূলত 'বাউল সুর' ব্যবহার করেছেন। গানের বাণীও খুব সাদামাটা এবং প্রচলিত বাউল গানের ভাবভাষা এগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি গানের কয়েক ছত্র এরূপ —

সইলে সম্পত্তি, নইলে বিপত্তি,
খাটবে না আপত্তি বিচারের সময়।
হইলে শুদ্ধ মতি তবে হবে ভক্তি
এই উক্তি যুক্তিশাস্ত্রে শোনা যায়॥[৪]

এখানে সাধুভাবের কথা বলা হয়েছে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শুদ্ধমতি, ভক্তি ইত্যাদি সদগুণাবলী অর্জন করতে পারলে তবেই সেই মহাপ্রভুর বিচারে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। যুক্তিশাস্ত্রের বক্তব্যও এই রকম। কবি তাই আবারো বলেন —

সবুরে শক্তি হইলে এই ভবে
ত্রিতাপ অনলে তারে নাহি ছোঁবে,
চিদানন্দ ভাবে ভাবিবে এই ভবে
দয়া করবেন তবে সেই দয়াময়॥[৫]

মানুষ ত্রিতাপ (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক) জ্বালায় অস্থির। এ থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় সবুরকরণ বা ধৈর্যধারণ। আল-কোরআনে উল্লেখ আছে — 'আমি (আল্লাহ) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি।' কবি খোদা বকশ সেই কথাই বলেছেন তাঁর গানে। অবশ্য সচ্চিদানন্দ ভাবের কথা এখানে এসেছে পুণ্যাত্মা হবার সাধনা প্রসঙ্গে। সৎসঙ্গে সেই পুণ্যাত্মা হওয়া যায়, এ গানের শেষভাগে তারও ইঙ্গিত আছে। উল্লেখ্য যে, এ গানে কোনো বাউল মতবাদের আভাস নেই।

বাউল সুরের সঙ্গীত হিসেবে রচিত খোদা বকশের দ্বিতীয় গানে অবশ্য পরম করুণাময়কে সন্ধান করার ইঙ্গিত আছে। বাউলরা যে সন্ধানী এ গানে তার কিঞ্চিত আভাস মেলে। কবি বলেন—

থাকো বটে সর্বঘটে
দূরে কিংবা হও নিকটে
বেড়াও তুমি ছুটেছেটে
তোমায় সন্ধান করতে পারলাম না॥[৬]

এখানে পরম আরাধ্যকে সন্ধান করতে না পারার যন্ত্রণায় কবিমন অস্থির হয়ে উঠেছে। কারণ সেই সর্বশক্তিমান প্রভু সর্বঘটে সর্বত্র বিরাজমান, তিনি অতি নিকটে, তথাপি তাঁকে খুঁজে পাওয়া কঠিন — এই বেদনাময় অবস্থা কবিকে ব্যথিত করেছে। এ গানেও 'জেনেরিক টার্ম' হিসেবে 'বাউল' কথার উপস্থিতি নেই। একটি আবরণযুক্ত তত্ত্ব হিসেবে মনের মানুষের সন্ধান করার ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে এ গানে।

আর একটি গানে নিষ্ঠা, প্রেম, অনুরাগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রূপক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। মনের আবিলতা দূর করতে পারলেই সত্যকে লাভ করা যায়। কবি তাই বলেন —

ত্যাজ্য করে মনের বিকার
নিষ্ঠা দুধে পাতাবি দই।
ব্রহ্মানলে জ্বাল দিয়ে তাই
উষ্ণ-গরম রাখতে হয়॥[৭]

এখানে দুধ থেকে দধি প্রস্তুতের রূপকে কবি অনাবিল মনের অবস্থা-সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এ গানের সুরও প্রচলিত বাউল গানের সুরের অনুরূপ নয়। যশোর-কুষ্টিয়ার ভাবসঙ্গীতের সুরেই খোদা বকশের বাউল গানগুলো গাওয়া হয়।

দুদ্দু শাহ বৈষ্ণব ও বাউলের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, মনিরুদ্দিন অনুসারী খোদা বকশের গানে তার দৃষ্টান্ত মিলছে না। তিনি স্বকীয় ভাবধারায় বাউল গান লিখেছেন। কুষ্টিয়া-

যশোরের লালন-পরবর্তী সাধক ও গায়কগণ, বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, 'বাউল' হতে চেয়েছেন। খোদা বকশ শাহের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। লালন শাহ নিজেকে ফকির বা দরবেশ বলে পরিচয় দিলেও লালন-অনুসারীরা নিজেদেরকে 'বাউল' বলতেই যেন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। খোদা বকশ শাহকে এই দলভুক্তই করা চলে।

প্রবীণ লালন-সঙ্গীতশিল্পী মহিন শাহ তার নিজস্ব বুঝ-অনুসারে বাউল-দর্শন সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি প্রতিটি ধর্মেরই দুটি দিকের কথা বলেছেন। এ দুটি দিক হচ্ছে রাজসিক ও মানবিক। রাজসিক হচ্ছে ধর্মের বহিরঙ্গ দিক আর মানবিক হচ্ছে ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক। এ দুটো দিকের কথা বলতে গিয়ে মহিন শাহ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বাউলের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য একটু উদ্ধৃত করছি — "কোনো কোনো লোক নাকি বলে থাকে বাউলরা স্বৈরাচারী। বাউলরা কোনো সমাজ-বিধান মানে না। এ কথাটা কি অর্থহীন নয়? বাউলরা রাষ্ট্রগতভাবে জাতিভেদ নির্বিশেষে একত্রে বসবাস করছে এবং জাতিভেদ হিসেবে প্রত্যেকে যার যার ধর্ম বিধানমতে চলছে। স্বৈরাচারী কি ধর্মের অঙ্গ? অনাচার কি ধর্ম? বিবাহ-বিধান নেই, এমন কোনো জাতি থাকতে পারে? হ্যাঁ, তবে বিধি-বিধান সম্প্রদায় ভেদে ভিন্নরূপ হতে পারে বা আছে। ধর্ম বলতে কি বুঝি? ধর্মের মূলকথা— সৃষ্টি তার স্রষ্টার নৈকট্য লাভের আশা করে। এখানে বিধিগতভাবে যাজনের প্রভেদ দেখে আসছি। কিন্তু মূলে তো একই। একটা প্রবাদ বাক্য আছে — 'একরূপ ধর্ম বহুরূপ তার যাজন ; যে মতে যে মজে, সেই মতে সে ভজে।' এখানে দ্বেষাদ্বেষী করে লাভের মধ্যে এটুকু হচ্ছে — স্রষ্টার নেক দৃষ্টি হতে আমরা সরে যাচ্ছি।

অনেকেরই মত হলো — বাউলরা যৌনতত্ত্বকে তাদের ধর্মের প্রধান সোপান বলে জ্ঞান করে। কথাটা নিতান্ত সত্যি। কিন্তু শুধু বাউল হবে কেনো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো যৌবন-ধর্মী। তাই বাউল কবি বলেন —

যত দিন রস
ততদিন যশ।[৮]

ধর্ম এবং কর্মে যৌবনই তো উত্তম। যে ব্যক্তি সংযমী সে ব্যক্তি ধার্মিক। আত্মতত্ত্বের কথায় বলা হয়েছে — আত্মতত্ত্ব মানেই খোদাতত্ত্ব। যে ব্যক্তি রিপুর বশীভূত হয়ে অন্যায়ভাবে যৌবন ধ্বংস করছে, সেই তো স্বৈরাচারী। বাউলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব উদঘাটন করে তাই তো লালন বলেন —

সত্য বল সুপথে চল
ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে
পাবে না মানুষের দরশন॥
পরের দ্রব্য পরের নারী
হরণ করো না
পারে যেতে পারবে না,
যতোবার করিবে হরণ
ততোবার হবে জনম॥[৯]

এখানে স্বৈরাচারীর স্থান কোথায় যেয়ে দাঁড়ালো? তবে বাউলের দোহাই দিয়ে কেউ যদি স্বৈরাচারে লিপ্ত হয়, সে কি বাউল? এমনিভাবে প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভিতরে দেখা যাচ্ছে— ধর্মের দোহাই দিয়ে অধর্মের কাজ করে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, বাউলেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেইজন্য তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে কেউ দ্বিধা করছে না। সেই ডাকের কথা — 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'।"১০

মহিন শাহের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, মহিন শাহের বাউল-ধারণা (Baul Concept) খুব পরিষ্কার নয়। তাঁর বক্তব্যে লালন-সঙ্গীতের উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু উদ্ধৃত লালন-সঙ্গীতাংশ কি বাউলতত্ত্ব সংক্রান্ত? প্রখ্যাত বাউল-তত্ত্ব গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল মতবাদ এবং বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে যে ধারণার অবতারণা করেছেন, সেই ধারণার সঙ্গে মহিন শাহের বক্তব্যের কোনো সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য ও সাজুয্য নেই। মহিন শাহ 'বাউল' বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়।

মরমী কবি খোদা বকশ শাহের রচনায়ও বাউল সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবিতকালে তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা জানা গেছে, তাতে মনে হয়েছে যে, বাউল, ফকির, দরবেশ — এসব শব্দ ও শব্দগত অর্থকে তিনি এক করে দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গে লালন-সঙ্গীত সম্মেলনে গিয়ে তিনি এবং তাঁর দলের সদস্যরা 'বাংলাদেশের বাউল' নামে পরিচিত হয়েও অখুশি হন নি। অসাধারণ বিনয়ী, উদার এবং নির্মলচিত্ত সাধক খোদা বকশ শাহ সত্যিই একজন উদাসীন 'বাউল'। লালন-পরবর্তী লালন-অনুসারীরা ফকির-দরবেশ হয়েও যে 'বাউল' মতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন, খোদা বকশ শাহ তাঁর চলনে-বলনে, আচার-আচরণে তার কতকটা প্রমাণ রেখে গেছেন। তাই বলতে পারি, খোদা বকশ শাহ আত্মতত্ত্ব সন্ধানী অর্থে বাউল, তিনি প্রকৃত সাধক। বাউল বলতে যে পাগল বা খ্যাপা বুঝায়, তিনি তা ছিলেন না। তিনি যথার্থই ছিলেন দরবেশ খোদা বকশ শাহ।

তথ্যনির্দেশ

১. সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২০২।
২. এস.এম. লুৎফর রহমান, দুদ্দু শাহ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৮।
৩. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।
৪. খোদা বকশ শাহ রচিত সঙ্গীত, গান নং ৬০।
৫. প্রাগুক্ত, গান নং ঐ।
৬. প্রাগুক্ত, গান নং ৬১।
৭. প্রাগুক্ত, গান নং ৬২।
৮. মহিন শাহ, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন ৬২, প্রকাশকাল ১৯৯৫, পৃ. ১৪-১৫।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।

খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতের শ্রেণীবিন্যাস

ক্ষেত্রানুসন্ধান (ফিল্ডওয়ার্ক) করে খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর আখড়া কররাজাঁহাপুরে গিয়ে তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসের নিকট থেকে বেশ কিছু সঙ্গীত পেয়েছি। তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য হেদায়েত আলিও কিছুসংখ্যক সঙ্গীত সরবরাহ করেছেন। তাঁর আর একজন শিষ্য হরিণাকুণ্ডু-কুলবাড়িয়া নিবাসী বিনয়কৃষ্ণ পালের বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশটি সঙ্গীত পাওয়া গেছে।

মোট সংগৃহীত সঙ্গীতের মধ্য থেকে বর্তমান গ্রন্থের জন্যে আমরা ১৪৮ টি সঙ্গীত চয়ন করেছি। সঙ্গীতগুলো নানা বিষয় নিয়ে রচিত। বিষয়গুলো পৃথক পৃথকভাবে দেখানোর জন্যে একটি শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রার্থনা ও স্তুতি, সাধুসঙ্গ, মানুষতত্ত্ব, পারাপার, স্বভাব, ব্যক্তিজীবন ও সংসার, প্রেম ও রাধাকৃষ্ণ, বিচ্ছেদ, বাউল, সমাজ ও সমকাল, লোকগীতি, গৌরতত্ত্ব, গোষ্ঠ, কীর্তন, পরপারচিন্তা, শ্যামাসঙ্গীত, বিবিধ।

'প্রার্থনা ও স্তুতি' শীর্ষক সঙ্গীতে কবি স্রষ্টার কাছে ভবসিন্ধু পারের জন্যে করুণ মিনতি জানিয়েছেন। ত্রিতাপে দগ্ধ জীবনে একটু শান্তি লাভের আশা করে কবি বলেন —

ওহে অধমের বন্ধু, এই ভবসিন্ধু
দিয়ে পদারবিন্দু কর হে তারণ।
তোমার কৃপাসিন্ধু নাম, তুমি গুণধাম,
কর পরিত্রাণ দিয়ে শ্রীচরণ।। (গান নং ১)

তাঁর কৃপা ব্যতীত জীবের নিস্তার নেই। কঠিন বিপদেও তাই তাঁকে স্মরণ করতে হয়, তাঁর সাহায্য লাভের জন্যে আকুল আবেদন জানাতে হয়। কবিও তাই বলেন —

জয় জগৎ-বন্ধু করুণার সিন্ধু
দিয়ে পদারবিন্দু কর হে নিস্তার।
এ বিশ্বসংসারে মরি ঘুরে ঘুরে
তুমি সবাকার করুণার সাগর।। (গান নং৩)

তিনি সত্যিই করুণার সাগর। কিন্তু অনেক সময় আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। আর তাই সেই মহাপ্রভুকে জেনেও জানা হয় না। কবি বলেন —

চাতুরী করিয়া কুকাজে মজিয়া
মুখে হরি হরি ব'লো না, ব'লো না।
গলে মালা মোটা কেটে লম্বা কোটা
চিতা বাঘ সেজে থেকো না, থেকো না।। (গান নং ৪)

বস্তুত ভণ্ড-তপস্বীকে অপছন্দ করেছেন কবি। ভণ্ডামি ভালো নয়। জগতস্বামীকে অকপট নিষ্ঠায় স্মরণ না করে চাতুরীর আশ্রয় নেয়া সত্যিই নিন্দনীয়।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গীতের শিরোনাম 'সাধুসঙ্গ'। এ সঙ্গীতগুলোতে কবি সৎসঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও সুফল বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায় —

অহৈতুকিং স্বর্গ, শাস্ত্রে শোনা যায়,
সাধুসঙ্গে তার সত্য প্রমাণ হয়। (গান নং ৭)

সাধুসঙ্গ মানবজীবনকে পুণ্যময় করে। অন্ধকারময় হৃদয় পবিত্র আলোকে উজ্জ্বল হয়। এ যেন ঠিক —

অমাবস্যায় উদয় পূর্ণ শশধর
আনন্দ অপারে দেখ যে এবার
হলো পুলকিত অঙ্গ পেয়ে তার সঙ্গ
তাপিত অঙ্গ শীতল করিলাম॥ (গান নং ৮)

তৃতীয় পর্যায়ে 'মানুষতত্ত্ব' সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। মানুষের জয়গান গীত হয়েছে এখানে। 'সবার উপর মানুষ সত্য'—এ বাণীই বিধৃত হয়েছে এ সঙ্গীতগুলোতে। কবি বলেন —

মানব লীলা সব লীলার সার শুনেছি তাই শ্রবণে
কিরূপে ভজিব মানুষ তাহার সন্ধান জানিনে। (গান নং ১০)

এখানে মানব-সেবার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। মানব-লীলা সব লীলার সার — একথাও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ মানব-লীলার রহস্য উদঘাটনে ভাবের মানুষ অর্থাৎ শুদ্ধ মানুষের অনুসরণ আবশ্যক। কবির ভাষায় —

এই মানুষে আছে মানুষ,
মানুষ ধরলে যায় জানা।
ভাবের মানুষ দেখতে বেহুঁশ
মানুষ ছাড়া কিছুই নাই। (গান নং ১২)

প্রসঙ্গক্রমে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রহিত হওয়ার বাসনা করেন কবি। তিনি জাতিভেদ মানেন না। সব মানুষ মিলে একটি মনুষ্যজাতি সৃষ্টি হয়েছে — এই তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি গেয়েছেন —

জাতির নামে বজ্জাতি সব
জাতি কি নিবা সঙ্গে করে।
সাদা কিংবা কালো বরণ
জাত দেখেছো কি এক নজরে। (গান নং ১৩)

এখানে কবি খোদা বকশ শাহ মরমী কবি লালন শাহের অনুরূপ বাণীই যেন প্রকাশ করেছেন। লালন বলেন —

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতির কি রূপ দেখলাম না দুই নজরে॥

সত্যিই তো জাতির কোনো রূপ নেই, মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই, সবই কেবল বাড়াবাড়ি, সবই কেবল মিথ্যা অহমিকা।

'পারাপার' তত্ত্ব শীর্ষক সঙ্গীতে কবি ইহজগত থেকে পরজগতে যাবার কথা বলেছেন। এ জগত বড় ঝঞ্ঝাটময়, এখানে জীবনযাপন বড় সহজ নয়। কবি বলেন—

সামনে ত্রিমোহনার খাল
ঘটলো জঞ্জাল হইল বিফল
কি করি উপায়।
একা আছি বসে ভেবে না পাই দিশে
পার হবো কিসে
ঘাটে মাঝি নাই॥ (গান নং ১৪)

এই পারের চিন্তায় কবি চিন্তিত। কেমন করে বৈতরণী পার হওয়া যায়; সেই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল। কারণ —

অথায় নদী বৈতরণী
ভাঙ্গা আমার তরীখানি,
কূলেতে রাই-ভাটার পানি
নামলে বসন ভিজে যাবে॥ (গান নং ১৫)

দিন যেয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। কবির মনে তাই শংকা — কেমন করে তিনি ভবপারে যাবেন? এ শংকা অমূলক নয়। কারণ সামনের দিনগুলো অন্ধকারময়।

'স্বভাব' শীর্ষক সঙ্গীতে কবি স্বভাব সংশোধনের কথা বলেছেন। স্বভাব পরিবর্তন না হলে, নির্মল মনের অধিকারী হতে না পারলে স্রষ্টাকে লাভ করা যায় না। তিনি তাই গেয়েছেন —

থাকিতে স্বভাব হবে না সে ভাব
যে ভাবেতে লাভ হয় নিরঞ্জনে।
হইলে সুভাব যাইবে অভাব
নিত্য নতুন ভাব দেখবি নয়নে॥ (গান নং ১৮)

স্বভাব পরিবর্তন না হলে কপট ভাবের ভাবুক হতে হয়। তাতে আত্ম-প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছু মেলে না। লাভ করা যায় না ধর্ম, পাওয়া যায় না সত্য, ধর্মের খোলস পরে পরকে ঠকানোই সার হয়। কবির ভাষায় —

প্রবঞ্চনা কণ্ঠক সর্ব অঙ্গে ঘেরা,
মুখে আছে সদা মিষ্ট কথা ভরা,
অন্তরে গ্লানি সাজগোছ পরা
ফাঁক খোঁজো কাকে ঠকাবো কখন॥ (গান নং ১৯)

'ব্যক্তিজীবন ও সংসার' শীর্ষক সঙ্গীতে ফুটে উঠেছে কবির দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। সংসার-জীবনের বেদনাময় চিত্রও এ সব সঙ্গীতে প্রতিফলিত। কবি বলেন —

কত যে ক্ষুধার জ্বালা সই দুবেলা
থাকি সবুর-নামের সাহায্যেতে।
সবুরে মেওয়া ফলে সবে বলে
দেখবো এবার কি হয় তাতে॥ (গান নং ২২)

তবে এসব দুঃখ-কষ্টে কবি ধৈর্য-ধারণ করার শিক্ষা লাভ করেছেন। দুঃখে অধীর না হয়ে তিনি আত্মসম্বরণ করেই চলতে চান। এসব সঙ্গীতে কবির সংসার-জীবনের খুঁটিনাটি দিকও উদ্‌ঘাটিত হতে দেখি। সমকালীন সমাজের বিষয়ও এসে গেছে। কবির ভাষায়—

পেতে এক কামারশালা এই দো-চালা
থাকি খরিদদারের হুকুমেতে
যখন যা করে হুকুম ; করি সেই কাম,
কত মান-অপমান হই তাহাতে॥ (গান নং ২৯)

এর পরেই সংকলিত হয়েছে 'প্রেম ও রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক সঙ্গীত। প্রেমতত্ত্ব অতি গভীর, খুব সহজে তা লাভ করা যায় না। কঠিন সাধনায় তা পেতে হয়। কবি গেয়েছেন —

প্রেম কি ভাই সহজে মেলে।
প্রেম হয় না স্বভাব না ছাড়িলে॥ (গান নং ৩০)

এখানে প্রেম-প্রসঙ্গে চণ্ডিদাস, রজকিনী প্রমুখ প্রেমের মহাজনদের কথাও এসে গেছে। রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে বারবার। একটি গানে কবি গোপীর উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে —

করিয়ে শুভযাত্রা যাও মথুরা
আবার কবে আসবা ফিরে।
ছাড়িয়ে দ্বাদশ রাখাল আর গরুর পাল
চললে তুমি ধীরে ধীরে॥ (গান নং ৩১)

বস্তুত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রেম-প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব অপরিহার্যরূপেই এসে যায়। কথায় বলে 'রাধা ছাড়া সাধা নেই, কানু ছাড়া গীত নেই।' লোককবির কাব্যগীতিতে এ ব্যাপারটি লক্ষণীয়। কৃষ্ণের জবানীতে কবি বলেন —

আমি সাধ করে কি বাজাই বাঁশি
ব'লে রাধার নাম।
সে যে আমার সর্বস্বধন
শত গুণের গুণধাম॥ (গান নং ৩৮)

শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এমনই এক সম্পর্ক যে, শ্রীকৃষ্ণ রাধার নাম উচ্চারণ করে বাঁশি বাজাতে বাধ্য হন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন যে, শ্রীরাধা তাঁর সর্বস্বধন এবং শত গুণের গুণধাম।

এর পরেই আসে 'বিচ্ছেদ' শ্রেণীর সঙ্গীতের কথা। এসব সঙ্গীতে বিচ্ছেদ-জ্বালা, বিরহবেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রেমিক-প্রেমাস্পদের প্রণয়-মধুর সম্পর্ক কত গভীর এ সব সঙ্গীতে তারও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। কবি গেয়েছেন —

সুন্দর তোমার মুখের হাসি রে
বন্ধু, সুন্দর তোমার বাঁশি,
সুরেতে প্রাণ পাগল করে রে
বন্ধু, মন হয় উদাসী॥ (গান নং ৪১)

বাহ্যিক সৌন্দর্যও অনেক সময় হৃদয়-সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। কারণ সুন্দর মুখচ্ছবি নির্মল প্রেমেরই বাহ্যলক্ষণ। এ প্রেম প্রেমিকের মনে উল্লাস-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। কিন্তু দীর্ঘ সময় প্রেমিক-প্রেমাস্পদের দেখা-সাক্ষাৎ না হলে যে বিরহের সৃষ্টি হয়, তা অসহনীয়। তখন স্বভাবতই প্রেমিক বলে ওঠে —

আর কতদিন রইবো বন্ধু,
পথের দিকে চাইয়া।
আশায় আশায় দিন
ফুরালো শূন্য হৃদয় লইয়া॥ (গান নং ৪২)

সাত্যিই তো অপেক্ষা করতে করতে দিন ফুরিয়ে যায়। মনের হাহাকার মনেই থাকে। বিরহের আগুনে মন পুড়ে ছারখার হয়। আর তাই —

বিচ্ছেদ আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
কে দেখবে আসিয়া। (গান নং ৪৪)

এই মন-আগুন কেউ দেখতে পায় না। ধিকিধিকি সে আগুন জ্বলে মনে। কবি তাই আবারো গেয়েছেন —

মন-আগুনে বন পুড়ে যায়
কে দেখবে আসিয়া।
জলে তো নেভে না আগুন
দ্বিগুণ ওঠে জ্বলিয়া॥ (গান নং ৪৫)

বিরহী মন ঘরে থাকতে চায় না। কেবলই ছুটে যায় বাইরে। পাগলের মতো প্রলাপে চারদিক মুখর করে। যাকে কাছে পায়, তার কাছে জিজ্ঞাসা করে —

কার জন্যে প্রাণ এমন করে
তোমরা কিছু জানো নাকি।
আমার বুকের ভিতর তুষের অনল
জ্বলছে অনল ধিকিধিক॥ (গান নং ৪৭)

বিচ্ছেদ শীর্ষক অন্যান্য সঙ্গীতেও কবি ঐ একই ভাবধারা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ শ্রেণীর সঙ্গীত সুর ও ছন্দে অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

বর্তমান গ্রন্থে 'বাউল' শিরোনামের চারটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। উদাসী বাউল সুর এ গানগুলোতে যুক্ত হয়ে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। খোদা বকশ শাহের পূর্বসূরি লালন-পাঞ্জু-দুদ্দুর গানেও বাউল সুর সংযোজিত হয়েছে। তবে খোদা বকশের সুর ঐ সব বাউল সুর থেকে আলাদা। কবির বাউল সুরের সঙ্গীতগুলোর বাণীও বড় চমৎকার। একটি সঙ্গীতে আছে —

সইলে সম্পত্তি নইলে বিপত্তি
খাটবে না আপত্তি বিচারের সময়।
হইলে শুদ্ধ মতি তবে হবে ভক্তি
এই উক্তি যুক্তিশাস্ত্রে শোনা যায়॥ (গান নং ৬০)

সহনশীলতা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা ধর্মীয় অভীষ্ট লাভে পরম সহায়ক। এসব গুণ অর্জন করতে না পারলে সাধনায় সিদ্ধি অসম্ভব। ঐ সব গুণ অর্জনের জন্যে কেবল সেই মহাশক্তিকেই স্মরণ করতে হয়। কারণ তিনি বাঞ্ছা-কল্পতরু। তিনি ভক্তের আশা পূরণ করেন। এ জন্যে কবি বলেন —

বাঞ্ছা কল্পতরু নাম ধরেছ
পুরাও মনের বাসনা।
ঐ আশার আশে আছি বসে
আমায় কি চোখে দেখ না॥ (গান নং ৬১)

এ জাতীয় সঙ্গীতকে ভাবগীতিকারগণ বলেন রাগ-দৈন্য। এখানে আরাধ্যকে একটু বিশেষ দাবির সুরে মিনতি করে তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয়। অন্যান্য বাউল সঙ্গীতে কিছু রূপক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। একটি সঙ্গীতে কবি গেয়েছেন —

ত্যাজ্য করে মনের বিকার
নিষ্ঠা-দুধে পাতাবি দই।
ব্রহ্মানলে জ্বাল্ দিয়ে তাই
উষ্ণ-গরম রাখতে হয় ॥ (গান নং ৬২)

এ রকম রূপক বক্তব্য থেকে কবি ফিরে আসেন আবারো বাউলধর্মী উদাসী বক্তব্যে। তাঁর ভাষায় —

আষাঢ়ে উদাসী বন্ধুর মন।
নবীন মেঘের ঘটা করে
হচ্ছে ঝরঝর বরিষণ॥ (গান নং ৬৩)

কবি-রচিত 'সমাজ ও সমকাল' শীর্ষক সঙ্গীতগুলো বেশ বৈচিত্র্যময়। সমাজের নানা চিত্র, সমকালের নানা ঘটনা এসব সঙ্গীতে বিধৃত। একটি সঙ্গীতে কবি বলেন —

ধন্য সাত দোহা সন্ন্যাসীতলা।
নবগঙ্গার কূলে এসে বটমূলে
ল্যাংটা বাবার রথের মেলা॥ (গান নং ৬৪)

এখানে ল্যাংটা বাবার রথের মেলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নবগঙ্গা নদীর ধারে 'সন্ন্যাসীতলা' নামক স্থানে এই রথের মেলা বসে। কবি ঐ রথের মেলার মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন। কবির জন্মস্থান 'কররাজাহাপুর' থেকে ঘোলদাড়ি গ্রামের দূরত্ব বেশি নয়। এই গ্রামের সাধক গোপাল শাহের উল্লেখ করে একটি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এ বর্ণনায় আখড়ার অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ৬৬ নং সঙ্গীতে ভালুকের উপদ্রব বর্ণনা করে কবি ১৩৩০ সালের একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। এ বর্ণনা যেমন চিত্রধর্মী, তেমনি বাস্তবধর্মী। ৬৭ নং সঙ্গীতে কবি বলেন —

তেঘরি আর খাড়াগোদা
গোষ্ঠবিহার হয় সে মেলা,
মাঠের নামটি মোকামতলা
প্রমাণ দিল হিদাতুল্লা। (গান নং ৬৭)

সমকালীন সময়ের হাট-বাজার, মেলা-আড়ং ইত্যাদির কথা কবি এসব সঙ্গীতে উল্লেখ করেছেন। নানা পণ্য হাটে-বাজারে বিক্রি হয়। কবির গানে তা বলা হয়েছে। কবি বলেন —

কলা পেঁপে পটল শশা,
কননা শাকের কি দুর্দশা
বিক্রি করলে হয় না পয়সা,
শুধু হাটে আনা সার॥ (গান নং ৬৮)

হাট-বাজারের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে কবি পল্লি-উন্নয়নের কথা বলেছেন। পল্লি-উন্নয়ন হচ্ছে, গ্রামের অবস্থার পরিবর্তন এসেছে ইত্যাদি বক্তব্য তুলে ধরে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন। একটি গানে আছে —

হলো পল্লি-উন্নয়ন আনন্দিত মন,
নিরূপণ কর হে এখন,
সোনার বঙ্গভূমি কিছু নাইকো কমি
যতনেতে তুমি কর সংস্কার॥ (গান নং ৬৯)

বাংলাদেশের উন্নয়ন চলছে, বাংলার খাঁটি মাটিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে কবি উল্লসিত —

বারোভাটি আছে এই বাংলা জুড়ে,
খাঁটি সোনা তোলো লাঙলে খুঁড়ে।

কবির এই কথা মরমী কবি লালন শাহের বাণীর সাথে সাজুয্যপূর্ণ। লালন বলেন —

বারোভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে।

এই পর্যায়ের সঙ্গীতের মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থানের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বক্তব্যও রয়েছে। এরূপ একটি স্থান চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর। এই ফরিদপুরের রণগাজি বিশ্বাস ছিলেন নামজাদা লোক। তাঁর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কবির এ সম্পর্কিত বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য —

সোনার ফরিদপুর নিবাস রণগাজী বিশ্বাস
করিল বিশ্বাস মা-খাকী আদমতন।
নামে ভরসা ঘরামি করিয়ে কায়েমি
গুরুরূপে তিনি ভজিলেন চরণ॥ (গান নং ৭০)

এই রণগাজী বিশ্বাস ধনীলোক ছিলেন, অর্থপ্রাচুর্যের অভাব ছিল না তাঁর। তিনি একটি সখের বাগান করেছিলেন, যার নাম গোলবাগান।

চতুর্দিকে তার তেঁতুল গাছে বেড়া
উত্তর কোণে গাবগাছ আর তালগাছ খাড়া
পরে আম-কাঠাল জামরুল নারিকেল
আরো ছফেদার ফল করিল রোপণ॥ (গান নং ৭০)

১৩৮২ সালে কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলা ঘটেছিল কবির জন্মভূমি অঞ্চলে। কবির রচনায় তা উল্লিখিত হয়েছে। কবি বলেন —

ধন্য জলশূন্য তেরো শো বিরাশি সাল।
মিছামিছি পবন ব্যাটা ভেঙ্গে যায় পিয়ারার ডাল॥ (গান নং ৭১)

সমকালীন সমাজে ব্যাঙ বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, কবির রচনায় তারও উল্লেখ আছে। অতি দুঃখের সাথে কবি গেয়েছেন—

কি অসম্ভব দেখি দুই নয়নে।
ব্যাঙ বেঁচে সব লাভ করে যায়
নিষ্ঠুর মানবগণে॥ (গান নং ৭২)

এরপর রামদিয়া বাজার, খেজুরতলার হাট, খানজাহান আলীর মসজিদ ইত্যাদির বর্ণনা মেলে কবির বচনায়। এমন কি মশার উপদ্রব সম্পর্কেও লিখেছেন কবি। লালন-মাজারে গিয়ে কবি যে আনন্দ লাভ করেছেন, তারও বর্ণনা আছে তাঁর রচনায়। কবি বলেন —

আদি তীর্থ ধাম ছেঁউড়িয়া এই গ্রাম,
করিলাম বিশ্রাম মহত আঙিনায়। (গান নং ৭৮)

তিনি আরো বলেন—

পৃথিবী ব্যাপিয়া তোমারি মহিমা,
ক্ষুদ্র জীব আমি দিতে নারি সীমা। (গান নং ঐ)

এ পর্যায়ে কবির নিজের গ্রাম জাহাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বর্ণিত হয়েছে। কবি নিকটবর্তী ঘোলদাড়ি গ্রামের সম্পর্কেও নানা তথ্য তুলে ধরেছেন। যে একতারা বাজিয়ে ফকির-বৈষ্ণব ও বাউল-বৈরাগীরা গান করে, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেও কবি রসজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। একিম চাঁদ, দরবেশ লালন শাহ, তুষ্টু সাঁইজী প্রমুখের প্রশংসাগীতিও পেয়েছি খোদা বকশের হাতে। সমকালীন সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদ রীতিনীতি সম্পর্কে কবির লেখনী গতি লাভ করেছে। আধুনিক ডাক্তারের আচার-আচরণ পর্যন্ত কবির রচনায় ফুটে উঠেছে। নদী-পারাপার প্রসঙ্গে কামারখালি (ফরিদপুর) ঘাটের দুর্দশার কথাও কবি বলে গেছেন গানে। বস্তুত কবির সঙ্গীতগুলোর মধ্যে 'সমাজ ও সমকাল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গানগুলোর ভাষা, ছন্দ এবং বর্ণনাভঙ্গী বেশ আকর্ষণীয়।

কবির 'লোকগীতি' শীর্ষক সঙ্গীতরাজি বেশ একটি নতুন দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। আধুনিক পল্লিগীতি থেকে এগুলোর রচনাশৈলী, বাক্‌চাতুর্য একটু আলাদা। একটি সঙ্গীতের কয়েক ছত্র এরূপ —

তোরা কে দেখবি জামাই শীঘ্র ছুটে আয়,
জামাইর মাথায় জটা কটীতে বাঘছাল আঁটা,
সাপ জড়ানো সকল গায়। (গান নং ৯৭)

প্রেয়সীর মধুর প্রণয় এই 'লোকগীতি' শীর্ষক কয়েকটি গানে প্রাণ সঞ্চার করেছে। কবির ভাষায় —

তোমারে নয়নে লুকাইয়া রাখিবো
মুকুর ধরিয়া ও রূপ নিরখিয়া
চপলার ন্যায় তোমায় চেয়ে দেখিবো॥ (গান নং ৯৮)

অথবা—

যে যাহারে ভালবাসে
সে কি কারো কয়।
দিনের রবি রাতের চন্দ্র
জেনেছে নিশ্চয়॥ (গান নং ১০০)

প্রেমিকের কামনা বেশি কিছু নয়। প্রেমিকাকে সময় মতো দেখতে পেলেই প্রেমিক তৃপ্তি পায়। কবির একটি সঙ্গীতে এ ভাব ফুটে উঠেছে —

কন্যা তোমার কাছে আমার
চাওয়ার কিছু নাই।
সময় মতো দিও দেখা
থাকি সেই আশায়॥ (গান নং ১০১)

'লোকগীতি' শীর্ষক অন্যান্য সঙ্গীতে প্রেম, বিরহ, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মনের মানুষের কথা ফুটে উঠেছে। এ সব সঙ্গীতের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গিও আধুনিক পল্লিগীতি থেকে আলাদা। মরমী ধারার কবি হয়েও মাটি এবং মানুষের কথা বলেছেন খোদা বকশ। এখানেই তাঁর লোকগীতি রচনার সার্থকতা।

খোদা বকশ শাহের 'গৌরতত্ত্ব' সঙ্গীতগুলো নতুন আমেজে ভরপুর। এসব সঙ্গীতে পূর্বসূরি কবি লালন শাহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লালন যেখানে বলেন — 'যদি গৌর চাঁদকে পাই,' খোদা বকশ সেখানে বলেন — 'কবে গৌর চাঁদকে পাবো, প্রাণ জুড়াবো, মনে সদা এই ভাবনা' (গান নং ১১৫)। তাঁর একটি সঙ্গীতে গৌরচাঁদের নদীয়ায় আবির্ভাবের কথা আছে —

গৌরচাঁদ হয়েছে উদয় ভাবের নদীয়ায়।
রসে অঙ্গ ভরপুর পুলকিত সর্বদায়॥ (গান নং ১১৬)

বস্তুত গৌরাঙ্গ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে যে প্রভাব বিস্তার করে আছেন, বকশ-মানস সে প্রভাব পরিহার করতে পারে নি।

এর পরেই কবির 'গোষ্ঠ' শীর্ষক সঙ্গীতের কথা বলতে হয়। এ পর্যায়ের সঙ্গীতগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে যাবার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাবার আহ্বান করছেন এভাবে —

ও ভাই কানাই চল, গোষ্ঠে যাই,
সকাল বেলা ডাকি তোরে।
মায়ের কোলে থাকলি শুয়ে
আমরা কি তোর কেহই নয় রে॥ (গান নং ১১৭)

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবে, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু যশোদার ঘোর আপত্তি। তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গোচারণে যেতে দিতে চান না। তিনি বলেন —

গোষ্ঠে আর যাবে না
আমার প্রাণের গোপাল নীলমণি। (গান নং ১১৮)

তথাপি বলরাম আবারো শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠযাত্রার আহ্বান জানান। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া গোষ্ঠযাত্রা মানায় না। গোচারণ প্রাণহীন বলে মনে হয়। ধেনু ও ধেনু বৎসগণ বড়ই মনমরা হয়ে যায়। বলরামের জবানীতে কবি বলেন —

হাম্বা রবে ডাকছে ধেনু
বাজা রে ভাই মোহন-বেনু
গোষ্ঠে চল রে প্রাণের কানু
রাখালগণকে সঙ্গে করে।। (গান নং ১১৯)

বলরামের আহ্বান সত্ত্বেও মা-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়তে নারাজ। কারণ গোষ্ঠে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কষ্ট পান, মায়ের পক্ষে তা অসহনীয়। তা ছাড়াও যেখানে গোধন চরানো হয়, সেখানে হিংস্র প্রাণীর ভয়ও আছে। মা-যশোদা তাই বলেন —

শৃগাল ব্যাঘ্র সিংহ আছে
গোধন চরাও যেখানে,
দৈত্য-দানব আছে কত
শুনেছি তাই শ্রবণে (গান নং ১২০)

'কীর্তন' মধ্যযুগের গীতিকবিতা। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কীর্তন বা পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। বস্তুত পদাবলী কীর্তন মধ্যযুগীয় রচনা। অধুনা এ সঙ্গীতের প্রচার-প্রসার তেমন নেই। এ কথা ভেবেই বোধ করি মরমী কবি খোদা বকশ শাহ কীর্তন-সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর কীর্তন-সঙ্গীতগুলো ভাব, ভাষা ও ছন্দে পূর্ববর্তী পদকর্তাগণের সঙ্গীতের অনুরূপ। একটি সঙ্গীতে কবি লিখেছেন —

ও রাই এভব ভুবন মাঝে
যেদিকে ফিরি অপরূপ হেরি,
নেহারি সকাল-সাঁঝে। (গান নং ১২১)

এখানে শ্রীরাধিকার সৌন্দর্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছে তারই বর্ণনা আছে। রাধিকার অসাধারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ — কবির বর্ণনায় তারই পরিচয় মিলছে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যায় —

কমল মৃণাল সম বাহু দল
প্রেমের লতিকা সে যে
পিনোন্নত পয়োধর কিবা শোভাকর,
তুলনা দিব কি আর যে।
তার যুগল নিতম্ব কি ছার কদম্ব
মদন মুরছা যায় রে
শুভ্র অম্বর কিবা শোভাকর
ক্ষীণ কটি তটমাঝে।। (গান নং ঐ)

আর একটি সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণেব জবানীতে বলা হয়েছে —

তোমার পরশে রাধাবল্লভ নাম,
বাঁধা থাকি আমি এই ব্রজধাম। (গান নং ১২২)

রাধিকার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা। ব্রজধাম ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে পারেন না। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরশরতন, জীবনের জীবন, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিতেও সেই কথা, সেই সুর বাজে।

এরপর কবির 'পরপার চিন্তা' শীর্ষক দুটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। এ জগতে চিরদিন থাকা যাবে না। মৃত্যু এসে একদিন অজানার দেশে নিয়ে যাবে — কবির এ দুটি সঙ্গীতে সেই কথাই বলা হয়েছে। একটি সঙ্গীতে আছে —

এই সংসার বৃক্ষের ছায়ায়
বসে দিন কাটাই
ভাবি নাই দীনের একদিন
সন্ধ্যা হবে। (গান নং ১২৩)

জীবজগতে বিচরণ করেও জীবের মনে হয় না যে, একদিন এ নশ্বর জগত ছেড়ে যেতে হবে। বাল্য থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সময় কোটে যায়, তথাপি পরপারচিন্তা মনে উদয় হয় না। কবির তাই অনুশোচনা —

বাল্য কৈশোর যুবক বৃদ্ধকাল
এই চারকালে কভু ফললো না সুফল
এখন হইল বৈকাল কিছু নাই সম্বল
সামনে সন্ধ্যাকাল নাইরে দিশে।। (গান নং ১২৪)

'পরপার-চিন্তা' শীর্ষক সঙ্গীতের পরে সংকলিত হয়েছে 'শ্যামাসঙ্গীত'। রামপ্রসাদ এ সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। কাজী নজরুল ইসলামও শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ ধারায় আমরা খোদা বকশ শাহকে পেয়েছি। সহজ-সরল ভাষা, স্পষ্ট বক্তব্য এবং ভাবের গভীরতা তাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। একটি গানে কবি বলেন —

মায়ের বিচার এমনি বটে।
যে জন ভাবে ভক্তিভাবে
ও মা, তারই তুমি হও নিকটে।। (গান নং ১২৬)

মায়ের বন্দনা, মায়ের আবাহন, মায়ের স্তুতি খোদা বকশের শ্যামাসঙ্গীতে যুক্ত হয়েছে। একটি সঙ্গীতে আবাহন আছে এইভাবে —

এসো মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ দিয়ে বিদায়।
সদানন্দ হও মা উদয়
মান-অভিমান করো না তায়।। (গান নং ১২৭)

মায়ের স্তুতি শুধু নয়, মায়ের দয়ার কথাও কবি বলেছেন তাঁর সঙ্গীতে। একটি সঙ্গীতে বলা হয়েছে —

মায়ের দয়া হলে পরে
যাবে সকল সংকট দূরে
শান্তি পাবি হৃদ-মাঝারে
বিঘ্ন-বিপদ আর রবে না।। (গান নং ১২৮)

বিপদভঞ্জন মায়ের দিকেই কবির লক্ষ্য। সেজন্যে মায়ের নিকট তাঁর মিনতি —

শিশু যেমন মাকে ডাকে,
মা-ছাড়া জানে না কাকে,
শিশুর মতো করে আমাকে
পথে নিও হাতে ধরি॥ (গান নং ১৩০)

এমনিভাবে কবি তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতে মাতৃবন্দনা, মাতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে, অধিক দৃষ্টান্ত না দিয়েও একথা বলা যায়।

সর্বশেষ পর্যায়ের 'বিবিধ' শীর্ষক সঙ্গীতগুলোতে বিভিন্ন বিষয় বিধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ের প্রথম সঙ্গীতটি ছুরা ফাতেহা অবলম্বনে রচিত। এ সম্পর্কে কবি বলেন —

আল-কোরানে যতো ছুরা
তাহার মধ্যে এই তো সেরা
জানবে কি বে-ইমান যারা
মোমিনগণের হয় স্মরণ॥ (গান নং ১৩৫)

পরবর্তী সঙ্গীতে কবি নবীর দ্বীন অনুসরণের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় —

নবীর দ্বীন করে একিন চলো মোমিন,
আল্লাজীর নেক রাহাতে।
ইমানের পুঁজি করে চল ধীরে
অমূল্য ধন পাবে তাতে॥ (গান নং ১৩৬)

পরবর্তী সঙ্গীতে কবি আত্মশিক্ষামূলক কথা বলেছেন। আত্মচেতনা ছাড়া কোনো মানুষই প্রকৃত মানুষ হয় না। কবির মনের দুঃখ —

ফুটিল না মনের মুকুল
কবে ফুটবে সেই প্রেমফুল। (গান নং ১৩৭)

এরপর রয়েছে একটি প্রকৃতি-প্রেমের গান। কবি প্রকৃতিকে কতটা ভালবাসেন, তার পরিচয় রয়েছে এ গানে। কবি বলেন —

নির্মল বাতাসে ওড়ে বৃক্ষের
নবপল্লব,
সকলেই আনন্দ মনে
কারো মনে নাই ক্ষোভ। (গান নং ১৩৮)

শেষ পর্যায়ে পূজা, শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার কথা, চিন্তারোগের কুফল, গুরু বাক্যের মাহাত্ম্য, সুপথে চলার গুণ, ভক্তের গৌরব, নির্বাণ লাভের ফলাফল, আকার-নিরাকার ব্যাখ্যা, সত্যের গুরুত্ব, প্রেমের জয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে।

খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতগুলোর শ্রেণী-বিন্যাস করে প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো। এ বিভাজন যে একেবারে সঠিক, তা বলা যাবে না। তাঁর সঙ্গীতগুলো সব সংগৃহীত হলে অন্য রকম শ্রেণীবিন্যাসও হতে পারে। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত সঙ্গীতগুলো নিয়েও ব্যাপক আলোচনার অবকাশ আছে। সবিনয়ে বলবো, এ শুধু প্রাথমিক আলোচনা। আরো বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতে বিম্বিত সমাজচিত্র

কবি তাঁর সমকালীন সমাজের একজন সদস্য। ফলে সমাজ মানুষের জীবন-জীবিকা, ধর্ম-সংস্কৃতি ও বিবিধ আচার-আচরণ চিত্রিত হয় কবির কবি-কর্মে। তবে ব্যক্তি-মানুষের দৃষ্টি যেহেতু সীমাবদ্ধ, সেহেতু সমগ্র সমাজ কোনো একজনের চোখে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না।

এ কথা মনে রাখলে বকশ-সঙ্গীতে সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ আশা করা যায় না। খোদা বকশ শাহের জীবন কেটেছে গ্রাম্য সমাজে। সে সমাজের সীমাবদ্ধ পরিবেশে সংঘটিত ঘটনাবলী, সমকালে প্রচলিত রীতিনীতি এবং ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক বিষয়াদি তাঁর সঙ্গীতে আধো আলো আধো ছায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

কবি খোদা বকশ শাহ সমকালীন ফকির-সমাজের একজন সদস্য ছিলেন। তখন বিভিন্ন গ্রামে ফকির-সমাজের বৈঠক হতো। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ফকির-দরবেশগণ এ সব বৈঠকে যোগ দিতেন। দিন শেষে সাধুদরবেশগণ সমবেত হতেন। হস্তপদ ধৌত করে তাঁরা বসতেন মাহফিলে। কবি বলেন —

গোধূলি লগনে হলো আগমন,
তার সুবাতাসে হয় বনের কাষ্ঠ চন্দন,
করি পদ-প্রক্ষালন আনন্দিত মন
সাধের জনম ধন্য হইলাম॥ (গান নং ৮)

লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ প্রমুখ সাধকের অনুসারীরা সাধুসঙ্গে সমবেত হতেন। খোদা বকশ তারই স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন উপর্যুক্ত সঙ্গীতাংশে।

তৎকালে সাধু-দরবেশ যেমন ছিলেন তেমনি শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত, ফাঁকিবাজ লোকেরও অভাব ছিল না। খাঁটি সাধকের পাশে ভণ্ডতপস্বী অনেক ছিল। কবি সেই ভণ্ড-তপস্বীদের লক্ষ্য করে বলেন—

প্রবঞ্চনা কন্ঠক অঙ্গেতে ধরি
বেড়াও সদা সাধুসঙ্গ করি
স্বপ্নে পাওয়া আঁচলা স্কন্ধে করি,
আসনমান্য ভিক্ষা পাবে না, পাবে না॥ (গান নং ৪)

গায়ে সাধুর বেশ, গুরুপ্রদত্ত আঁচলা-ঝোলা কাঁধে— এ সবই ভণ্ডামী, আসল সাধুতা নয়। এ জন্যেই কবির মর্মপীড়া, সাধুসমাজের এই কপটভাবে কবি সত্যিই দুঃখবোধ করেছেন। তাঁর ভাষায় —

গরু-ব্রহ্মা যদি জানিত সেজন,
অন্যকে বলতো না মিথ্যা সে বচন,

গুরু সর্বময় দেখিত সদায়
সাধুসঙ্গে তাই থাকিত মগন।। (গান নং ১৯)

গুরুবাদী সাধক গুরুপদ অনুসরণ করে সমাজে সৎ পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী। কিন্তু কবির চারদিকের সমাজ অসৎ ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ জন্যে গুরু–বাক্য অনুসারে চলা কঠিন। সে জন্যেই —

যদি কেহ সাধুর দ্বারে থেকে
নিত্য প্রসাদ খায়,
মার্জার মুষিকের স্বভাব নাহি যায়। (গান নং ১৮)

বিড়াল ও ইঁদুরের সম্পর্ক ভাল নয়। ইঁদুরের শত্রু বিড়াল. বিড়ালকে যতই সাধুর প্রসাদ খাওয়ানো হোক না কেনো, তার হিংসাপূর্ণ মনোভাব যায় না। ভণ্ডতপস্বীর স্বভাব ঠিক ঐ রকম।

কবির সময়ে সমাজে খানাপিনা এবং ভোগ–মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বড় বড় ভোজ–উৎসব তখন ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার। গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা এসব ভোজের আয়োজন করতেন। এমন কি তীর্থক্ষেত্রেও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেতো। কবি তাই গেয়েছেন —

কত ভোগ মহোৎসব খেলাম, তীর্থে গেলাম
শিরণি খানা সাধুসঙ্গেতে
দধি–দুগ্ধ, মাখন–ছানা মিহিদানা
কোর্মা পোলাও বিরানীতে।। (গান নং ২২)

দধি–দুগ্ধ, মাখন–ছানা, কোর্মা–পোলাও, বিরানী ইত্যাদি খাবার–দাবার তৎকালীন সমাজে বিশেষত গ্রাম্য সমাজে প্রচুর ছিল।

প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে জীবন সহজ ছিল। তবে গ্রামগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে মানুষ সহজে একে অন্যের খবর নিতে পারতো না। আস্তে আস্তে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। কবির জীবনকালেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কবি তাই আনন্দে বলেছেন —

ট্রাক–বাসে রাস্তায় চলি ট্রেনে কি বলি
ঘোড়াগাড়ি আর টমটমা তাই
চড়ে কত মষে গাড়ি কাদায় পড়ি
প্রভুর কৃপায় স্টেশন পাই।।
স্টিমার লঞ্চে উঠে নৌকা পাটে
কলার মাড় আর তেলো ভোঙ্গায়
বাইসিকলের রথে চড়ি গড়াগাড়ি
আনন্দে যায় সাধুর আখড়ায়।। (গান নং ৯)

এখানে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন যানবাহনের বর্ণনা আছে। ট্রাক, বাস, ট্রেন, ঘোড়াগাড়ি, টমটম, মষেগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা, কলার ভেলা, তোলো ডোঙ্গা, বাইসাইকেল ইত্যাদি

যানবাহনের অভিজ্ঞতা কবিকে কখনো আনন্দিত, কখনো দুঃখিত করেছে। কবির গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা, সেই সাথে শহর–জীবনের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট।

কবির সমকালে গ্রামবাংলার অনেক স্থানেই নদী ছিল। খেয়া–পারাপার ছিল এ সব নদী–অঞ্চলের এক অতি সাধারণ ব্যাপার। কবির ভাষায় —

গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা তিন নদী
রাইভাটাতে পড়ে কেহ ঘোরে জন্মাবধি
সেথা কামট কুম্ভীর হয়ে অস্থির
মাঝি–মাল্লা ধরে খায়।। (গান নং ১৬)

মরমী কবি এখানে নদীর বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মরমী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কামট, কুম্ভীর ইত্যাদি যেমন তিনি সমকালীন নদীর পানিতে দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন মানব–দেহে। কারণ —

অথায় নদী বৈতরণী
ভাঙ্গা তোমার তরীখানি
কূলেতে রাইভাটার পানি
নামলে বসন ভিজে যাবে।। (গান নং ১৫)

বস্তুত নদীতে যে মাঝি খেয়া দেয়, তার উপরই যাত্রীদের ভরসা। তবে ঐ মাঝির নৌকা যদি ভাঙ্গা হয়, তাহলে বিপদের আশংকাই বেশি। তবু খেয়া পারে যেতেই হয়। নদীবহুল বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যবস্থা এই।

কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলা চাষ–আবাদের উপরই নির্ভরশীল। কৃষিই বাংলাদেশের গ্রাম–জীবনের প্রধান অবলম্বন। কবি নিজেও এই কৃষিজীবী সমাজের সদস্য। তাই তিনি বলেন —

ভিটের উপর লাগিয়ে কচু, ভাবছি কিছু
কিছু হবে কিনা হবে তাতে
পোয়া সব উঠেছে ফেঁড়ে দিচ্ছি পেড়ে
কোদাল মাটির সাহায্যেতে।। (গান নং ২৩)

কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদির সাহায্যে গ্রামে তরিতরকারীর আবাদ করা হয়। উপযুক্ত সার এবং সময়মতো সেচ দিলে গাছের চেহারা ভালো হয়। সে জন্যেই —

দেখা যায় গাছের বাহার কি চমৎকার
নবপল্লব আর সে ডোগায়,
শ্যামলের ময়দানেতে আর শাখাতে
রবি–শশী কিরণ দেয়।। (গান নং ২৭)

শ্যামল–সজীব গাছ তৈরির জন্যে যে শ্রম স্বীকার করা দরকার, অলস চাষী তা করে না। ফলে জমিতে আগাছা সৃষ্টি হয়। তখন নিড়ানি দ্বারা সেই আগাছা পরিষ্কার করেও কূল পাওয়া যায় না। কবি তাই বলেন —

হলাম এক আলসে চাষা তলা ফাঁসা
ধর্ম–হাল তো জুড়িলাম না,

এখন আদা কেশে উঠছে ভেসে
নিড়ানি ঠেসে কুল পেলাম না॥ (গান নং ২৮)

তথাপি দেশে বৃক্ষরোপণ চলছে সরকারি নির্দেশে। কবির সঙ্গীতে তার নিদর্শন মেলে। কৃষির উন্নতি করার জন্যে নানাভাবে চাষীকে উৎসাহ যোগানো হচ্ছে।

কবির সঙ্গীতে সমকালীন মেহনতি মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। পেশাজীবী লোকেরা তাদের নিজস্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে কাজ করতো দিনরাত। জনৈক কর্মকারের জবানিতে কবি বলেন —

পেতে এই কামারশালা এই দোচালা
থাকি খরিদদারের হুকুমেতে।
যখন যা করে হুকুম করি সেই কাম
কতো মান-অপমান হই তাহাতে॥ (গান নং ২৯)

খরিদ্দারের ফরমাইয়েশ মতো দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেও খরিদ্দারকে খুশি করা যেতো না। ফলে মান-অপমান হতে হতো কর্মকারকে। লোহার কামারের এ অবস্থা হলেও কিন্তু স্বর্ণকার গয়না গড়তো পছন্দ মতো। কবি গেয়েছেন —

নীন শাঁড়াশি হাতুড় তিনজন হয়ে এক মন
আমি একজন করি ভাবনা,
হেতেনে বাতাস টেনে হাফর আগুনে
গড়ি গড়ন এই কয়জনা॥ (গান নং ২১)

বাংলাদেশের পেশাজীবী মানুষ চিরদিনই অবহেলিত। কবি খোদা বকশ শাহের রচনায় তার নতুন চিত্র পাওয়া যায়।

তৎকালীন সমাজে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহবিলাপ লক্ষ্য করেছেন কবি। একে অন্যকে না দেখার বেদনা তাঁদের হয়ে কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর সঙ্গীতে। প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে বলেন —

তুমি না আসিলে পরে
কেমন করে থাকবো ঘরে
আমার দুই নয়নে বারি ঝরে
তোমা বই যে হই অন্ধ॥ (গান নং ৩৩)

সত্যিই তো প্রেমিকাকে না পেলে প্রেমিকের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। একা থাকা অসহ্য মনে হয়। নয়নজলে বুক ভেসে যায়। প্রেমিককে তাই আবারো বলতে শুনি —

তোমার আসার আশে থাকি পরবাসে
বিরহ যাতনা আর সহে না
যদি তোমায় পেতাম মন-প্রাণ জুড়াতাম
পেতাম আমি সান্ত্বনা (গান নং ৩৪)

না পাওয়ার যন্ত্রণা কত অসহনীয়, কবির সঙ্গীতে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন সমাজে প্রেমিক-প্রেমিকার এই মর্ম-যাতনা চিত্রিত করতে কবি বিরহ বা বিচ্ছেদ সঙ্গীত রচনা করেছেন। একটি সঙ্গীতে আছে —

ইচ্ছা হয় না গৃহকাজে
একবার যাই আর একবার আসি,
তোমার দেখার আশে দেশ-বিদেশে রে
বন্ধু, ফিরি দিবানিশি॥ (গান নং ৪১)

এ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সাপের বিষের মতো সক্রিয়। দেহ-মন একযোগে আক্রান্ত হয় এ বিষে। জর্জরিত হয় অন্তঃকরণ। তখন প্রেমিক বা প্রেমিকা লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে বলে ফেলে —

দংশিল গোখরা ফণী
নামে না বিষ প্রাণ-সজনী
প্রাণ যাইবার আগে যেনো
একবার যাইও দেখা দিয়া॥ (গান নং ৪৫)

সর্প-দংশনের মতো এ জ্বালা সহ্য করেও প্রেমের পথের পথিক প্রেমের পথেই চলতে চায়। কবি এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছেন।

কবি খোদা বকশ শাহের জীবনকালে অনেক গ্রাম্যমেলা অনুষ্ঠিত হতো। নানা প্রকার পণ্য আসতো এ মেলায়। অনেক লোকের আগমন ঘটতো সেখানে। ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠতো মেলাস্থল। দু-একটি মেলার নামও জানা যায় কবির সঙ্গীত থেকে—

তেঘরি আর খাড়াগোঁদা
গোষ্ঠবিহার হয় সে মেলা,
মাঠের নামটি মোকামতলা
প্রমাণ দিল হিদাতুল্লা। (গান নং ৬৭)

তেঘরি, খাড়াগোঁদা ইত্যাদি গ্রাম্যমেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কবির শিষ্য হিদাতুল্লা এসব মেলার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। মেলায় বিক্রিযোগ্য পণ্যের বিবরণ পাই কবির রচনায় —

ধামা কাঠা, বেতো পাখি
গরু, ঘোড়া, মেটে হাতী
হাঁড়ি, কলসি, মালসাপাতি
বারোভাজার দেখি কিল্লা॥ (গান নং ৬৪)

গ্রাম্যমেলার দৃশ্য পল্লিসমাজের এক অতি সাধারণ ব্যাপার। কবির সঙ্গীতে সে দৃশ্যই প্রতিভাত হয়েছে। এ দিক থেকে কবি সার্থক।

গ্রাম্য হাটবাজারের অপূর্ব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। তাঁর সঙ্গীতে তৎকালীন হাটের পণ্য বিকিকিনির দৃশ্য বড়ই মনোরম। গ্রামের হাটে শাকসবজি কত সস্তা ছিল, কবি তাঁর রচনায় তা বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায় —

কলা পেঁপে পটল শশা
কনকা শাকের কি দুর্দশা
বিক্রি করলে হয় না পয়সা
শুধু হাটে আনা সার॥ (গান নং ৬৮)

গ্রামের কৃষকগণ বহু পরিশ্রম করে সবজি ফলায়। কিন্তু সে সবের দাম পায় না। কারণ বাজারে সবজির দাম খুবই কম। কবির সঙ্গীতে এসব চিত্র অত্যন্ত সজীব রূপ ধারণ করেছে।

এ সব কৃষিপণ্য ফলাতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে অনাবৃষ্টি দেখা দিত। ফলে ফসলের মাঠ জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। কবির ভাষায় —

জ্যেষ্ঠ মাস এলো যে সময়
রবির তাপ অতি প্রখর হয়
পাটের মাথা বাঁকা হয়
তাপে ন্যাংলে নিড়িন বন্ধ হলো
না হয় ক্যানাল কাট, বাঁধ দল॥ (গান নং ৭১)

রোদ্রের তাপে পাটগাছের ডগা শুকিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে। ক্ষেতে আঁচড়া দেওয়া এবং নিড়ানি করা বন্ধ আছে। খাল কেটে পানি সেচ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। কবির সঙ্গীতে এ দূরবস্থার চিত্র বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কবি খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতে কতিপয় সাধকাশ্রম, মাজার, মসজিদ এবং মন্দিরের চিত্র বিম্বিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ফরিদপুর গ্রামের রণগাজি বিশ্বাসের একটি স্মৃতি-আশ্রম আছে। এ আশ্রম সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত। রণগাজি বিশ্বাস একটি বড় বাগান করেছিলেন। এই বাগানের মাঝখানে তিনি নাকি তাঁর দেহ রাখেন অলৌকিকভাবে। এ সম্পর্কে কবি বলেন —

অম্বুবাচি যোগে সাধুসঙ্গ দেয়
কাপড়ের কাণ্ডারী ঘিরে মাঝখানে রয়
একা তিনি ছিল, পরে সুড়ঙ্গ দেখা গেল
আর একটা পানির বালতি ছিল
সাধুরা বলিল এই বিবরণ॥ (গান নং ৭০)

কথিত আছে, অম্বুবাচির যোগে রণগাজি বিশ্বাস তাঁর বাগানে একটি সাধুসঙ্গ (ফকিরি মজলিশ) করেন। বহু ফকির-দরবেশের উপস্থিতিতে তিনি মজলিশের মাঝখানে কাপড়ের পর্দা ঘিরে ধ্যানস্থ হন। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়, রণগাজি বিশ্বাস কাপড়ের আড়ালেই থাকেন, বাইরে বের হন না। অবশেষে দেখা যায়, পর্দার আড়ালে রণগাজি বিশ্বাস আর নেই। তিনি যেখানে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন, সেখানে একটি সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে। ঐ সুড়ঙ্গের চারপাশ পাকা করে বাঁধানো হয়েছে। এখনো ওখানে রণগাজি বিশ্বাসের স্মৃতিবার্ষিকী পালিত হয়। কবি খোদা বকশ শাহ তাঁর সঙ্গীতে এ কিংবদন্তির পুরুষ রণগাজি বিশ্বাসের আশ্রমের চিত্র তুলে ধরেছেন।

কবি এক সময় বাগেরহাট সফর করেন। সেখানে খানজাহান আলীর মাজার, মসজিদ ও দীঘি দর্শন করে যে অনুভূতি তাঁর হৃদয়কে অভিভূত করে, তার একটি ভাষাচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। খানজাহানকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন —

বোগদাদ আজমীরে তোমার মহিমা
বাগেরহাট দীঘির পাড় গড়িয়ে সীমা
তোমার রওজামোবারক
দেখিলে যায় শোক
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে সর্বদায়॥ (গান নং ৭৫)

অথবা

হেরি মসজিদ ষাট-গম্বুজ, ভাবি হৃদয় মাঝ
ওহে বেনিয়াজ তোমার কারসাজ
সিলেট হতে আসে পাথর জলে ভাসে
বাগেরহাট মসজিদের করলে থামের কাজ॥ (গান নং ৭৬)

এখান থেকে কবি চলে যান কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াস্থ লালন-মাজারে। লালন শাহের অমর স্মৃতি ধারণ করে আছে যে সমাধিসৌধ, তা দেখে কবির মনে গভীর ভাবের উদয় হয়। এভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সঙ্গীতে। কবির সঙ্গীতে আছে —

কাঁচে ঢাকা বহ্নি আছয়ে যেমন
মন্দিরে নিদ্রা যায় সাঁই দরবেশ লালন
তাহারি কিরণ ভক্তবৃন্দগণ
চারদিকে তারা করিছে রশনায়॥ (গান নং ৭৮)

এ বর্ণনা থেকে সাধকপ্রবর লালন শাহের সমাধি-মন্দিরের চিত্র ফুটে উঠেছে। পবিত্র লালন-সমাধির জ্যোতি যেন ভক্তপ্রাণে আলোর সঞ্চার করেছে। কবি-কল্পনায় আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। এর পরেও কবি অধিকতর শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বলেন —

কবি স্মরণ দরবেশ লালন
তোমারি ঐ চরণে,
মহানিদ্রায় আছ শুয়ে
ছেঁউড়িয়ার এই কাননে। (গান নং ৮৩)

দরবেশ লালন শাহের আখড়া একদিন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এখন সে বনজঙ্গল নেই, পাকা ইমারত গড়ে উঠেছে সেখানে। কবির রচনাতে লালন-সমাধির অতীত অবস্থা ধরা পড়েছে। কবি তাই স্রষ্টাকে স্মরণ করে বলছেন —

ওহে মাবুদ মওলা, কত লীলাখেলা
দেখাইলে সাঁই লালনের আখড়ায়,
ছিল ঝোড়জঙ্গলে পুরা, ছিল মশা ভরা
সাধুগুরু সমাধিতে ভক্তি দিত তাই॥ (গান নং ৮৫)

লালন-আখড়ার ভাষাচিত্র উপস্থাপনের পর কবি নিজগ্রামের অতীত-ইতিহাসের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়—

আহা কি ছিল জাঁহাপুর এই বাজার
কতো যে কারবার হয়েছে হেথায়,
কত ধনী মহাজন আর দোকানদারগণ
হয়ে একমন ছিল এক অশ্বত্থ তলায়॥ (গান নং ৭৯)

কবির মাতৃভূমি জাঁহাপুর গ্রাম এক সময় খুব সমৃদ্ধ ছিল। জাঁহাপুর বাজারে বহু ধনী-মহাজন কারবার করতো। অনেক দোকানমালিক ব্যবসা করে বাজারকে জমজমাট করে রাখতো। কবির জীবনকালেই সে বাজারের অবনতি ঘটেছে। এ জন্যে কবি মর্মাহত হয়েছেন।

কবির গ্রামের নিকটেই ঘোলদাড়ি গ্রাম। অতি প্রাচীন এ গ্রামে অসংখ্য সাধুদরবেশের বাস ছিল। কবি সে সবের নিদর্শন দেখতে না পেয়ে দুঃখ করে বলেছেন —

বড় জঙ্গল আরো
গরু-মানুষ ধরতো বাঘে
এখন সে সব গেল, ফর্সা হলো,
ঘরবাড়ি নাই মুখে আখড়া বলে॥ (গান নং ৮০)

ঘোলদাড়ি আখড়া সাধুর পীঠস্থান হিসেবে যথেষ্ট নামকরা। কিন্তু এ আখড়া অনেক দিন যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। মাঝে কিছুদিন বনজঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। এখন বনজঙ্গল নেই। কিন্তু আখড়াও নেই। আখড়ার নামটি কেবল আছে।

কবি এরপর একিম চাঁদ, তুষ্টু সাঁইজি, ইজ্জত আলী সাঁই প্রমুখ স্বনামধন্য সাধকের আখড়া ও সমাধিক্ষেত্রের চিত্র তুলে ধরেছেন। সে সব আখড়ার অবস্থাও ভাল নয়। আখড়ার জৌলুশ নেই বটে, কিন্তু ভক্ত দর্শনার্থীরা এখনো তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণের আশায় আখড়ায় যাতায়াত করেন। কবির ভাষায় —

ক. গরু মহিষ হারাইলে সন্ধান মেলে
একিম চাঁদের কাছে গেলে,
কতজন করে শিরণী তাহার জন্য
রোগব্যাধি হয় যাহার॥ (গান নং ৮২)

খ. ফকির বাগান নাম, অতি মনোহর
দরবেশ তুষ্টু সাঁইজির ধাম
তাহে শোনা যায়।
কত পাগল মস্তান ধনী মহাজন
করেন ভ্রমণ এই বাগানের ছায়ায়॥ (গান নং ৮৪)

গ. এলো শুভক্ষণ পরলোক গমন করিল রে মন
মহত ইজ্জত আলি সাঁই
গ্রাম ছত্তরপাড়া ঘুরতেন আগাগোড়া
হিংসা-বিদ্বেষ কারো সঙ্গে ছিল নাই॥ (গান নং ৮৮)

এই সব সাধকের আখড়া-আস্তানা দর্শন-শেষে কবি তাঁর অতি পরিচিত গ্রাম-তালতলা হয়ে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন দিয়ে ঢাকার পথে রওনা হন। তালতলা গ্রামের পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে কবি গেয়েছেন —

সাধের গ্রাম তালতলা লাগে মধুর মেলা,
কত লীলাখেলা হয় যে তথায়,
পূজা ও পার্বণ আরতি কীর্তন
ভুবনমোহন আলোকিত হয়॥ (গান নং ৯০)

আনন্দকীর্তনে মুখর তালতলা দেখার পর কুমারনদের পাশ দিয়ে পথ চলার আনন্দে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় —

এই তো কুমার নদী, ছিল অগাধ জলধি
কত পালের নৌকা ডিঙ্গে ভেসে যতো তাই
হতো গঙ্গাস্নানের মেলা শ্মশানে মরা ফেলা
শিশু-কুম্ভীর জলে ভাসতো সে সময়॥ (গান নং ৯২)

এক সময় কুমারনদ অতি গভীর ছিল। বড় বড় নৌকা চলতো ঐ নদের পানিতে। কুমারের তীরে গঙ্গাস্নানের মেলা বসতো। শ্মশানঘাটে মৃতদেহ দাহ করা হতো। শিশু, কুম্ভীর ইত্যাদি প্রাণী কুমারের পানিতে বাস করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই কুমারনদ মরে গেছে। পূর্বের বহতা নদী এখন মরানদী। কবির ভাষায় —

ঘাটেতে রয়েছে বহু আবর্জনা
কলমি দামদল আরো টোপাপানা,
তটেতে বসিয়ে করি ভাবাগোনা
হাইল্ বৈঠা নিয়ে দাঁড়ী-মাল্লারা সবায়॥ (গান নং ১৪)

ঢাকায় যাবার পথে ফরিদপুরের কামারখালী ঘাট। সেই ঘাটে দিনরাত ফেরি চলে। ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার ইত্যাদি পার হয় ঐ ফেরিতে। কবি বলেন —

দেখলাম ঘাট কামারখালী, আর কি বলি
ছুটে চলি পারের কারণ।
ছয়খানা ফেরি আছে খেয়া দিচ্ছে
দিবানিশি সদা সর্বক্ষণ॥ (গান নং ৮৭)

এমনিভাবেই ঘাট পার হয়ে কবি চলে যান ঢাকায়। কবির ভাষায় —

দয়াল মুর্শিদের কৃপায় এসে ঢাকায়
দেখলাম লালবাগ কিল্লা কি চমৎকার।
চারিদিকে বাচ্‌ড়া পড়ে ঘাসে জুড়ে
অনেক জায়গা জনশূন্যকার॥ (গান নং ৯৪)

ঢাকায় এসে লালবাগের কিল্লা দেখে কবি অভিভূত। তবে এর অবহেলিত রূপ দেখে তিনি দুঃখবোধও করেছেন। এরপর তিনি গেছেন বৌদ্ধমন্দির দেখতে। সেখানে গিয়ে তাঁর অনুভূতি এরূপ —

বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম অতি মনোহর
সামনে সরোবর শোভিত মণ্ডন।

মহানগরী ঢাকায় মানব–দেবতার উদয়
ভক্তগণ তাই করছে ভজন–পূজন ৷৷ (গান নং ৯৫)

বৌদ্ধভক্তগণের 'ভজন–পূজন' দেখে কবির ভাল লেগেছে। তিনি ভক্তিভরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভগবান বুদ্ধকে। তার মরমী মনের বিশেষ ভাবমূর্তি প্রতিফলিত হয়েছে এখানে।

কবির রচনায় গ্রামবাংলার কয়েকটি করুণ চিত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে ব্যাঙ ধরার চিত্রটি খুবই বেদনাদায়ক। গ্রামের কিছু লোক ব্যাঙ ধরে বিক্রি করতো একসময়। কবি বলেন —

সরোবর আর গেড়ে–গর্তে
চলে তারা সেই সব পথে
হায় গো!
ব্যাঙ পেলে আনন্দের সাথে
ধরে অতি যতনে ৷৷ (গান নং ৭২)

বস্তুত এক সময় ব্যাঙ ধরা এবং ব্যাঙ বিক্রি করা একটি পেশা ছিল। কবি এ পেশাকে খুব ভাল মনে করেন নি। ঝাড়জঙ্গল, ডোবা–নালার প্রাণী এমন নিষ্ঠুরভাবে ধরে আনা ঠিক নয় বলে তাঁর মনে হয়েছে।

কবির রচনায় আরো অনেক বিষয়ের বর্ণনা আছে। সে সবের মধ্যে ভালুকের উৎপাত, মশার উপদ্রব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৩৩০ সালে কবির জন্মভূমি অঞ্চলে ভালুকের আগমন ঘটেছিল। অনেকের প্রাণনাশও হয়েছিল বলে জানা যায়। ভয়ে রাত্রিতে কেউ ঘরের বাইরে যেতো না। সন্তান–সন্ততিকে সাবধানে আগলে রাখতো। কবির ভাষায় —

শুনেছি ভালুক এসেছে ও ভাই আমাদের দেশে
মেয়ে–পুরুষ ভেবে মলো রাত্রি অবশেষে
পায়খানা আর পেসাপেতে কাঁথা–কাপড় নষ্ট হয় ৷৷ (গান নং ৬৬)

ভালুকের ভয়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব হতো না। ফলে অনেকে বিছানায় প্রস্রাব–পায়খানা করে ফেলতো। লোকের কষ্টের সীমা ছিল না। মশা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। তথাপি এর উপদ্রব অসহ্য। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম নেয়, শান্তিতে ঘুম যায়। কিন্তু মশা এ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। মশার জন্ম কিন্তু পচা ডোবা–নালায়। কবি বলেন —

মশার জন্ম যেখানে
ছুঁতো হাঁড়ি পচা পানি কচু–বাগানে,
লঘুগুরু মানে না সে
পেট ভরলে মেটে আশা ৷৷ (গান নং ৭৭)

মশার কোনো বাছ–বিচার নেই। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত শোষণ করাই তার কাজ। কবি এ মশার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে খুব সম্ভব সমাজের শোষক ব্যক্তিদের কথাই বলতে চেয়েছেন।

প্রথমেই বলেছি, কোনো কবির রচনাতেই সমকালীন সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। খোদা বকশ শাহের রচনাতেও সে জিনিসটি আশা করা সমীচীন নয়। তবু তাঁর রচনাবলী পর্যালোচনা করে সমকালীন সমাজ এবং দেশকালের যে চিত্র পাওয়া যায়, এখানে তা তুলে ধরা হলো।

খোদা বকশ শাহের রচনাবলীর সাহিত্যমূল্য

লালন শাহ ও তাঁর ঘরানা অনুসারীদের সঙ্গীত কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 'ভাবসঙ্গীত' অথবা 'ভাবগান' নামে পরিচিত।[১] যে গান শুনে মনের মধ্যে অধ্যাত্ম–চিন্তা প্রবলভাবে জেগে ওঠে, তাকেই বলা হয় ভাবগান।[২]

'ভাব' শব্দটির অনেক অর্থ। তার মধ্যে অভিপ্রায়, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, প্রকৃতি, প্রীতি, প্রণয়, মর্ম, চিন্তা, ভক্তি, আবেশ ইত্যাদি অর্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৩] বস্তুত ভাবগানের বিচার–বিশ্লেষণ করলে এসব অর্থ উপলব্ধি করা যায়।

অন্তর্নিহিত কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ভাবগানকে একটা আলাদা পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মানব–জীবনের পূর্বাপর অবস্থা, জীবন–লাভের উদ্দেশ্য, কর্তব্য সাধনের উপায়, কর্মফল, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, দেহ–আত্মা–মন, শাস্ত্র–সমালোচনা ইত্যাদি এ গানের বিষয়বস্তু। প্রকৃতপক্ষে এসবই তত্ত্ব। এ সব তত্ত্বের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করার মাধ্যম হওয়ায় এ গানকে তত্ত্বগীতি বা তত্ত্বসঙ্গীতও বলা হয়। সুফিদের গজল ও সামা এই ভাবসঙ্গীতের সমগোত্রীয়। আবার সহজিয়া বৈষ্ণবদের পদাবলীর সাথেও এর সাজুয্য লক্ষ্য করা যায়।[৪]

মরমী কবি লালন শাহকে ভাবসঙ্গীতের পথিকৃৎ বলা হয়। লালন–পরবর্তীকালে দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, জহরদ্দি শাহ প্রমুখ এ গানের উল্লেখযোগ্য গীতিকার। এঁদেরই উত্তরসাধক রূপে খোদা বকশ শাহের আবির্ভাব।

ঐতিহাসিক নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি এ উপমহাদেশে সামা বা অধ্যাত্ম সঙ্গীত ধারা প্রবর্তন করেন। আমীর খসরু, ফরিদুদ্দিন গঞ্জ–ই–শোকর, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ তাপস সে ধারা চালু রাখেন। নিজামুদ্দিন থেকে শিষ্য–পরম্পরায় ঐ ধারা লালনের মাধ্যমে মনিরুদ্দিন–খোদা বকশ–শুকচাঁদ হয়ে বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য খোদা বকশ শাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৫]

পূর্বসূরির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও খোদা বকশের ভাবসঙ্গীত সুর, ছন্দ, ভাষা, রচনারীতি বিচারে স্বতন্ত্র আবেদনধর্মী হয়ে উঠেছে। তাঁর সঙ্গীতগুলো পাঠ করলে কিংবা শিল্পীকণ্ঠে শ্রবণ করলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানের তত্ত্ব ছাড়াও দেশীয় মাটির সুর এ সঙ্গীতে প্রাণ–সঞ্চার করেছে। বিশেষত 'বাউল সুর' এ সঙ্গীতকে মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাউল সঙ্গীতে পিলু, খাম্বাজ, ঝিঝিট, বিভাস, ভূপালী, দেশকার — এই সুরগুলো ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া ঢঙ এবং তালেরও একটা নিজস্ব কায়দা আছে।[৬] খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতেও ঐ সব সুর আরোপিত হয়ে এক অপূর্ব রস সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বসঙ্গীতও যে জনপ্রিয় হতে পারে বকশ–সঙ্গীতের আসরে গেলে তার প্রমাণ মেলে।

খোদা বকশ শাহের এই তত্ত্বসঙ্গীত সাহিত্য–বিচারের বিষয় কিনা এবং এর সাহিত্যমূল্যই বা কতখানি, সে বিষয়ে দু–একটি কথা বলার আছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে

চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন— 'বাংলার তত্ত্বসঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্তর্নিহিত ভাবের দিক দিয়া ইহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারিলেও বহিরঙ্গ রূপের মধ্যে ইহার সাহিত্যিক রসের অভাব বোধ হয় না। অর্থাৎ বাংলার তত্ত্ববিষয়ক রচনাসমূহ দর্শনশাস্ত্রের নীরস সূত্র নহে — উপমায়, রূপকে ও অন্যান্য অলংকারে ইহাদের বহিরঙ্গে সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।'[৭] এ মন্তব্য অনুসারে বোঝা যায় যে, তত্ত্বসাহিত্য সাহিত্যমূল্য বর্জিত নয়। সেই নিরিখে খোদা বকশ শাহের ভাবসঙ্গীত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে একটি বিশিষ্ট আসন লাভের যোগ্য এবং এর সাহিত্যমূল্যও উপেক্ষণীয় নয়।

কোনো কবির কবিকর্মের সাহিত্যমূল্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে— কবি-ভাষা, শব্দচয়ন, বাণীভঙ্গী, অলংকার, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, কবি তাঁর কবি-কর্মের মধ্যে নিজের অন্তর-পুরুষকে প্রকাশ করেন, বাহ্য জগতের রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দকে আত্মগত অনুভূতি-রসে স্নিগ্ধ করে তোলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বস্তুসত্তাকেও প্রকাশ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে সার্বজনীন রূপ ধারণ করে রস সৃষ্টি করে। রসসিক্ত এ ভাব ও অনুভূতি যখন উপযুক্ত ভাষায় অলংকার ও ছন্দাদি যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং চিত্তে রসসঞ্চার দ্বারা আনন্দ দান করে, তখনই তা প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হয়। সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগের সংহত গভীরতা ও প্রকাশের অনবদ্য কৌশলই কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষতা বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কল্পনার লীলা ও আবেগের তরঙ্গ থাকলেও তা যদি উৎকৃষ্ট কলার মাধ্যমে প্রকাশ না পায়, তবে তা প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না।[৮] এই বিচারেই যে কোনো কবি-কর্মের সাহিত্যমূল্য নির্ণীত হয়।

খোদা বকশ শাহের কবি-কর্ম অধ্যাত্ম সাধন-তত্ত্বভিত্তিক, যার মধ্যে সাধন-প্রণালীর কথাই ব্যক্ত হয়েছে। খোদা বকশ শাহের সাহিত্যের পরিধি তাই স্বল্পবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যহীন। তথাপি বলা যায় যে, সঙ্গীত-আকারে বক্তব্য উপস্থাপন করেও কবি খোদা বকশ তাঁর রচনায় এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যেখানে এসে গেছে একটি সাধারণ মানবিক আবেদন এবং মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও অকপট আত্মসমর্পণের সহজ আকুতি। এ বিষয়টি বিবেচনা করলে খোদা বকশ শাহের রচনাবলীর সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

খোদা বকশ শাহের অধ্যাত্ম সাধনার মূল বিষয় আত্মতত্ত্ব। কবির সঙ্গীতের বাণী পাঠ করে এ কথাই মনে হয় যে, কবি যেন বলতে চান — 'অন্যান্য তত্ত্ব অবগত হবার আগে আত্মতত্ত্ব বা আত্মপরিচয় অবগত হওয়া প্রয়োজন। আত্মপরিচয়ের অর্থ — কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, যাব কোথায় ইত্যাদি তত্ত্ব-অনুসন্ধান। কবি বলেন —

হাদিস দলিল দিয়ে লোকেরে বুঝায়
নিজেকে সংশোধন করিতে না চায়।[৯]

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে আত্মসমালোচনা আবশ্যক। নিজেকে সংশোধন করতে না পারলে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়। তখন কেবল 'অন্তরে গ্লানি সাজগোজ পরা'[১০] সার হয়। প্রবঞ্চনা ও শঠতা ব্যতীত কিছুই লাভ করা যায় না।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে, খোদা বকশের রচনাবলী আধ্যাত্মিকভাবে ভরপুর হলেও সাহিত্যের প্রাণরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস বা প্রীতিরস বর্জিত নয়। বস্তুত সব মরমী সাহিত্যেই অধ্যাত্মভাবের মধ্যে প্রীতিরস আছে। প্রকৃতি-পুরুষের দেহ-মিলনজনিত সাধনার কথা যেখানে আছে, শৃঙ্গাররস বা প্রীতিরস সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি মরমী সঙ্গীত চর্যাপদেও তাই শৃঙ্গাররস সিঞ্চিত হতে দেখি। ডক্টর সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেন — 'কেবল নিগূঢ় অধ্যাত্ম চিন্তাই নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয় ধর্ম চিন্তায় নতুন শক্তি ও রস সঞ্চারিত হয়েছে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও যোগীদের দ্বারা।'[১১] এই রসই শৃঙ্গাররস বা প্রীতিরস। বৈষ্ণব পদাবলীতেও রাধা-কৃষ্ণের জৈবিক আকর্ষণ ও দৈহিক মিলনের প্রেমতত্ত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আদি (শৃঙ্গার) রসের প্রাবল্যে তত্ত্বাশ্রিত জীবাত্মা-পরমাত্ম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হারিয়ে সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী সাধারণ নরনারীতে পরিণত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারেও অখিল রসামৃত শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাই একমাত্র রস এবং তা অপ্রাকৃত। মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রস সেখানে সর্বপ্রধান।[১২]

মরমী কবি খোদা বকশ শাহ তাঁর সঙ্গীতে এই প্রীতিরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর 'প্রেম ও রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক সঙ্গীতরাজীতে এ রসের সন্ধান মেলে। এক স্থানে কবি বলেন —

যাহার কারণ নিশি জাগি অকারণ
কেমনে নিবারণ হয় বেদনা।
শয্যাতে খুঁজি আছ তুমি বুঝি
না পেয়ে কেবল বাড়ে যাতনা॥[১৩]

নিশিজাগা, শয্যাতে খোঁজ করা — এ যে মানবীয় দেহগত প্রেমেরই লক্ষণ। কবি তাঁর অন্তরের জৈব-ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে। শৃঙ্গার রসের আভাস পাচ্ছি এ স্তবকে। অন্যত্র আরো একটু কাব্যিক ভঙ্গিতে তিনি এ ভাবেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে —

ললাটেতে পূর্ণ শশী
ভূতলে পড়িছে খসি
লোচনে কাজলের আভা
কেশে মালা দোলে সখনে॥
তিনফুল নাসিকাখানি
বলবো কি তার গুণবাখানী
ওষ্ঠ-অধর কি শোভাকর
সদ্য গোলাপ ফোটে আননে॥[১৪]

এখানে প্রেমিক-কবি তাঁর প্রেয়সীর রূপ-বর্ণনায় মুখর হয়েছেন। উপমা-ব্যবহারে প্রিয়াকে তুলে ধরেছেন মনের মতো করে। অধ্যাত্মবাদের কবিও যে আদি রসাত্মক বক্তব্য পেশ করে অধ্যাত্ম সঙ্গীতকে রসোত্তীর্ণ কাব্যসুষমা দান করতে পারেন, তার প্রমাণ এখানেই বর্তমান।

কাব্যমধ্যে মানবীয় আবেদন-সৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বকথা-প্রধান হলেও বকশ-রচনাবলী মানবীয় আবেদনে ভরপুর। মানুষের মাহাত্ম্য, কীর্তিত হয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় —

আদি মানুষ মানুষ-মুরতি
মাটি হতে মানুষ উৎপত্তি
মানুষ ছাড়া নাই অন্য গতি
দীনহীন অবোধ বকশ কয়॥[১৫]

এখানে মানুষের মাহাত্ম্য কীর্তন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের করণ বা সহজ সাধন ব্যতীত মানবজন্ম বৃথা। এ মানুষ ত্রিবিধ — অযোনি, সহজ, সংস্কার। কবি বকশ বলেন —

তিন মানুষের হয় সংসার
অযোনি সহজ সংস্কার
ভজনে সহজ মানুষ আকার
সেই তো উদ্ধার হয়ে যায়॥[১৬]

এ সাধন-পদ্ধতি যিনি অবগত আছেন, তিনি হচ্ছেন মানুষ-গুরু। তাঁকে অনুসরণ করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কবির ভাষায়—

মানুষ-গুরু যদি ভজিবারে চাও
কুচরিত্র ছেড়ে সুপবিত্র হও। (গান নং ১৯)

মানুষ-রূপী এই গুরু বা মুর্শিদের ব্যাখ্যা ব্যাপক। আমরা সে ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। আমরা শুধু এতটুকুই বলতে চাচ্ছি যে, মরমীদের দৃষ্টিতে মুরশিদ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ-শিক্ষক তথা সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি। সে জন্যে মানুষ-গুরুকে চেনা-জানা আবশ্যক। আরো দেখতে পাই, কবি খোদা বকশ শাহ অধ্যাত্ম মানবতাবাদ (Spiritual Humanism) স্বীকার করেও নিরপেক্ষ মানবতাবাদ (Secular Humanism) তুলে ধরেছেন তাঁর সঙ্গীতে। তিনি গেয়েছেন —

ত্রিলোকের মনহরা রূপ
নরবপু তাহার স্বরূপ। (গান নং ১০)

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন — 'আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট : তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। ... মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই, সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই।'[১৭] এ স্তরে পৌঁছিয়ে লালন শাহ গেয়েছেন —

মানুষতত্ত্ব সত্য হয় যার মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে॥[১৮]

এ কথা যথার্থ যে, মানব-সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টার গূঢ়-রহস্য আছে, তা উপলব্ধি করাই মানবজীবনের কর্তব্য। খোদা বকশ শাহ সে জন্যেই বলেন —

এই মানুষে আছে মানুষ
মানুষ ধরলে জানা যায়।[১৯]

মানুষের অভ্যন্তরীণ মানুষকে জানার জন্যে রক্তমাংসের মানুষরূপী গুরুকে ধরতে হয়। কবি এখানে ভক্তরূপী মানুষ, গুরুরূপী মানুষ এবং রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ — সকলকে জানা ও চেনার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। এখানেই তিনি সেক্যুলার হিউম্যানিজম এবং স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজমকে এক করে দেখেছেন।

খোদা বকশ শাহের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অপূর্ব গীতিময়তা। তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতে তিনি নিজেই সুর সংযোজন করেছেন। তাঁর সারা জীবনের সঙ্গীত সাধনার ফসল এই সঙ্গীতগুলো। তিনি সুরের মাধুর্যে এগুলোকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়ে এ সব সঙ্গীত একটা ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করে। উদাসী মাটির সুর শ্রোতাকে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে নিয়ে যায়। কোনো কোনো গানে কীর্তনের প্রভাব, কোনোটায় রামপ্রসাদী আবেশ, কোথাও বা কাওয়ালী ও গজলের আমেজ— সর্বোপরি বাউল সুরের মাধুর্য বকশ-সঙ্গীতকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

বকশ-সঙ্গীত বাউল-অঙ্গের সঙ্গীত, ভাবের মধুময় পরিবেশ সৃষ্টিতে যার তুলনা হয় না। অনেক মনীষী এ জাতীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে উত্তম মন্তব্য করেছেন। এ গানের প্রভাব যে কত ব্যাপক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তা বলে গেছেন। তাঁর ভাষায় — 'আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'[২০] এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উক্তিও স্মরণীয়। তিনি বলেন — 'মুর্শিদী ও মরমী গান আধ্যাত্মিক গান। গায়কেরা প্রায় অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। এ সকল গানে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।'[২১] ডক্টর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও এ বিষয়ে একমত। তাঁর ভাষায় — 'বাউল ও মুর্শিদী গান আমাদের লোকসঙ্গীত। এ লোকসঙ্গীত ধর্মভিত্তিক।'[২২] সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে ভিত্তি করে একটি অভিমত পেশ করেছেন। তাঁর লেখায় আছে — "শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন প্রাণ মাতানো সহজ সুরের গান, শুনলেন গগন হরকরার সেই বিখ্যাত গান — আমি কোথায় পাব তারে, অমনি সেই সুরে সৃষ্টি করলেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। আরো অনেক গান তৈরি হল বাউলের সুরে, বুঝলেন এই সুরেই তিনি পৌঁছুতে পারবেন দেশের লোকের মনে।"[২৩] বস্তুত বিভিন্ন মনীষীর হৃদয় আকৃষ্ট করেছে যে বাউল সুরের মধুর গান তথা ভাবসঙ্গীত, খোদা বকশ শাহ সেই ভাবসঙ্গীতেরই স্রষ্টা, ভাবময় রূপকার, সুরকার ও শিল্পী। তাঁর রচনাবলীর সাহিত্যমূল্য তাই অনস্বীকার্য।

খোদা বকশ শাহের রচনাবলীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর অসাধারণ ভাববিকাশ। সাহিত্যমূল্য বিচারে দুটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমত কবি-হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও মননশীলতা, দ্বিতীয়ত হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ বা ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করার ক্ষমতা। খোদা বকশ শাহের মধ্যে অনুভূতি ছিল অত্যন্ত গভীর। হৃদয়ানুভূতি ও কবির পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হয়ে খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত সার্থক সাহিত্য-মর্যাদা লাভ করেছে। দেহ, মন, আত্মা ইত্যাদি আন্তঃপ্রকৃতি মেঘ, বৃষ্টি, কৃষি, তিথি-

নক্ষত্র, সমাজ-মানস ইত্যাদি বহিঃপ্রকৃতির সাথে একাত্মভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বকশ-সঙ্গীতে নতুন আবেদন সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির নিয়ম মতো মানবদেহেও বিভিন্ন তিথির যোগ হয়েছে। কৃষিজীবী আদিম সমাজের ট্যাবু, টোটেম বিশ্বাস, মৈথুনতত্ত্ব ইত্যাদির প্রভাবও খোদা বকশ শাহের রচনায় যথেষ্ট। সবটা মিলে বকশ-রচনাবলী উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আলমগীর জলিল (সম্পাদিত), লোকসাহিত্য, চতুর্দশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯১।

২. প্রাগুক্ত।

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সংসদ বাংলা অভিধান, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬১১।

৪. আলমগীর জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৫. খোন্দকার রফিউদ্দীন, মহত পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

৬. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের গান, সংশোধিত সংস্করণ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৩।

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১৪৫।

৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৯. খোদা বকশ শাহ, সঙ্গীত অংশ দ্রষ্টব্য, গান নং ১৯।

১০. প্রাগুক্ত, গান নং ঐ।

১১. সুকুমার সেন, বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

১২. হিমাংশু চৌধুরী, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা, প্রথম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬।

১৩. খোদা বকশ শাহ, সঙ্গীতাংশ, গান নং ৩৪।

১৪. প্রাগুক্ত, গান নং ৩২।

১৫. প্রাগুক্ত, গান নং ১২।

১৬. প্রাগুক্ত, গান নং ঐ।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯০।

১৮. মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩২, গান নং ৯৫।

১৯. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাবসঙ্গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, গান নং ৭৬।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রণীত হারামণির ভূমিকা, পৃ. ১।

২১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তানের লোককৃষ্টি, প্রাগুক্ত।

২২. মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তানের লোককৃষ্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২৩. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

কবি সম্পর্কে সুধীজনের সাক্ষাৎকার

শামসুজ্জামান খান

[বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ শামসুজ্জামান খান মরমী কবি খোদা বকশ শাহকে নানাভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। তিনি যখন বাংলা একাডেমীর গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগের পরিচালক ছিলেন, তখন বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় তিনিই খোদা বকশ শাহকে নিয়ে আসেন। ঐ কর্মশালায় সেদিন ফিনল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ফোকলোর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লরি হংকো, আমেরিকার স্বনামধন্য ফোকলোর বিশারদ প্রফেসর হেনরি গ্লাসি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বহু প্রশিক্ষণার্থীও ঐ কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন। শামসুজ্জামন খানের প্রেরণা ও সহযোগিতায় খোদা বকশ শাহ উক্ত কর্মশালায় লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং লালন-সঙ্গীতের গায়নরীতি, শিল্পতত্ত্ব ও সঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। অতঃপর বাংলা একাডেমীর ভিডিও কক্ষে খোদা বকশের কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত রেকর্ড করা হয়। খোদা বকশকে বাংলা একাডেমীর 'ফেলো' পদ প্রদানেও শামসুজ্জামান খান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। খোদা বকশ শাহের গাওয়া লালন-সঙ্গীত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব শামসুজ্জামান খানেরই প্রাপ্য। এই মহানুভব ফোকলোর বিশেষজ্ঞ এবং খোদা বকশ শাহের কৃতিত্ব-বিকাশের সহায়তাদানকারী শামসুজ্জামান খানের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় ১৫. ৩. ৯৭ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কার্যালয়ে। নিম্নে তাঁর সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো]

প্রশ্ন : খোদা বকশের সাথে কবে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়? প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে কেমন মনে হয়েছিল?

উত্তর : খোদা বকশের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৮০ সালে ছেঁউড়িয়ায় (কুষ্টিয়ায়) অনুষ্ঠিত লালন-স্মরণোৎসবে। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে একজন নির্মল সাধক-পুরুষ বলে আমার মনে হয়েছিল। দেখা হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, তাতে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর মধুর ব্যবহার, সুমিষ্ট বাচনভঙ্গি যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করতো।

প্রশ্ন : তাঁর কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত আপনার কেমন লাগতো? লালন-মাজার কেন্দ্রিক অন্যান্য সাধক-শিল্পীদের গায়নভঙ্গি থেকে তাঁর গায়নভঙ্গিতে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতেন কি?

উত্তর : খোদা বকশ শাহের লালন-সঙ্গীত পরিবেশন -ক্ষমতা ছিল অসাধরণ। একতারা-বায়া বাজিয়ে তিনি লালন-সঙ্গীতের এক অনিবচনীয় ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করতেন, যা কেবল অনুভবের বিষয়, ভাষায় কি তা বুঝানো যায়? ছেঁউড়িয়ার আখড়া-কেন্দ্রিক আর কোনো সাধকশিল্পীর গায়ন-ভঙ্গিতে ঐ রকম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হতে

দেখি নি। লালন-সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য বাউল গানও তিনি খুব দরদ দিয়ে গাইতেন। তাঁর গানের ধারাই হয়েছে এখনকার লালন-সঙ্গীতের ধারা। এটাই আমার বিশ্বাস। কারণ আধুনিক লালন-সঙ্গীতের প্রাণপুরুষ মকছেদ আলী সাঁই খোদা বকশ শাহ থেকে বহু লালন-সঙ্গীত ও এগুলোর সুর গ্রহণ করেন। পরে ঐ সব লালন-সঙ্গীত তিনি (একটু সুরের সংস্কার করে) তাঁরই ছাত্রী ফরিদা পারভিনের কণ্ঠে তুলে দেন। আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পীরা যে ধারা লাভ করেছেন, সে ধারা মূলত ফরিদা পারভিনের গায়নরীতির ধারা। এর মূল কিন্তু খোদা বকশ শাহ — এ কথাই আমার মনে হয়।

প্রশ্ন : ফোকলোরে 'এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার' বা 'সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, সেই কথাটির কতদূর সার্থকতা আপনি খোদা বকশ শাহের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : যাঁরা ফোকলোরকে ধরে রেখেছেন এবং সেই ফোকলোর যেমন — লোকসঙ্গীত, লোককাহিনী ইত্যাদি আসরে উপস্থাপন করেন, তাঁরাই এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার বা সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, যাঁরা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গীত-ঐতিহ্য গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রচার করেন (এর মধ্যে অনেক গুহ্যতত্ত্ব থাকে) তাঁরাই এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খোদা বকশ শাহ, বেহাল শাহ, মহিন শাহ, কানাই শাহ, মহেন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ ছিলেন বাউল সঙ্গীতের-ঐতিহ্যবাহক বা এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার। এখনো এঁদের প্রতিনিধি আছে, যেমন — খোরশেদ শাহ, লাইলা বেগম, করিম শাহ, আবদুল লতিফ বিশ্বাস (খোদা বকশ শাহের পুত্র) ইত্যাদি। আর যাঁরা ফোকলোর চর্চা করেন, ফোকলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, ফোকলোরের তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা প্যাসিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার বা নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ডক্টর আনোয়ারুল করীম, ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ প্যাসিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার বা নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক। খোদা বকশ শাহ এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার হিসেবে খুবই সার্থক ছিলেন। তিনি লালন-সঙ্গীত এবং অন্যান্য বাউল গান গাইতেন, এর ব্যাখ্যা ও তত্ত্ববস্তু জানতেন, নিজস্ব শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। সেদিক থেকে তাঁকে বাউলতত্ত্ব বা ফকিরিতত্ত্ব এর যথার্থ ঐতিহ্যবাহক বলা যায়। ফোকলোরের সঙ্গীত-প্রকরণের তিনি প্রকৃত এ্যাকটিভ ট্র্যাডিশন বিয়ারার ছিলেন।

প্রশ্ন : আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পী (যেমন মকছেদ আলী সাঁই, ফরিদা পারভিন ইত্যাদি) এবং খোদা বকশ শাহের লালন-সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে কি কোনো সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য আপনি লক্ষ্য করতেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পী এবং খোদা বকশ শাহ এ উভয় শ্রেণীর শিল্পীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক শিল্পীরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাঁদের গানে তালের যন্ত্র হিসেবে তবলা-বায়া বাজানো হয়। কিন্তু খোদা বকশ শাহ কেবল একতারা বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর গানে তালের যন্ত্র হিসেবে কেবল ছোট আকারের বায়া (ডুগি) বাজানো হতো। গায়নভঙ্গি উভয় শিল্পীর আলাদা। তবে সাদৃশ্য এটুকুই যে, আধুনিক শিল্পীরা লালন-সঙ্গীতের বাণী ও সুর খোদা বকশ শাহ এবং ঐ শ্রেণীর সাধক শিল্পীদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। বাণীর ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। খোদা বকশ শাহের গাওয়া লালন-সঙ্গীত-বাণী সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ কিভাবে তাঁর সঙ্গীত ও মরমীতত্ত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোকলোর গবেষকগণের মানস-জগতে স্থান করে নিয়েছিলেন? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : ফোকলোরের মরমী সঙ্গীতধারা অনুসরণে খোদা বকশ শাহ আন্তর্জাতিক ফোকলোর গবেষকগণের মানস-জগতে স্থান করে নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার প্রখ্যাত ফোকলোর গবেষক ডক্টর ক্যারল সলমন লালন-সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করার সময় বাংলাদেশে আসেন। তিনি লালন-সঙ্গীতে বিধৃত গুহ্য সাধন-প্রণালীর ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন খোদা বকশের কাছে। খোদা বকশের নিকট প্রাপ্ত তত্ত্বকথা লাভের ফলেই ক্যারল সলমন আজ আন্তর্জাতিক লালনতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত। এর মূল কৃতিত্ব খোদা বকশ শাহেরই প্রাপ্য। এ অতি বড় গৌরবের কথা। এ গৌরব সমগ্র বাংলাদেশের গৌরব, বাঙালী জাতির গৌরব। খোদা বকশ শাহ সেই জাতীয় গৌরব সৃষ্টিকারী সাধক ছিলেন। আন্তর্জাতিক ফোকলোর চর্চার বাউল-ঐতিহ্য ধারার অমর শিল্পী খোদা বকশ শাহ।

প্রশ্ন : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ শাহ কেমন ছিলেন? এ বিষয়ে সামান্য মন্তব্য করুন।

উত্তর : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ শাহ ছিলেন অত্যন্ত খাঁটি। মিথ্যা, ধোকাবাজী, প্রত্যারণা, ছলচাতুরী ইত্যাদি তাঁর মধ্যে ছিল না। অসাধরাণ গুরুভক্তি এবং মানবতাবোধে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। ভক্তিমূলক মরমী সঙ্গীত তিনি খুব ভালবাসতেন। সঙ্গীতবিরোধী লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও তিনি সঙ্গীত পরিত্যাগ করেন নি। অন্তরের গভীর বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলে গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুধীন দাশ

[প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদ সুধীন দাশ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। খোদা বকশ শাহ যখন লালন-সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে শিল্পকলা একাডেমীতে যোগদান করেন, তখন থেকেই খোদা বকশ শাহের সাথে সুধীন দাশের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। খোদা বকশ শাহের গভীর তত্ত্বজ্ঞান এবং লালন-সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ নৈপুন্য সুধীন দাশের হৃদয়কে আলোড়িত করে। সুধীন দাশ লালন-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং তাত্ত্বিক ভাবধারা অনুধাবনে সচেষ্ট হন। এক সময় তিনি খোদা বকশের কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত টেপ-রেকর্ডারে ধারণ করতে শুরু করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি লালন-সঙ্গীত সুধীন দাশের টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ডকৃত হয়। এই পঞ্চাশটি লালন-সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন সুধীন দাশ। সেগুলোর মধ্য থেকে পঁচিশটি লালন-সঙ্গীতের একটি স্বরলিপি -গ্রন্থ ১৯৮৬ সালে লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ থকে প্রকাশিত হয়। লালন-সঙ্গীত সংরক্ষণে সুধীন দাশের এ অবদান বিশেষ স্মরণীয়। লালন-সঙ্গীত অনুরাগী এবং খোদা বকশ শাহের প্রিয়ভাজন সুধীন দাশের সাথে ১৫. ৩. ৯৭ তারিখে আমি একটি সাক্ষাৎকারে মিলিতই হই। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহকে আপনি কবে প্রথম দেখেন? প্রথম দর্শনে তাঁকে কেমন মনে হয়ছিল?

উত্তর : ১৯৮৩ সালের ৯ জুন খোদা বকশ শাহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে লালন-সঙ্গীত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ঐ দিন তাঁকে আমি প্রথম দেখি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। প্রথম দর্শনে এবং আলাপে তাঁকে মহর্ষি -ব্যক্তিত্ব বলে আমার মনে হয়েছিল। এক পবিত্র অধ্যাত্ম ভাবে তিনি আমাকে সেদিন অভিভূত করেছিলেন। অতি অল্প সময়ে আমাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : তাঁর কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত শুনে আপনার কেমন লেগেছিল? এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করুন।

উত্তর : একতারার রিনি-ঝিনি আওয়াজ এবং বায়ার (ডুগির) ওস্তাদী বোলবাণী আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি সম্মোহিত হয়েছিলাম। গ্রামের একজন সাধক-ফকিরের গান এতো ওস্তাদী কায়দায় গাওয়া যায়, আগে আমার তা জানা ছিল না। অন্তরা-শেষ করে মুখ গেয়ে তেহাই দেওয়ার অপূর্ব ভঙ্গি, অন্তরার মাঝেও তেহাই দেওয়ার কৌশল এতই বিস্ময়কর ছিল, যা আমি ভাবতেই পারি না।

প্রশ্ন : আধুনিক শিল্পী যাঁরা লালন-সঙ্গীত গাইছেন, তাঁরা কি লালন-সঙ্গীতের সুরের বিকৃতি ঘটিয়েছেন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সত্যি কথা বলতে কি আধুনিক শিল্পীরা লালন-সঙ্গীত যে ভাবে গাইছেন, তা খোদা বকশ শাহ প্রমুখ শিল্পীর গাওয়া লালন-সংগীতের বিবর্তিত রূপ। প্রকৃত টেকনিক (ভঙ্গি) এতে রক্ষিত হয় নি। ফোক-সং এর ক্ষেত্রে এ রকম হয়। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে গিয়ে সুর বিকৃতি ঘটে। লালন-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। খোদা বকশ শাহকে ঠিক অনুসরণ করেছেন, এমন আধুনিক শিল্পী নেই বললেই চলে। খোদা বকশ শাহ এবং ঐ শ্রেণীর একতারাধারী শিল্পী আর হারমোনিয়াম-ধারী শিল্পীর লালন-সঙ্গীতে পার্থক্য থাকবেই।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের কণ্ঠে ধারণকৃত লালন-সঙ্গীত থেকে আপনি যে স্বরলিপি করেছেন তার সাফল্য-অসাফল্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ গেয়েছেন, আমি টেপে ধারণ করেছি। তা থেকে আমি স্বরলিপি প্রস্তুত করেছি। খোদা বকশের সুর হুবহু স্বরলিপিতে ধরার চেষ্টা আছে। আমি মনে করি, আমার কাজে আমি সফল হয়েছি। দোষগুণ বিচারের ভার স্বরলিপি-বিশেষজ্ঞদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর : এই পদকপ্রাপ্তি খোদা বকশকে অনেক উচ্চে নিয়ে গেছে, লালন-সঙ্গীতেরও মূল্যায়ন হয়েছে। তবে খোদা বকশ জীবিত থাকতে তাঁকে এ পদক দিলে আরো ভাল হতো। মৃত অপেক্ষা জীবিত শিল্পী, জীবিত সাধকের মূল্যায়ন অতি জরুরী বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ কেমন ছিলেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে অতি সম্মানে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন। আমি তাকে 'সাঁইজী' বলে ডাকতাম। আদর্শ সাধু-পুরুষ বলতে যা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাই। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ

[১০.৯.৯৫ তারিখে ছেঁউড়িয়ার আখড়ার নিকটে অবস্থিত ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহর আখড়ায় উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে উক্ত সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : মরমী সঙ্গীত শিল্পী খোদা বকশ শাহের সাথে কবে প্রথম আপনার সাক্ষাৎ হয়?

উত্তর : ১৯৪৯ সালে বাৎসরিক লালন-স্মরণোৎসবে (দোলপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত সাধুসেবায়) লালন মাজার শরীফে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বেহাল শাহ, খোরশেদ বিশ্বাস, কানাই শাহ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নিমাই শাহ, ঝড়ু শাহ, ফকির চাঁদ, করিম শাহ, খোরশেদ শাহ, লাইলা বেগম, খোদা বকশ শাহ প্রমুখ ভাবসঙ্গীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে খোদা বকশ শাহের বয়স সব চাইতে কম।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ শাহকে আপনার কেমন লাগতো?

উত্তর : লালন-সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ শাহকে আমার খুব ভাল লাগতো। আমার যতদূর মনে পড়ে ছেঁউড়িয়ার ইসমাইল শাহ (বড় ফকির), গোলাম ইয়াছিন শাহ এবং আলমডাঙ্গা থানার কররাজাঁহাপুরের খোদা বকশ শাহ — এই তিনজনের কণ্ঠে লালনের আদি সুর ছিল। সেই সুর বর্তমানে আছে কোকিল শাহের শিষ্য ফকির আব্দুল গনি শাহের কণ্ঠে। বাংলা একাডেমীর ভিডিও সংরক্ষণ কক্ষে এই গনি শাহের গাওয়া চারখানা লালন-সঙ্গীত রেকর্ড করা আছে।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ গান রচনা করতেন — এ সম্পর্কে কিছু জানেন কি?

উত্তর : খোদা বকশ শাহ গান রচনা করতেন তা আমি জানি। তাঁর নিকট থেকেই এ তথ্য পেয়েছি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের রচিত গান আপনি কি তাঁর নিজের কণ্ঠে শুনেছেন?

উত্তর : না, তাঁর গান তাঁর কণ্ঠে শোনার সুযোগ আমার হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র আবদুল লতিফের কাছে বকশ-সঙ্গীতের খাতা দেখেছি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন?

উত্তর : মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুব উঁচু পর্যায়ের, তাঁর মধ্যে এমন একটি বিনয়ের ভাব ছিল, যার তুলনা মেলে না। তাঁর মানবতাবোধ ছিল অসাধারণ। পরকেও তিনি হাসিমুখে আপন করে নিতেন। কোনো মিথ্যা বা ছল-চাতুরি তাঁর মধ্যে ছিল না। লালন শাহী ফকির সমাজে খোদা বকশ শাহের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষের আজ বড়ই অভাব।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীত বা অন্য কোনো মহতের গান পরিবেশনে খোদা বকশ শাহের কি বৈশিষ্ট্য আপনি লক্ষ্য করতেন?

উত্তর : তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ছেঁউড়িয়ার লালন সাঁইজীর ধামে তিনি কেবল লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সেখানে অন্য কোনো মহতের গান তিনি গাইতেন না। তাঁর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুরেলা, শব্দ-উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট, তালমাত্রা-জ্ঞান ছিল প্রখর। ফলে লালন-সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠ থেকে মধুর হয়ে ঝরে পড়তো। খোদা বকশের তুল্য গায়ক এখন আর নেই।

প্রশ্ন : খোদা বকশ আসরে এসে প্রথমে কোন্ লালন-সঙ্গীতটি পরিবেশন করতেন, বলতে পারেন কি?

উত্তর : আসরে এসে তিনি যে লালন-সঙ্গীতটি পরিবেশন করতেন তার কয়েক ছত্র এরূপ :

এসো দয়াল, পার কর এই ভবের ঘাটে
ভবনদীর তুফান দেখে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে॥

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?

উত্তর : তাঁর চাল-চলন ছিল অতি পরিচ্ছন্ন এবং আচার-ব্যবহার ছিল অতি মধুর। আমাকে তিনি 'বড় মিয়া' বলে ডাকাতেন, দেখা হলে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি যেন আমার অতি আপনজন ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি তাঁকে সর্বশেষ কবে দেখেছেন, মনে পড়ে কি?

উত্তর : খোদা বকশ শাহকে আমি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর কররাজাঁহাপুরের আখড়া-বাড়িতে। তিনি আমাকে আদর করলেন। তিনি তখন অসুস্থ, তথাপি তাঁর মুখে লালন-সঙ্গীতের কথাই শুনলাম। কুষ্টিয়ায় ফিরে এসে পাঁচ দিন পর তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বড় কষ্ট পেলাম। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন— এই কামনা করি।

ডক্টর মোমেন চৌধুরী

[ডক্টর মোমেন চৌধুরী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং কৃতি গবেষক। দীর্ঘদিন তিনি বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপবিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ফোকলোর সংক্রান্ত কাজকর্মে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল তিনি সফর করেছেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করলেও ফোকলোর গবেষণা এবং লালন-দর্শন বিষয়ক চিন্তাভাবনা তাঁর মধ্যে সক্রিয়। ১৫.১.৯৫ তারিখে আমি তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে খোদা বকশ শাহ সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কোন্ সালের কোন্ তারিখে?

উত্তর : প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল স্মরণ করতে পারছি না। তবে মনে আছে, বাংলা একাডেমীতে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তিনি এসেছিলেন সত্তর দশকের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১৯৭৪ সালে। তিনি, মহেন্দ্র শাহ, কানাই শাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। কথা হয় নি, চোখের পরিচয়টা কেবল হয়েছিল। এরপর তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীতের শিক্ষক হয়ে আসেন। আমি তখন বাংলা একাডেমীর ফোকলোর বিভাগের দায়িত্বে। নাম-পরিচয় ও দেখা আগে থেকেই ছিল। বাংলা একাডেমীতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো লালন-সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে। সেগুলো রেকর্ড করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আমার অনুজ প্রতীম সহকর্মী মফিজুল ইসলামের উৎসাহ ও উদ্যোগে এবং পরিচালক শামসুজ্জামান খানের সম্মতিতে তাঁর কিছু গান রেকর্ড করা হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তিনি আমাকে বলেই বসলেন, আপনাকে আমি চিনি, বলে দু'হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালেন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত, গায়কী, উপস্থাপন কেমন ছিল ? সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহের কণ্ঠে গান শুনেছি। আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই। শ্রোতার কান দিয়ে যতটুকু শোনা। তবে তিনি ছিলেন লালন শাহের গানের অন্যতম ভাণ্ডারী। আমরা যখন তাঁর কণ্ঠে লালন গীতি রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিই, তখন তিনি বিশেষ সুস্থ ছিলেন না। হৃদরোগে ভুগছিলেন। আমাদের ইচ্ছে ছিল, যতগুলো লালনগীতি তাঁর কণ্ঠে পাওয়া যায়, রেকর্ড করে রাখা। সেজন্য সময়েরও প্রয়োজন ছিল। মনে পড়ে একদিন বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষে তাঁর গান রেকর্ড করা হয়েছিল। লালন-ঘরানার এই শিল্পীর গায়কী ভঙ্গি ছিল আকর্ষণীয়। যখন গাইতেন, যেন গানের ভেতরে আত্মস্থ হয়ে যেতেন।

প্রশ্ন : বাউলতত্ত্ব ও সুফিতত্ত্ব এর কোন্‌টির প্রভাব তাঁর মধ্যে বেশি ছিল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ আনুষ্ঠানিকতার ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় নি। ফলে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানা সম্ভব হয় নি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন? তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিল?

উত্তর : বাউল ফকিররা বিনয়ী হয়। এই গুণটি তাঁর মধ্যে ছিল। পরিষ্কার সাদা খেরকা পরিধান করতেন। শ্মশ্রুবিহীন ছিলেন। তাঁকে দেখলেই শুদ্ধ চিত্তের মানুষ বলে মনে হতো। আগেই বলেছি, দেখা হলেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন।

প্রশ্ন : লালন শাহের উত্তরাধিকারী হিসেবে খোদা বকশ শাহ কতদূর সার্থক হয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : লালন অনুসারীদের ভেতরে অনেককে একনিষ্ঠতা এবং সম্প্রদায়গত সংলগ্নতার কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। লালন শাহের উত্তরাধিকারী খোদা বকশ শাহ ১৯৪৭ সালের পরে লালন অনুসারী হওয়ার অপরাধে মুণ্ডিত-মস্তকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এর পরেও তিনি তাঁর একতারা ছুঁড়ে ফেলে দেন নি। চরম নির্যাতন স্বীকার করেও আপন পথ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান নি। লালন শাহের কয়েক শ' গানের ভাণ্ডারী ছিলেন বলে শোনা যায়। আজকাল এতো গান নিজ আয়ত্তে রাখার কথা প্রায় শোনা যায় না। লালন শাহের গান প্রচারে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। অসুস্থ অবস্থায় থেকেও তিনি লালনগীতি গাওয়ার আমন্ত্রণ পেলে কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে গানের সুরেও পরিবর্তনের হাওয়া বয়। লালনের গানের সুরে প্রথম যিনি গায়কী ঢঙে পরিবর্তন আনেন, তিনি অমূল্য সাঁই। বলা যায়, খোদা বকশ শাহের গায়কী ঢংয়ে তাঁর প্রভাব ছিল। মকছেদ আলী শাহ জনপ্রিয়তার স্বার্থে লালনগীতির সুরে আরো কিছু পরিবর্তন আনেন। খোদা বকশ শাহ এ জাতীয় কোনো ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। লালনগীতির একজন ভাণ্ডারী ও পরিবেশক হিসেবে অবশ্যই তিনি লালন শাহের সার্থক উত্তরাধিকারী।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীতের সুর তিনি কতটা আয়ত্ত করেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : লালন সঙ্গীতের সুর বলতে মৌলিক সুর বুঝাতে চেয়েছেন তো? আমি আগেই বলেছি, আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই, সঙ্গীত বিশারদও নই। লালন সঙ্গীতের মৌলিক সুর সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। লালন অনুসারীদের মুখে ঝাল খাওয়া ছাড়া আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ফাঁকা! সুতরাং এ সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য না করাই ভাল।

খোন্দকার খায়রুল আনাম

[খোন্দকার খায়রুল আনাম পাঞ্জু শাহ সেবা-সংস্কৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর পিতার নাম খোন্দকার রইচউদ্দিন, মাতার নাম খাতেমন নেসা এবং পিতামহ মরমী কবি পাঞ্জু শাহ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন যন্ত্রশিল্পী। তবলাবাদক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি উত্তর গোরানে নিজের বাড়িতে বসবাস করছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৩ বছর। মরমী কণ্ঠশিল্পী খোদা বকশ শাহ কিছুদিন তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেন। নিম্নে খোন্দকার খায়রুল আনামের সাক্ষাৎকার উপস্থাপিত হলো। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬.১০.৯৫।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ আপনার বাড়িতে কখন কতদিন অবস্থান করেন?

উত্তর : খোদা বকশ শাহ যখন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত-শিক্ষক পদে চাকুরী নিয়ে ঢাকায় আসেন, তখন তিনি আমার বাড়িতে ছিলেন। এক বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি কণ্ঠশিল্পী চন্দনা মজুমদারের পিতা নির্মল মজুমদারের রামপুরাস্থ বাসায় চলে যান।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ ভাবসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কেমন ছিলেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তিনি লালন-সঙ্গীত, পাঞ্জু-সঙ্গীত, দুদ্দু-সঙ্গীত অত্যন্ত আদায় করে গাইতে পারতেন। তাঁর তুল্য গায়ক খুব কমই ছিল। ভাবগানের জগতে তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সমসাময়িক কিছু শিল্পীর নাম বলুন। এঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত, তাঁদের নামও উল্লেখ করুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহের সমসাময়িক শিল্পী ছিলেন গাহের শাহ, নিমাই শাহ, খোরশেদ শাহ, রসিক শাহ, পাংশার গহোর শাহ, বশীর শাহ, বেহাল শাহ, লাইলা বেগম, দিদার শাহ, সিরাজ শাহ, রহিম শাহ, ঝড়ু শাহ, মকছেদ আলী সাঁই প্রমুখ। এদের মধ্যে খোরশোদ শাহ, লাইলী বেগম, সিরাজ শাহ, ঝড়ু শাহ, দিদার শাহ জীবিত আছেন। খোদা বকশ শাহ এঁদের সকলের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিলেন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ ঢাকায় এসে যেভাবে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, সেই ভাব কি গ্রাম্য ভাব থেকে আলাদা? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : গ্রামে যে লালন-সঙ্গীত বা অন্য মহতের গান তিনি পরিবেশ করতেন, তাতে যে ভাব ফুটে উঠতো, ঢাকায় পরিবেশিত গানে সে ভাব পূর্ণ মাত্রায় থাকতো না। কারণ গ্রামে শুধু একতারা-বায়া নিয়ে তিনি গাইতেন, ঢাকায় তাঁর গানের সাথে থাকতো দোতারা, বাঁশি ইত্যাদি। ফলে গানের ভাবেরও কিছু পরিবর্তন হতো বলে আমার মনে হয়েছে।

প্রশ্ন : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ শাহ কেমন ছিলেন? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ অতি উঁচু পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সরল, সহজ এবং সৎ এই মানুষটিকে দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করতো। মিথ্যা, ছল-চাতুরি তাঁর মধ্যে ছিল না।

প্রশ্ন : পাঞ্জু-পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীনের সঙ্গে খোদা বকশ শাহের আন্তরিকতা ছিল। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : খোন্দকার রফিউদ্দীন ছিলেন আমার বড় চাচা। তিনি লালন-সঙ্গীত এবং অন্যান্য মহতের গান সংগ্রহ করতেন। এ বিষয়ে খোদা বকশ তাঁকে অনেক সহযোগিতা দিয়েছিলেন। বড় বড় সাধুসেবায় (ফকিরি মজলিশে) খোদা বকশকে তিনি দাওয়াৎ দিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা ছিল। আমাদের হরিশপুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সকল মাহ্‌ফিলে খোদা বকশ শাহ থাকতেন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ গান রচনা করতেন। এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?

উত্তর : খোদা বকশ শাহ গান রচনা করতেন, তা আমি জানি। আমার বাসায় থাকাকালে তিনি অনেক গান রচনা করেন। তিনি গান লিখে আমাকে গেয়ে শুনাতেন। সে সব গানের দু-এক লাইন এখনো আমার মনে আছে।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের দাদাগুরু হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ। উভয় খোদা বকশই সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁদের উভয়ের রচনা কি মিশ্রিত হয়ে গেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি যতদূর জানি হরিয়ারঘাটের খোদা বকশের রচিত গানের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য খোদা বকশের রচিত গানের সংখ্যা অনেক। আমার বাসায় থাকাকালেই তিনি অন্তত দুশো গান রচনা করেন। উভয় খোদা বকশের গানের মিশ্রণ হয়েছে — এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি।

খোরশেদ আলী শাহ

[প্রবীণ লালন-সঙ্গীত শিল্পী খোরশেদ আলী শাহ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডুর (গ্রাম—মাদারতলা) বাসিন্দা। খোদা বকশ শাহের গুরু শুকচাঁদ শাহের সাথে খোরশেদ শাহ বহু সাধুসেবায় একত্র বৈঠক করেছেন। বহু আসরে একসঙ্গে সঙ্গীতেও অংশ নিয়েছেন। আবার খোদা বকশের সাথেও তাঁর বৈঠক হয়েছে। খুলনা বেতারের নিয়মিত শিল্পী পাঞ্জু-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ খোরশেদ আলী শাহের বাসভবনে ২৫.৯.৯৫ তারিখে উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : প্রথম কখন, কবে, কোথায় খোদা বকশ শাহের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়?

উত্তর : আমার বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, তখন চট্কাবেড়ে (থানা : হরিণাকুণ্ডু, জেলা : ঝিনাইদহ) গ্রামে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঐ দিন ঐ গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়িতে সাধুসেবা হচ্ছিল। খোদা বকশ এসেছিলেন ঐ সাধুসেবায় ভাবগান (ফকরে গান) শোনার জন্য। ঐ মজলিশে শুকচাঁদ শাহ, বেহাল শাহ, মহরালী শাহ, রসিক শাহ, বশীর শাহ, গহোর শাহ প্রমুখ গায়ক ফকির উপস্থিত ছিলেন। আমি তখন সবেমাত্র ভাবগানের গায়ক হচ্ছি। লাইলাও আমার সঙ্গে ছিল। বকশ তখন যাত্রাদলে গান করতেন। আমাদের কাছে এসে বকশ বসলেন। কথায় কথায় বললেন যে, তিনি ভাবগান শিখতে চান। আমি তাঁকে বললাম, ভাবগান শিখতে হলে ফকির হতে হয়, ফকিরের শিষ্য হতে হয়। বকশ, দেখলাম, তাতেই রাজী। ঐ বৈঠকের সন তারিখ আমার মনে নেই।

প্রশ্ন : খোদা বকশ পরবর্তীকালে কিভাবে ভাবগানের গায়ক হলেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : পরবর্তীকালে খোদা বকশ শুকচাঁদ শাহের বায়াত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন। শুকচাঁদ শাহের কাছে খোদা বকশ ভাবগান শেখেন। পরে অমূল্য শাহের সঙ্গীত-শিষ্য হয়ে যান। অমূল্য তাকে গান ও বাজনা শেখান। খোদা বকশের কণ্ঠ এবং গান গাইবার ভঙ্গি ভাল ছিল। এজন্যে অল্প দিনে তিনি খুব নামকরা গায়ক হন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ কি শুধু লালন-সঙ্গীতই গাইতেন, না অন্যান্য মহতের গানও গাইতেন? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ লালন-সঙ্গীতই বেশি গাইতেন। তবে অন্যান্য মহতের গানও তাঁর জানা ছিল। লালশশী, যাদুবিন্দু; হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, রামলাল গোস্বামী, রাধার শ্যাম, মথুর গোঁসাই, গোবীন গোঁসাই, রাজকৃষ্ণ খ্যাপা, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, হাতেম শাহ, অমূল্য শাহ, জহরদ্দি শাহ, পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস প্রভৃতি মহতের গান তিনি জানতেন। সব মিলে চল্লিশজন মহতের গান তিনি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন : ভাবগান তিনি যে গাইতেন, তাঁর গাওয়া আর অন্যের গাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ছিল? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : ভাবগান হচ্ছে শব্দগান। গানের বাণী সুরের মাধ্যমে শ্রোতার কানে ভালভাবে পৌছিয়ে দেওয়াই ভাবগানের গায়কের বড় কৃতিত্ব। খোদা বকশ এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি ভাবগানের প্রতিটি কথাকে খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেন। মিষ্ট সুরে তালতাত্রার মাধ্যমে অপূর্ব ভাবের সাথে ভাবগানের শব্দগুলোকে শ্রোতার কানে তিনি পৌঁছে দিতেন। তাঁর একতারা ও বায়া বাজানোর একটা কায়দাই ছিল আলাদা। গানের সাথে ঐ রকম একতারা-বায়া বাজানো একমাত্র বেহাল শাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে আমি দেখি নি। ঐ সময়ে আর কোনো গায়ক বা গায়িকা খোদা বকশের মতো অত ভালো গাইতে পারতো না।

প্রশ্ন : খোদা বকশ বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন বলে আমরা খবর পাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনি কি জানেন?

উত্তর : খোদা বকশ কিছু গান রচনা করেছেন বলে আমিও শুনেছি। কিন্তু সে গানগুলো আমি দেখি নি বা তাঁর কণ্ঠে শুনি নি। তিনি যখন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে লালন-সঙ্গীত শিক্ষক পদে চাকুরী করতেন, বোধ করি, তাঁর বেশিরভাগ গানই ঐ সময়ে রচিত। তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাসের নিকট তাঁর গানের খাতা আছে।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের গানগুলো একত্রিত করে একটি বই তৈরি করলে কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : খোদা বকশের গানগুলো নিয়ে বই তৈরি করলে খুব ভালো কাজ হবে বলে আমি মনে করি। বইয়ের মধ্যে গানগুলো ধরতে পারলে গায়ক-গায়িকারা ঐ সব গান শিখে গাইতে পারবেন। গানগুলোর মধ্যদিয়ে খোদা বকশ শাহ বেঁচে থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন : হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ শুনেছি অনেক ভাবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। কররাজাঁহাপুরের এই খোদা বকশ কি ঐ খোদা বকশের ভণিতাযুক্ত গানগুলো নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

উত্তর : আমি যতদূর জানি, হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ খুব বেশি সংখ্যক গান রচনা করেন নি। কররাজাঁহাপুরের এই খোদা বকশের কাছে হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহের রচিত আট-দশটি গান ছিল। আমাদের এই খোদা বকশ যখন গীতিকার হন নি, তখন আমি তাঁর কণ্ঠে ঐ গানগুলো শুনেছি। খোদা বকশের ছেলে আবদুল লতিফের কাছে তাঁর পিতার রচিত চার-পাঁচ শো গান আছে। আমার বিশ্বাস এ সব গানই খোদা বকশের রচিত, হরিয়ারঘাটের খোদা বকশের নয়। খোদা বকশ খুব বিনয়ী এবং ধর্মভীরু সাধক ছিলেন। তিনি তাঁর দাদাগুরু হরিয়ারঘাটের খোদা বকশের গানকে নিজের গান বলে চালিয়ে দিবেন — এটা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : খোদা বকশের চাল-চলন, আচার-আচরণ এবং স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন।

উত্তর : খোদা বকশের চাল-চলন ছিল খুবই সুন্দর। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের এত সম্মান করতেন যে, কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কোনো দিন তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে জানি নে। তিনি তাঁর সুমধুর আচার-ব্যবহারে সকল শ্রেণীর মানুষকে খুশি করতে পারতেন। নির্মল চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটিকে আমরা ভুলতে পারি নে। লালন-সঙ্গীত জগতে আর একজন খোদা বকশ কবে আবির্ভূত হবেন, জানি নে। দয়াময় তাঁর আত্মার শান্তি দান করুন — এই কামনা করি।

লাইলা বেগম

[লালন-সঙ্গীত জগতে লাইলা বেগমের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। কৈশোরকাল থেকে তিনি একতারা-বায়া বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছেন। প্রবীণ লালন-সঙ্গীত শিল্পী খোরশেদ আলী শাহের স্ত্রী লাইলা বেগম খোদা বকশ শাহের সঙ্গে বহু আসরে লালন-সঙ্গীতে প্রতিযোগিতা করেছেন। কোনো আসরে লাইলা প্রশ্ন করেছেন, খোদা বকশ উত্তর দিয়েছেন। আবার কোনো আসরে খোদা বকশ প্রশ্ন করেছেন, লাইলা তার উত্তর দিয়েছেন। লাইলা বেগম বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী। তিনি ঐ কেন্দ্রে পাঞ্জু-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। আমি ২৫.৯.৯৫ তারিখে তাঁর বাড়িতে (হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ) উপস্থিত হয়ে খোদা বকশ সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন রাখি। তিনি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। নিম্নে ঐ সব প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করা হলো।]

প্রশ্ন : আপনি প্রথম কখন খোদা বকশের সাথে পরিচিত হন?

উত্তর : আমার বয়স তখন বারো কি তেরো হবে। আমি আমার পিতার সঙ্গে বিভিন্ন সাধুসেবায় যেতাম। কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার শংকরদিয়া গ্রামে কামিনী ফকিরানীর আখড়ায় এক সাধুসেবায় খোদা বকশকে দেখি। তখন তিনি সবেমাত্র ভাবগান গাইতে শুরু করেছেন। পূর্ণ গায়ক তিনি তখনো হন নি। তবু তাঁর সুরেলা কণ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করে।

প্রশ্ন : পরবর্তীকালে খোদা বকশ লালন-সঙ্গীতে কতখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন ? এ সম্পর্কে মতামত দিন।

উত্তর : খোদা বকশ পরবর্তীকালে খুব সফল সঙ্গীত শিল্পী হয়েছিলেন। লালন-সঙ্গীত, পাঞ্জু শাহের গান এবং অন্যান্য মহতের গান তিনি খুব ভালভাবে গাইতেন। তাঁর গানে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হতো, যার তুলনা মেলে না। অমূল্য, বেহাল, শুকচাঁদ — এঁদের পরেই ভাবসঙ্গীতে খোদা বকশের স্থান। বর্তমানে তাঁর তুল্য গায়ক আর নেই।

প্রশ্ন : খোদা বকশ খুব ভালো গাইতেন এমন কয়েকটি লালন-সঙ্গীতের প্রথম চরণ বলবেন কি?

উত্তর : খোদা বকশ প্রতিটি লালন-সঙ্গীতই খুব আদায় করে গাইতেন। তার মধ্যে এলাহি আলমিন গো আল্লা, হকনাম বল রসনা, এসো দয়াল পার করো এই ভবের ঘাটে, কে তোমারে এ বেশ-ভূষণ পরাইলো বল শুনি ইত্যাদি গান তাঁর কণ্ঠে খুবই মধুর লাগতো। তাঁর গাইবার ভঙ্গিতে এ গানগুলো অপূর্ব ভাবের জগত সৃষ্টি করতো।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ ব্যক্তিগত জীবনে খুব সুখী ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা নিয়ে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। তাঁর জীবনে দাম্পত্য কলহ ছিল না। তাঁর স্ত্রী খুব শান্ত প্রকৃতির মহিলা। পুত্র-কন্যাও ছিল পিতার অনুগত, ফলে সংসারে কোনো অশান্তি ছিল না।

প্রশ্ন : সমকালীন সমাজে খোদা বকশ শাহ কেমন সমাদর লাভ করেছিলেন — এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : সমকালীন সঙ্গীতপ্রিয় লোকেরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতো। কিন্তু সঙ্গীতবিরোধী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতো। একবার তাঁর উপর খুব অত্যাচার হয়েছিল। বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও তিনি ফকিরি মত আকড়ে ধরে রেখেছিলেন। শত কষ্টের মধ্যেও তিনি সঙ্গীত পরিত্যাগ করেন নি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে চাকুরী করতে গিয়ে তিনি লালন-সঙ্গীতের মৌলিকতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন কি?

উত্তর : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে চাকুরী করতে গিয়ে তিনি তাঁর মৌলিকতা বিসর্জন দেন নি। তিনি মূল সুরেই লালন-সঙ্গীত প্রশিক্ষণ দিতেন। তবে নানা রকম যন্ত্র বাজানোতে তাঁর সঙ্গীতে নতুন ভাব এসেছিল।

ডক্টর তৃপ্তি ব্রহ্ম

[পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লালন-গবেষক ডক্টর তৃপ্তি ব্রহ্ম লালন শাহের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদানের জন্যে ছেঁউড়িয়াস্থ (কুষ্টিয়া) লালন-মাজারে আসেন। তাঁর এ সফরকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় লালন-মাজার প্রাঙ্গণে। ঐ সময় ১৬.১০.৯৫ তারিখে আমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে উক্ত সাক্ষাৎকার উপস্থাপিত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয় কখন, কবে, কি অবস্থায় ?

উত্তর : ১৯৭৭ সালের ১ মাঘ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় শিকারপুর (করিমগঞ্জ) একদিল শাহ পিরের মাজারে অনুষ্ঠিত মেলা-উৎসবে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ঐ সময় খোদা বকশের সাথে ঝড়ু শাহ এবং নদীয়ার পাঁচুউল্লাহ ফকিরও ছিলেন। এরপর লালন-মাজার ছেঁউড়িয়াতে একাধিকবার খোদা বকশের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ১৯৮২ সালে আমি তাঁর গ্রামের বাড়ি কররাজাঁহাপুরে গিয়েও তাঁর সাথে আলাপ করেছি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ লালন-সঙ্গীত কেমন গাইতেন?

উত্তর : খোদা বকশ শাহের গাওয়া লালন-সঙ্গীত ছিল প্রাচীন ঘরানা অনুসারী। তাঁর কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত শুনে আমার মনে হয়েছে যে, ওটাই আসল লালন-সঙ্গীত। তাঁর গাওয়া লালন-সঙ্গীত এবং গোলাম ইয়াছিন শাহ এবং বেহাল শাহ-এর গাওয়া লালন-সঙ্গীতের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কণ্ঠে গীত লালন-সঙ্গীতের মধ্যে এলাহি আলমিন গো আল্লা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ইত্যাদি খুবই ভাল লাগতো। তিনি প্রধানত আল্লাহ প্রশস্তি, নবী প্রশস্তি গান বেশি গাইতেন। আবার জীবনধর্মী গান এবং বৈষ্ণব গীতিও তাঁর কণ্ঠে খুব ভাল আসতো। মোটকথা, খোদা বকশ ছিলেন লালন-সঙ্গীতের শুধু নয়, সমগ্র ভাবসঙ্গীতের অসাধারণ শিল্পী।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের গাওয়া লালন-সঙ্গীতের সুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গাওয়া লালন-সঙ্গীতের সুরে কি কোনো পার্থক্য আছে? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশের গাওয়া লালন-সঙ্গীতের সুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গাওয়া লালন-সঙ্গীতের সুরে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। খোদা বকশের গাওয়া লালন-সঙ্গীতে কাওয়ালী, কীর্তন, রামপ্রসাদী ইত্যাদি সুরের ভাব ও রেশ পাওয়া যেতো, জাওয়ারী চাল্‌ও লক্ষ্য করা যেতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লালন-সঙ্গীতে বাউল সুর শোনা যায়। মোট কথা, বাংলাদেশের লালন-সঙ্গীত ধ্রুপদ-অঙ্গের কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লালন-সঙ্গীত কেবলই বাউল-অঙ্গের। খোদা বকশ শাহ ঐ ধ্রুপদ-অঙ্গের গান গাইতেন।

প্রশ্ন : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ শাহ কেমন ছিলেন? তাঁর বিনয়ী ব্যবহার এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ উদাসীন ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হতো যে, তিনি ঊর্ধ্ব জগতের মানুষ। স্বার্থবুদ্ধিহীন, ভেদবুদ্ধিহীন এবং সমন্বয়ধর্মী এই মানুষটি সত্যিকারভাবে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁর আচার-আচরণ ছিল অতি মধুর, তিনি ছিলেন বিনয়ী এবং অতিথিপরায়ন। আমি একবার তাঁর আখড়াবাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার জন্যে সেবার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাও তাঁরই মতো বড় ভাল মানুষ।

প্রশ্ন : আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পীরা খোদা বকশ শাহের সুর কতটুকু গ্রহণ করেছেন বা আদৌ গ্রহণ করেন নি — এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

উত্তর : আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পীরা খোদা বকশ শাহের সুর খুব বেশি গ্রহণ করতে পারেন নি। আমি যতদূর জানি খোদা বকশ, বেহাল, শুকচাঁদ, নিমাই শাহ প্রমুখের নিকট থেকে গান ও গানের সুর সংগ্রহ করেন মকছেদ আলী সাঁই। মকছেদ আলী সাঁইয়ের নিকট থেকে গান ও সুর শিক্ষা করেন ফরিদা পারভিন। ফরিদা পারভিন তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ ও গায়কী দ্বারা লালন-সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করেন। ফরিদা পারভিনের অনুকরণই চলছে ব্যাপকভাবে। আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পীরা তাই খোদা বকশ অনুসারী হতে পারেন নি, বরং তাঁরা মকছেদ ও মকছেদ-ছাত্রী ফরিদা পারভিনের অনুসারী হয়েছেন। ফলে লালন-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বেড়েছে, কিন্তু লালন-সঙ্গীতের মূলসুর অনেকটা হারিয়ে গেছে।

রাহেলা খাতুন

[রাহেলা খাতুন খোদা বকশ শাহের স্ত্রী। তিনি আজো জীবিত আছেন এবং কররাজাঁহাপুর গ্রামে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। ১৫.৯.৯৫ তারিখে আমি জাঁহাপুরে গিয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশের সাথে আপনার বিয়ে হয় কখন ? সে সময় খোদা বকশ কেমন জীবন যাপন করতেন ?

উত্তর : আমার বয়স যখন এগারো বছর, তখন আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী (খোদা বকশ শাহ) তখন নবীন গায়ক। সবেমাত্র যাত্রাদল ত্যাগ করে ফকিরি গান শিখছেন। সে সময় তিনি বেশ আনন্দময় জীবন যাপন করতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। দিনরাত ফকিরি গান গাইতেন।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী সব সময় গান-বাজনা নিয়ে মত্ত থাকতেন, এতে আপনি কি কখনো কোনো অসুবিধা বা কষ্টবোধ করেছেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। স্বামীর যা ভালো লাগে স্ত্রীর তাতে কষ্টবোধ হবে কেনো? আমার স্বামী সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন, সঙ্গীতকে তিনি ভালবাসতেন, আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। আমিও সঙ্গীতকে ভালবাসতাম।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী শুকচাঁদ শাহের শিষ্য ছিলেন, আপনিও কি শুকচাঁদ শাহের শিষ্য হয়েছিলেন ? এ বিষয়ে কিছু তথ্য দিন।

উত্তর : ফকিরি মতে একটি কথা আছে। তা হচ্ছে এই যে, 'ঘরে বাইরে এক মন, তবে হবে ভজন-সাধন।' স্ত্রী ও স্বামী এক মতের না হলে ভজন-সাধন হয় না। এ কথা আমার স্বামী আমাকে শিখিয়েছিলেন। আমি সেই জন্যেই স্বামীর গুরু শুকচাঁদ শাহের শিষ্য হয়েছিলাম। স্বামী-অনুগত, গুরু-অনুগত হয়ে আমি অনেক শান্তি পেয়েছি। আমার মনে হয় প্রত্যেক মেয়েরই স্বামী-অনুগত হওয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী যে মতের ফকির, সেই মতের ফকিরদেরকে নাড়ার ফকির বলা হয়। সমাজে এ শ্রেণীর ফকিরগণকে অনেক সময় অনেক নিন্দা এবং তাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়। এতে অনেক স্ত্রী তাঁদের নিজ নিজ স্বামীকে ফকিরি মত ছাড়তে বলে, নিন্দার ভয়ে অনেক স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিবেন কি ?

উত্তর : স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম, স্বামীর মতই স্ত্রীর মত। সমাজের কিছু লোক ব্যাঙ্গ করে লালনশাহী মতের ফকিরদের নাড়ার ফকির বলে। আমার স্বামীকেও নাড়ার ফকির বলা হতো। এতে আমি কখনো দুঃখ পাই নি। আমার স্বামীর উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, এতেও আমার মত ও পথ আমি ত্যাগ করি নি। স্বামীকেও ছেড়ে যাই নি। স্বামীর প্রতি সেই সাথে ধর্মের প্রতি আমি অটল বিশ্বাস রেখেছি। সুখে-দুঃখে আমি স্বামীর পাশেই থেকেছি।

প্রশ্ন : শোনা যায়, ফকিরগণ নিজের স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীকে সেবাদাসী হিসেবে রাখে। আপনার স্বামীর কি এ রকম কোনো সেবাদাসী ছিল? এ সম্পর্কে মতামত দিন।

উত্তর : আমার স্বামী লালন শাহের ঘরের ফকির। এ ঘরের ফকিরগণ কোনো সেবাদাসী রাখেন না। বিবাহিত স্ত্রী নিয়েই তাঁরা সাধন-ভজন করেন। আমার স্বামীরও কোনো সেবাদাসী ছিল না। তিনি আমাকে নিয়েই সাধন-ভজন করতেন। তিনি বলতেন — 'ফকিরি মতে নারী নিয়ে যে সাধনা, তা স্ত্রীকে নিয়েই করতে হবে। পরের স্ত্রী স্পর্শ করাও পাপ।' আমার স্বামীকে দেখেছি — পরের মেয়ে, পরের স্ত্রীকে তিনি মা ও বোনের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

প্রশ্ন : আপনার সন্তান কয়জন ? এদের নাম এবং স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মেয়ের নাম মালঞ্চ। আমার ছেলে-মেয়ে খুব শান্ত ও ভদ্র। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে এখন পরের ঘরে। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, ছেলে তার বউ নিয়ে আমার সাথে আছে। ছেলে হয়েছে ওর বাবার মতো গায়ক। ছেলে ও তার বউ আমাকে খুব ভক্তি করে।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন, এতে আপনার কেমন লাগে ?

উত্তর : আমার স্বামী খুব নামকরা গায়ক ছিলেন। কিন্তু বেঁচে থাকতে তিনি কোনো স্বীকৃতি পান নি। মৃত্যুর পরে তিনি একুশে পদক পেয়েছেন। এতে আমি খুবই আনন্দিত। তবে তিনি যদি বেঁচে থেকে এ পদক পেতেন, তা হলে আরো বেশি আনন্দিত হতাম।

আবদুল লতিফ বিশ্বাস

[খোদা বকশ শাহের পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাস একজন মরমী সঙ্গীত শিল্পী। তিনি লালন-সঙ্গীত ও অন্যান্য মরমী সঙ্গীত একতারা-বায়া সহযোগে গেয়ে থাকেন। তাঁর পিতার রচিত গানও তিনি পরিবেশন করেন। ১৫.৯.৯৫ তারিখে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। নিম্নে উক্ত সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : আপনি কার নিকটে গান শিখেছেন ? আপনার সঙ্গীত-শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার পিতার অবদান কতটুকু ?

উত্তর : আমার পিতার কাছে আমি গান শিখেছি, অন্যান্য শিল্পীর কাছেও তালিম নিয়েছি। তবে আমার সঙ্গীত-শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার পিতার অবদানই বেশি। তিনি সব সময় আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনার পিতার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত কি ছিল ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার পিতার প্রিয় সঙ্গীত ছিল লালন-সঙ্গীত। তাঁর কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত শুনে আমার শিশু-মনেও ভাবের উদয় হতো। তিনি বলতেন ভাবসঙ্গীতের জগতে 'লালন শাহের গানের তুল্য গান আর নেই।'

প্রশ্ন : সংসার-জীবনে আয়-রুজির জন্যে আপনার পিতা কি করতেন ?

উত্তর : আমার পিতার পিতা অর্থাৎ দাদা বেশ ভাল জমি-জমা রেখে গিয়েছিলেন। সেই জমিজমার আয় দিয়েই সংসার চলে যেতো। ফলে আমার পিতা আয়-রোজগারের অন্য কোনো পথে যান নি। তিনি গান-বাজনা নিয়েই থাকতেন। গান-বাজনা থেকেও কিছু আয় হতো।

প্রশ্ন : আপনার পিতা থাকাকালে কোন্ কোন্ সাধক আপনাদের বাড়ি আসতেন ? তাঁদের কয়েকজনের নাম বলবেন কি?

উত্তর : পিতার জীবিতকালে আমাদের বাড়িতে বহু সাধক এবং ফকির-দরবেশ আসতেন। এঁদের মধ্যে বেহাল শাহ, মহরালী শাহ, রসিক শাহ, দিদার শাহ, ঝড়ু শাহ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাই শাহ, রজব আলী শাহ, জিনাত শাহ, খোরশেদ শাহ, লাইলা বেগম, জোনাবালী মল্লিক, নিমাই শাহ, সরো ফকিরাণী, তক্কেল শাহ, হেদাত আলী, আতিয়ার রহমান খান, সৈয়দ শামসুল আলম প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন : সুধী-সাহিত্যিক এবং কবি-শিল্পীদের সঙ্গে আপনার পিতার কেমন জানাশোনা ছিল? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : কবি-সাহিত্যিক এবং সম্ভ্রান্ত অনেক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পিতার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরে রামদিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামের ব্যারিস্টার বাদল রশিদ (বাদল ব্যারিস্টার) আমার পিতাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বাদল ব্যারিস্টার আমার পিতাকে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। সেখানে খুব খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হতো, গান-বাজনার আসর বসতো।

হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুরের খোন্দকার রফিউদ্দীন (পাঞ্জু শাহের পুত্র) আমার পিতাকে খুব ভালবাসতেন। হরিশপুরে পাঞ্জু শাহের আখড়ায় অনুষ্ঠিত সব সাধুসেবায় রফিউদ্দীন আমার পিতাকে আমন্ত্রণ জানাতেন। পিতাও খুব আগ্রহভরে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে রফিউদ্দীন আমার পিতাকে নিয়ে বিভিন্ন জেলায় তাঁর (রফিউদ্দীনের) শিষ্য বাড়ি যেতেন। ঐ সব জায়গায় ভাবসঙ্গীতের আসরে আমার পিতা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। রফিউদ্দীনের কল্যাণে আমার পিতার নাম ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় (লালন-আখড়ায়) দেখেছি, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন আমার পিতাকে খুব আদরে গান গাইতে বলতেন। মনসুরউদ্দীনও আমার পিতাকে খুব স্নেহ করতেন। মনসুরউদ্দীন একবার আমার পিতাকে ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গান গেয়ে খুব সুনাম অর্জন করেন।

প্রশ্ন : আপনার পিতা কোন্ সময় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত শিক্ষক হয়ে যান? সেখাকার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

উত্তর : ১৯৮৩ সালে আমার পিতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত শিক্ষক হয়ে যান। শিল্পকলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচাক আজাদ রহমান তাঁকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করেন। একাডেমীতে আমার পিতা লালন-সঙ্গীতের ক্লাস নিতেন। অনেক ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছে লালন-সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিতো, এদের সকলের নাম আমি জানি না। কেবল চন্দনা মজুমদার এবং মনোয়ারা বেগমের নাম আমি জানি। এরা আমার পিতাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চাকুরীকালে আমার পিতা প্রথমে থাকতেন পাঞ্জু-পৌত্র খোন্দকার খায়রুল আনামের বাড়িতে। পরে তিনি থাকতেন চন্দনা মজুমদারের পিতা নির্মল মজুমদারের বাসায়। শিল্পকলা একাডেমীতে থাকাকালে সঙ্গীত শিল্পী সুধীন দাশ, সোহরাব হোসেন, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, এলাহি বকশ, পান্না বিশ্বাস, দিল আফরোজ রেবা, আঞ্জু জোয়ার্দার, শাহনাজ বেলি, দীপ্তি রাজবংশী, মিনা বড়ুয়া, আশুতোষ শীল, লোকমান হাকিম প্রমুখের সাথে আমার পিতার আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। সুধীন দাশ আমার পিতার কণ্ঠে লালন-সঙ্গীত টেপরেকর্ডারে ধারণ করেন। ধারণকৃত ঐ লালন-সঙ্গীতের তিনি স্বরলিপি প্রস্তুত করেন। পরে লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে পঁচিশটি লালন-সঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে।

প্রশ্ন : আপনার পিতার প্রিয় লালন-সঙ্গীতের কয়েক ছত্র বলুন।

উত্তর : সব লালন-সঙ্গীতই ছিল আমার পিতার নিকট অতি প্রিয়। এগুলোর মধ্যে তিনি বেশি গাইতেন — খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, হক নাম বল রসনা, এলাহি আলমিন গো আল্লাহ ইত্যাদি গান। এ ছাড়া পাঞ্জু শাহের গানও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পাঞ্জু শাহের নবীকে চিনে কর ধ্যান, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু ইত্যাদি গান তিনি গাইতেন।

মালঞ্চ

[খোদা বকশ শাহের কন্যা মালঞ্চ। একমাত্র কন্যা মালঞ্চকে খোদা বকশ শাহ খুব স্নেহ করতেন। ১৫.৯.৯৫ তারিখে কররাজাহাপুর গ্রামে খোদা বকশ শাহের আখড়ায় আমি মালঞ্চের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে উক্ত সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : আপনার পিতার কথা আপনার মনে আছে? তিনি কেমন লোক ছিলেন ?

উত্তর : আমার পিতার কথা আমার খুব ভালভাবে মনে আছে। পিতা আমাকে খুব আদর করতেন। নিজের হাতে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্বামীকেও তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁকে তিনি আপন ছেলের মতোই দেখতেন। পিতা অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি গান জানেন? যদি না জানেন, তবে কেনো গান শিখেন নি — সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি গান জানি না। গ্রামে মেয়েদের গান শেখার অনেক সমস্যা। সমাজপতিরা নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে। আমার পিতা সে জন্যেই আমাকে গান শেখান নি।

প্রশ্ন : আপনি এবং আপনার স্বামী কি আপনার পিতার মত ও পথ অনুসরণ করে চলেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি এবং আমার স্বামী আমার পিতার মত ও পথ অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করি। তবে পিতার মতো পূর্ণ ফকিরি জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। গ্রামের সমাজের সাথে মিলিয়ে চলতে হয় বলে আমরা একটু সেইভাবে চলি।

প্রশ্ন : আপনার পিতা সমাজপতিদের হাতে অনেক সময় লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে আমরা শুনেছি — এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

উত্তর : আমার পিতা ফকিরি মতের একজন পূর্ণ সাধক ছিলেন। ফকিরি মতের লোকদের উপরে প্রায়ই নির্যাতন চলে। আমার পিতাও অনেকবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সমাজের গোঁড়া-পন্থীরা আমার পিতাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তথাপি তিনি তাঁর মত ও পথ ত্যাগ করেন নি।

প্রশ্ন : আপনার পিতা বেঁচে থাকাকালে আপনাদের বাড়িতে কি ধরনের অতিথি আসতেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমার পিতা বেঁচে থাকতে আমাদের বাড়িতে ফকির শ্রেণীর লোকেরা আসতেন। অনেক গায়ক-গায়িকাও আসতেন। এঁদের মধ্যে লাইলা বেগম, খোরশেদ আলী শাহ, বেহাল শাহ, ঝড়ু শাহ, আমার পিতার গুরু শুকচাঁদ শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মহিন শাহ

[মহিন শাহ ছিলেন লালন-ঘরানার সবচেয়ে প্রবীণ সাধক। তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছরের কাছাকাছি। বহুদর্শী এই প্রবীণ সাধক মঙ্গল শাহের শিষ্য। মঙ্গল শাহ ছিলেন লালন-অনুগামী মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্য। মহিন শাহ একদিকে যেমন সুকণ্ঠ গায়ক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন যথার্থ মরমী সাধক। লালন-সঙ্গীতের ধারায় তাঁর রচিত অনেক গানও আছে। তিনি কুষ্টিয়াতে লালন শাহের আখড়ার কাছেই অবস্থান করতেন। আমি ১৯৯৫ সালের ২৯ অক্টোবর কুষ্টিয়ায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। ঐ সময় তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করি। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : আপনি কখন খোদা বকশ শাহের সাথে পরিচিত হন? প্রথম পরিচয়ে তাঁকে আপনার কেমন লাগে ?

উত্তর : আমি তখন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার তেলটুপি গ্রামে বসবাস করতাম। তেলটুপির পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শংকরদিয়া গ্রামে কামিনী ফকিরানীর আখড়ায় অনুষ্ঠিত সাধুসঙ্গে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন খোদা বকশ নবীন গায়ক। বিনয়ী মিষ্টভাষী বকশকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

প্রশ্ন : গায়ক হিসেবে খোদা বকশ শাহ কেমন ছিলেন ? তিনি কোন্ কোন্ মহতের গান জান্‌তেন ? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ খুব শক্তিশালী গায়ক ছিলেন। সুরেলা কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সরাসরি উপস্থাপন তাঁর গানগুলোকে মর্মস্পর্শী করে তুলতো। তিনি বহু মহতের গান জানতেন। এঁদের মধ্যে লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, জহরদ্দি শাহ, কাজেম শাহ, মফিজদ্দি শাহ, কোরবান শাহ, আহসান আলী শাহ, লালশশী, যাদুবিন্দু, রাধার শ্যাম, রামলাল গোস্বামী, গোঁসাই গোপাল, বেহাল শাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন : হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ নামে লালন শাহের একজন নাতি-শিষ্য ছিলেন। তিনিও সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁর রচিত সঙ্গীত এবং আমাদের আলোচ্য খোদা বকশ শাহের রচিত সঙ্গীত কি একাকার হয়ে গেছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ শাহ ছিলেন আমার দাদাগুরু মনিরুদ্দিন শাহের শিষ্য। এই খোদা বকশের রচিত বেশ কিছু সঙ্গীত ছিল বলে আমি জানি। কিন্তু সেই সঙ্গীতের খোঁজ পাওয়া এখন খুবই দুষ্কর। আমাদের আলোচ্য খোদা বকশের নিকটে হরিয়ারঘাটের খোদা বকশের কিছু গান সংগৃহীত ছিল। কিন্তু সেগুলোর নিদর্শন এখন মিলছে না। কাজেই উভয় খোদা বকশের গান মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু আজ আর উভয় খোদা বকশের গান পৃথক করে দেখানোর উপায় নেই। তবে বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত খোদা বকশও যে বহু সঙ্গীতের রচয়িতা, এ কথা আমি ভালভাবে জানি।

প্রশ্ন : খোদা বকশের গাওয়া লালন-সঙ্গীত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ লালন-সঙ্গীত শিখেছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী অমূল্য শাহের নিকট থেকে। অমূল্য শাহ ছিলেন অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি একজন কালোয়াতও ছিলেন। এত বেশি তালমাত্রা দিয়ে লালন-সঙ্গীত গাইতেন যে, তাঁর তুল্য শিল্পী সে সময় আর ছিল না। তাঁরই সুযোগ্য শাগরেদ খোদা বকশ। ফলে খোদা বকশের শিক্ষার মধ্যে কোনো গলদ ছিল না। তিনি প্রকৃত অর্থেই সার্থক লালন-সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। বকশের তুল্য লালন-সঙ্গীত শিল্পী এখন আর নেই।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীতের যে জনপ্রিয় ধারা মকছেদ আলী সাঁই থেকে ফরিদা পারভিনের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে, সেই ধারার সঙ্গে মকছেদ-ফরিদার পূর্বসূরি হিসেবে খোদা বকশের যোগসূত্র কতখানি? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : মকছেদ আলী সাঁই ছিলেন যাত্রাদলের মাস্টার। কণ্ঠ-সঙ্গীতেও তাঁর দখল ছিল। রাগ-রাগিনী সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লালন-সঙ্গীত তিনি শিখেছিলেন বেহাল, নিমাই শাহ প্রমুখের কাছে। ছেঁউড়িয়ার গোলাম ইয়াছিন শাহ, বাদের শাহ প্রমুখের নিকট থেকেও তিনি লালন-সঙ্গীতের সুর নিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে খোদা বকশের কাছেও তিনি উঠাবসা করেন। সবটা মিলিয়ে মকছেদ আলী সাঁই লালন-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী হয়ে ওঠেন। মকছেদ সাঁই এ সময় বেতার শিল্পীদের লালন-সঙ্গীত শেখানোর দিকে ঝুঁকে পড়েন। যে সব শিল্পী প্রতিষ্ঠিত বেতার শিল্পী, তাঁদের কণ্ঠেই কেবল তিনি লালন-সঙ্গীত তুলে দিতে চেষ্টা করেন। কুষ্টিয়ার ফরিদা পারভিন ছিলেন তাঁর হাতের কাছের শিল্পী। ফলে ফরিদা পারভিনই তাঁর সাহচর্য লাভের সুযোগ পেলেন বেশি। ফরিদার কণ্ঠ অসাধারণ, ফলে ফরিদার কণ্ঠেই লালন-সঙ্গীত রেডিওর মাধ্যমে বেশি জনপ্রিয় হলো। খোদা বকশ এবং ঐ শ্রেণীর গ্রাম্য শিল্পীরা একতারা-বায়া বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন এবং এখনো করেন। কিন্তু ফরিদা পারভিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ফলে উভয় প্রকারে পরিবেশিত সঙ্গীতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি বলবো, আধুনিক জনপ্রিয় ধারার লালন-সঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের পূর্বসূরি খোদা বকশ শাহ— একথা সত্য।

চন্দনা মজুমদার

[চন্দনা মজুমদার একজন নামকরা লালন-সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর পিতার নাম নির্মল চন্দ্র মজুমদার। পৈত্রিক নিবাস কুষ্টিয়ার কুমারখালী। প্রথম দিকে তিনি মকছেদ আলী সাঁইয়ের কাছে লালন-সঙ্গীত শেখেন। পরে খোদা বকশ শাহের সঙ্গীত-শিষ্য হন। প্রায় চার বছর যাবত খোদা বকশ শাহ চন্দনা মজুমদারের পিতার বাসায় ছিলেন। সেই সূত্রে চন্দনা মজুমদার খোদা বকশের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন। লালন-সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণও তাঁর পক্ষে সহজ হয়। ১৭.৯.৯৫ তারিখে চন্দনা মজুমদারের বাসায় (গুরুদুয়ারা, শিখমন্দির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) গিয়ে আমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সাথে কোন্ সময় আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি তখন নজরুল পরিষদে সঙ্গীত-প্রশিক্ষণ গ্রহণে রত। ঢাকাস্থ লালন পরিষদেও মাঝে মাঝে যেতাম। ইতোমধ্যেই শুনলাম খোদা বকশ শাহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে লালন-সঙ্গীত শিক্ষক পদে ৯.৬.৮৩ তারিখে যোগদান করেছেন। এ খবর শুনেই আমি শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে খোদা বকশ শাহের সাথে দেখা করি। এরপর আমি তাঁর নিকট লালন-সঙ্গীত শিখতে থাকি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ শিল্পকলা একাডেমীতে আসার পরে কখন এবং কত দিন আপনার বাসায় ছিলেন?

উত্তর : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে চাকুরী গ্রহণের পর খোদা বকশ শাহ প্রথমে খোন্দকার খায়রুল আনামের বাসায় থাকেন। পরে সেখান থেকে (প্রায় এক বছর পরে) তিনি আমাদের (আমি তখন বাবার সঙ্গে থাকতাম) বাসায় আসেন। আমাদের বাসায় তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে। আমার মাতা, পিতা ও আমি তাঁকে খুব যত্ন করে আমাদের বাসায় রেখেছিলাম। তিনি আজ নেই। তথাপি আমি আজো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের কাছে আপনি প্রথম কোন্ গানটি শিখেন ? ঐ গানের কিছু বাণী বলবেন কি?

উত্তর : খোদা বকশ শাহের কাছে আমি প্রথম শিখি জাহ্নবী গোস্বামীর একটি গান। গানটির ধরন এবং কোলঅন্তরা এরূপ —

যার ব্যথা সেই জানে লো সখী
ব্যথা অন্যে তো জানে না।
তোরা হলি মরতিস প্রাণে
বুঝতিস সে কি যন্ত্রণা॥

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন । এ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ অত্যন্ত উচ্চ-মনের মানুষ ছিলেন। মানুষে মানুষে তিনি কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করতেন না। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে তিনি সকলের সাথে সমানভাবে মেলামেশা করতেন। ধর্ম সম্পর্কেও তিনি ছিলেন খুব উদার। তিনি বলতেন — 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

প্রশ্ন : গায়ক হিসেবে খোদা বকশ শাহ কেমন ছিলেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : তিনি অসাধারণ গায়ক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুরেলা এবং তালমাত্রাবোধ ছিল অতুলনীয়। একতারা-বায়া বাজিয়ে তিনি গান করতেন বটে, তবে যে কোনো সুরের যন্ত্র তাঁর গানের সাথে বাজানো যেতো। এতে তাঁর কণ্ঠ কিংবা ঐ যন্ত্র বেসুরো লাগতো না।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ নিজে কি সঙ্গীত রচনা করতেন ? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ অনেক সঙ্গীত রচনা করেন। আমাদের বাসায় থাকাকালে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত রচনা করতেন। সেগুলো তাঁর খাতায় লেখা আছে। আমি তাঁর রচিত কয়েক শত সঙ্গীত দেখেছি। তাঁর সঙ্গীতে তিনি নিজেই সুর দিতেন। তাঁর রচিত কিছু সঙ্গীত আমার জানা আছে।

মফিজুল ইসলাম

[মফিজুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন উপপরিচালক। তিনি লোকসাহিত্য-প্রেমিক এবং একজন গবেষক। 'ফোকলোর কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২৬.১১.৯৫ তারিখে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যে সব তথ্য পেয়েছি, সেগুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় হয় কখন, কোথায়? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমীতে যখন 'প্রথম জাতীয় ফোকলোর কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়, তখন তিনি বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে ঐ কর্মশালায় অতিথি শিল্পী হিসেবে আসেন। ঐ সময় তাঁর সাথে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ হয়।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ কি ধরনের মানুষ ছিলেন? তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিল ? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর মনে কোনো অহংকার ছিল না। সাদা পোশাক, সরল-সহজ আচার-আচরণ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিনয়ী ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন খোদা বকশ শাহ। হাসিমাখা মুখে তিনি সকল মানুষের সাথে মিষ্টি আলাপ করতেন। তাঁকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে তাঁকে খুব আপনজন বলে মনে হতো।

প্রশ্ন : শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ শাহ কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন ?

উত্তর : শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ শাহ কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি সঙ্গীত-শিল্পী নই। তবে একজন শ্রোতা হিসেবে এটুকুই বলতে পারি যে, খোদা বকশ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের শিল্পী ছিলেন। হাতে-গণা দুই-চারজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মধ্যে তাঁর নাম স্মরণীয়।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ ঢাকা শহরের সাজানো আসরে এবং গ্রামের আখড়ায় নক্‌শী কাঁথার আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শহরের আসর এবং গ্রামের আসরে পরিবেশিত খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতে কি কোনো পার্থক্য আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

উত্তর : আখড়ার পরিবেশ এবং শহরের সঙ্গীতাসরের পরিবেশ এক নয়। আখড়ায় খোদা বকশ শাহ একতারা-বায়া বাজিয়ে গান করতেন। অন্য এক শিল্পী তাঁর গানের সাথে মন্দিরা বাজাতেন। সুরের বা তালের অন্য কোনো যন্ত্র সেখানে থাকতো না। ফলে আখড়ার গানে খোদা বকশ যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতেন, শহরের আসরে ঐ ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হতো না। কারণ তাঁর পরিবেশিত শহরের গানে সুরের ও তালের একাধিক যন্ত্র বাজানো হতো। এতে সঙ্গীতে আমেজ সৃষ্টি হতো যথেষ্ট, কিন্তু ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হতো কম। শহরের পরিবেশে তিনি কতকটা জড়তা নিয়ে গান করতেন বলে মনে হতো। কিন্তু আখড়ার আসরে গান গাইতেন তিনি খুব মুক্তমনে।

প্রশ্ন : ফরিদা পারভিন বা তাঁর অনুকরণকারী শিল্পীরা যেভাবে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন, সেই ভাবের সাথে খোদা বকশের গাওয়া লালন-সঙ্গীতের কি কোনো সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

উত্তর : ফরিদা পারভিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর অনুকরণকারীরাও ঐ ধারায় লালন-সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। আধুনিক এসব শিল্পীদের সঙ্গীতে দোতারা, বাঁশি, তবলা ইত্যাদি যন্ত্র বাজানো হয়। ফলে সুর, তাল, লয় ইত্যাদি ব্যাপারে লালন-সঙ্গীত নতুন রূপ ধারণ করে। কিন্তু খোদা বকশ শাহের যন্ত্রবাহুল্যবর্জিত লালন-সঙ্গীত মূল ধারার সঙ্গীত রূপে আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করতো। ফলে ফরিদা পারভিনের লালন-সঙ্গীত এবং খোদা বকশের লালন-সঙ্গীতে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের নিজের লেখা গান কি আপনি দেখেছেন বা শুনেছেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহের লেখা গান আমি দেখি নি বা শুনি নি। লালন-সঙ্গীতসহ ৭১ জন মহতের গান তিনি জানতেন। এগুলোর কিছু কিছু আমি শুনেছি। খোদা বকশ বলতেন — '৭১ জন মহতের ১৭০০ গান আমার মুখস্থ আছে।' লালন-সঙ্গীত তো তিনি গাইতেনই, এ ছাড়াও মফিজদ্দি, কাজেম বিশ্বাস, রামচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখের গানও তিনি গাইতেন।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ শিল্পীর সঙ্গে খোদা বকশের পরিচয় ছিল। এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?

উত্তর : পশ্চিম বঙ্গের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সাথে খোদা বকশের পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে প্রণব ব্রহ্মচারী, পূর্ণদাস বাউল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকবার ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের ঢাকায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানেন কি? জানলে মন্তব্য করুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ বিশ বছর ধরে বনেজঙ্গলে থেকেছেন, ভাঙ্গা মন্দিরে অবস্থান করেছেন, গাছতলায় সময় কাটিয়েছেন এবং মহতের গান শিখেছেন। ঢাকায় এসে তিনি ঐ সব গান প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। কিছুটা সফলও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি এসে আক্রমণ করায় তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে নি। তিনি আমাকে এবং বাংলা একাডেমীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন — 'আমি করজোড়ে মিনতি করে বলছি, আপনারা লোকসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত শিল্পীদের মূল্যায়ন করুন। সময় থাকতে ব্যবস্থা না নিলে অমূল্য সম্পদ নষ্ট হবে।' দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ মূল্যায়ন-কাজ শুরু করার পূর্বেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

আজাদ রহমান

[বিশিষ্ট সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক আজাদ রহমান খোদা বকশ শাহকে শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত বিভাগে সঙ্গীত-শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে খোদা বকশ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে লালন-সঙ্গীত প্রশিক্ষণ দিতেন। এই মরমী সাধক শিল্পী সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি ১৩.৬.৯৬ তারিখে আজাদ রহমানের ঢাকাস্থ বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। নিম্নে উক্ত সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সঙ্গে কবে, কোথায়, কিভাবে আপনার পরিচয় হয়? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : এই ভূ-খণ্ডের লোকসঙ্গীত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি সঙ্গীতধারা হিসেবে আমার কাছে চিহ্নিত। আমি মনে করি লোকসঙ্গীত মানুষের মনের দলিল। লোকসঙ্গীত সমকালীন মানুষের মনের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে। আজকের পৃথিবীতে মানবতা, অহিংসা ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের এক ফকির — লালন শাহ অনেকদিন পূর্বে বলে গেছেন, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।' আমি সারা জীবন ধরে বাংলাদেশের এ ধরনের জাতপাতহীন সমাজের বক্তব্য-সমৃদ্ধ সঙ্গীত গেয়ে আসছি। এ কারণেই সেকালের দার্শনিক পদ-রচয়িতা লালন শাহের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ। বলতে গেলে শিশুকাল থেকেই এ রকম আকর্ষণ আমি অনুভব করেছি। আর তা বৃদ্ধি পেয়েছে আমার পিতার কণ্ঠে ভক্তিমূলক লোকসঙ্গীত শুনে। আমার সঙ্গীত-শিক্ষকদের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার সঙ্গীত-সাধনার জীবনে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ এবং লোকসঙ্গীত চর্চা আমি করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমি পারফর্মিং আর্ট একাডেমীর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তখন আমার মনে হয়েছিল যে, আমি বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের 'বৃত্তিমূলক উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষাক্রম' চালু করবো। এই শিক্ষাক্রম বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। এই কোর্সে আমাদের দেশ তথা উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বে সঙ্গীত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানার পরিধি বৃদ্ধি হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি একটি পাঠক্রম প্রণয়ন করেছিলাম। এই পাঠক্রমে লালন-সঙ্গীতও ছিল। অবিকৃতভাবে লালন-সঙ্গীত প্রশিক্ষণের জন্যে একজন শিক্ষকের সন্ধান করতে গিয়ে আমি খোদা বকশ শাহকে খুঁজে পাই। ১৯৮০—৮১ সালের দিকে ছেঁউড়িয়া (কুষ্টিয়া) আখড়ায় তাঁর সাথে আমি পরিচিত হই। ১৯৮২ সালে আগস্ট মাসে যখন আমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে মহাপরিচালক পদে যোগদান করি, তখনই খোদা বকশ শাহকে শিল্পকলা একাডেমীতে নিয়োগদানের কথা ভাবি। ১৯৮৩ সালে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। খোদা বকশ শাহকে

আমি লালন-সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করি। তিনি ঐ সালের ৯ জুন যোগদান করেন। শিল্পকলা একাডেমীতে 'বৃত্তিমূলক উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষাক্রম' চালু হয়। খোদা বকশ এই প্রকল্পেই যুক্ত হন।

প্রশ্ন : একজন সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ শাহ কতখানি উপযুক্ত ছিলেন ?

উত্তর : সহজভাবে গভীর কথা বলা লোকসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খোদা বকশ শাহ সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। আমাদের লোকসঙ্গীতের গভীর ভাব প্রকাশ করার উপযুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাল, সুর ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল। সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে তিনি যথার্থই খুব বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রশ্ন : সঙ্গীত-শিক্ষক হিসেবে তাঁর কতখানি দক্ষতা ছিল? নবীন-প্রবীণ সঙ্গীত-শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর স্থান কোথায় ?

উত্তর : ইদানীংকালে লোক-সঙ্গীত চর্চার একটি ঢল নেমেছে। এটা ঠিক বানের জলের মতো। এর বেশিরভাগ পান করা যায় না এবং স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ট্র্যাডিশনের যথার্থ প্রকাশ ঘটে লোকসঙ্গীতে। কিন্তু এখন যথেচ্ছাচারের প্রকাশ ঘটছে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রবীণের জানার পথ ধরেই নবীনকে এগিয়ে আসতে হবে। খোদা বকশ শাহ ছিলেন ঐ রকম অনুকরণীয় প্রবীণ সঙ্গীত-সাধক। বিশেষত লালন-সঙ্গীতে তিনি ছিলেন অনুপম ব্যক্তিত্ব। নবীন-প্রবীণ সকল লালন-সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। আমি মনে করি 'তিনিই তাঁর একক উপমা কেবল'।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীত ভাণ্ডারী হিসেবে খোদা বকশ কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন ?

উত্তর : বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লালন-সঙ্গীত সংগ্রাহক এবং সংরক্ষণকারী হিসেবে খোদা বকশকে গুরুত্ব দিতেই হবে। বাংলাদেশে লালন-সঙ্গীত চর্চা বিশেষ করে ঢাকার শিল্পীদের অবিকৃতভাবে লালন-সঙ্গীত শেখানো শুরু হয় খোদা বকশের মাধ্যমে। তিনি তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন শিল্পকলা একাডেমীতে। তাঁর ভাণ্ডার ছিল বিশাল। অসংখ্য লালন-সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এ ছাড়া প্রায় চল্লিশ জন লালন-অনুসারী মহতের গানও তিনি জানতেন।

প্রশ্ন : মানুষ হিসেবে খোদা বকশ কেমন ছিলেন ? এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করুন।

উত্তর : তিনি ছিলেন সহজ-সরল মানুষের প্রতিকৃতি, যেমন ছিলেন আমাদের বাপ-দাদারা। তাদেরই প্রতিচ্ছবি আমি খোদা বকশ শাহের মধ্যে দেখতাম। হয়তো এটা আমার দুর্বলতাও হতে পারে। তবে শহরে থেকেও আমি শহুরে মনোভাবকে গুরুত্ব দিতে পারি না। তাই তো খোদা বকশ শাহ আমার কাছে আদর্শ মানুষ।

প্রশ্ন : সমকালীন লালন-সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে খোদা বকশ শাহ কতটা মূল সুরে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন ?

উত্তর : আমি জীবনের প্রথম থেকেই লোকসঙ্গীত চর্চা করে আসছি। তবে জীবনের তাগিদে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে আমার সঙ্গীত পরিচালনার পেশাটি জনমনে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আমার জানা এবং শিক্ষার সূত্রে খোদা বকশ শাহের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যটি আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি। তাঁর গায়কী, উপস্থাপন-পদ্ধতি, একতারা-বায়া বাদন-ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছে যে, লালন-সঙ্গীতের মূল সুর তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর হকনাম বল রসনা, এলাহি আলমিন গো আল্লা ইত্যাদি গানে যে প্রাণ ফুটে উঠতো, তা দেখে আমি ঐ প্রাণ-প্রাচুর্য সুরকে লালন-সঙ্গীতের মূল-সুর বলে মনে করতাম এবং এখনো মনে করি।

প্রশ্ন : সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশকাল সম্পর্কে খোদা বকশ শাহের ধারণা কেমন ছিল? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : সমাজ, সংস্কৃতি, দেশকাল সম্পর্কে খোদা বকশ শাহের ধারণা ছিল খুব ভাল। শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত-শিক্ষকতার সুযোগ পেয়ে তিনি খুশি হন। তিনি মনে করতেন যে, সমাজ ও দেশ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। তবে শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে তিনি খুব অসহায় বোধ করতেন। লালন-সঙ্গীতের আলাপ পেলে তিনি সব ভুলে যেতেন। শিল্পকলা একাডেমী থেকে চাকুরীচ্যুত হয়ে তিনি গভীর বেদনাবোধ করেন। তাঁর এ বেদনা বোধে আমিও ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। কারণ আমার সৃষ্ট উচ্চতর সঙ্গীত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা সরকারিভাবে বাতিল হয়ে যায়। আমিও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদ থেকে অব্যাহতি পাই। নানা কারণে খোদা বকশ শাহ শেষ দিকে দেশ, কাল ও সমাজ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে।

নির্মল চন্দ্র মজুমদার

[নির্মল চন্দ্র মজুমদার একজন কণ্ঠশিল্পী। লালন-সঙ্গীত তাঁর অতিপ্রিয় বিষয়। ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি বিভিন্ন বে-সরকারি সংস্থায় চাকুরি করেন। সাথে সাথে সঙ্গীত চর্চাও করতে থাকেন। ১৯৬৮ সালে তিনি কুমারখালী, কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় আসেন এবং এল.এ. মতিন এন্ড কোং নামক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হিসাব-রক্ষণ অফিসার পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। পশ্চিম রামপুরা, ৯ ওমর আলী লেনে তাঁর বাসা ছিল। নির্মল চন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী অনিমা মজুমদারও একজন সঙ্গীত-প্রেমিকা মহিলা। নির্মল চন্দ্র চার সন্তানের জনক। এদের নাম যথাক্রমে চন্দনা মজুমদার, চঞ্চল মজুমদার, রঞ্জন মজুমদার এবং তন্দ্রা মজুমদার। চন্দনা লালন-সঙ্গীতের অনুরাগী শিল্পী। খোদা বকশ শাহ দীর্ঘদিন নির্মল মজুমদারের ঢাকাস্থ ওমর আলী লেনের বাসায় ছিলেন। এই সূত্রে গত ১৫.১. ৯৭ তারিখে নির্মল চন্দ্রের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তাঁর কুমারখালীস্থ (কুষ্টিয়া) বাসভবনে। নিম্নে ঐ সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সাথে কোন সময় আপনার সাক্ষাৎ হয়? প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে কেমন মনে হয়েছিল? এই বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : ১৯৭৫ সালে ছেঁউড়িয়া (কুষ্টিয়া) লালন-সমাধি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত লালন স্মরণোৎসবে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সাথে আমার প্রাণখোলা আলাপ হয়। তাঁকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ি এবং তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। তিনিও প্রণামের জবাবে আমাকে আশীর্বাদ করেন।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ কোন সালে আপনার ঢাকার বাসায় গিয়ে ওঠেন? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ আমার ঢাকার বাসায় গিয়ে ওঠেন — এ কথা ঠিক নয়। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে খোদা বকশ শাহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীত শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ঢাকাতে তিনি নবাগত। তাঁর থাকার জায়গা ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি পাঞ্জু শাহ সেবা সংস্কৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার খায়রুল আনামের বাসায় (উত্তর গোরান, ঢাকা) থাকেন। সেখান থেকে প্রতিদিন রিকসাযোগে এসে শিল্পকলা একাডেমীতে সঙ্গীতের ক্লাস নিতেন। সঙ্গীতের এই ক্লাসে অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নিত। এসব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আমার মেয়ে চন্দনাও ছিল। চন্দনার সংগে খোদা বকশ শাহের পরিচয় ঘটে। এ পরিচয়ের সূত্রধরে খোদা বকশ শাহ আমার বাসায় (রামপুরা, ঢাকা) আসেন। তাঁর চাকুরির কাল প্রায় এক বছর পূর্ণ হবার সময় তিনি খোন্দকার খায়রুল আনামের বাসা থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাসায় একেবারে চলে আসেন। শিল্পকলা একাডেমীতে যতদিন তাঁর চাকুরি ছিল, ততদিন তিনি আমার বাসায় ছিলেন। আমি কৃতার্থ যে, তাঁর মতো গুণী মানুষ অনুগ্রহ করে প্রায় চার বছর আমার বাসায় অবস্থান করেন।

প্রশ্ন : যখন ছেঁউড়িয়ার (কুষ্টিয়া) আখড়ায় তাঁর সাথে দেখা হয়, পরে যখন তিনি আপনার বাসায় থাকেন — এই দুই সময়ে কি তাঁর চালচলনে, কথাবার্তায় এবং আচার-আচরণে কোনো পার্থক্য আপনি লক্ষ্য করেছেন? এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলুন।

উত্তর : কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব চিরদিনই এক রকম থাকেন। খোদা বকশকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিন তাঁকে যেমন মনে হয়েছিল, পরবর্তীকালেও তিনি তেমনই ছিলেন। খোদা বকশ ছিলেন পরম সাধু, মহর্ষি-মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো বিনয়ী, নম্র, ভদ্র মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আমার বাসায় থাকাকালেও তাঁর চলনে-বলনে আচার-আচরণে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর মধুর ব্যবহার, নির্মল চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন আমাদের পারিবারিক গুরু এবং একান্ত আপনজন।

প্রশ্ন : লালন-সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে খোদা বকশ কেমন ছিলেন? তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল কি? থাকলে বলুন।

উত্তর : লালন-ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন খোদা বকশ শাহ। তাঁর কণ্ঠ, শব্দ-উচ্চারণ ভঙ্গি এবং সুরের কারুকাজ, সর্বোপরি উপস্থাপন নৈপুণ্য ছিল অতুলণীয়। একতারা-বায়া বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করে যে সম্মোহন তিনি সৃষ্টি করতেন, তার কোনো তুলনা ছিল না। তাঁর সমকালীন কোনো-সঙ্গীতশিল্পী তাঁর মতো দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কোনো দিন তিনি খাতা দেখে গান করেন নি। প্রায় হাজারখানেক গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি লালন ছাড়াও শতাধিক সাধকের গান জানতেন।

প্রশ্ন : আপনি খোদা বকশ শাহের কাছে কোনো গান শিখেছেন কি? শিখে থাকলে তা বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহের কাছে আমি অনেক লালন-সঙ্গীত শিখেছি। তাঁর প্রেরণায় আমি বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে লালন-সঙ্গীত পরিবেশনে উৎসাহিত বোধ করেছি। লালন ছাড়াও অন্যান্য মহতের গান তাঁর নিকট পেয়েছি। আজো তাঁর প্রদত্ত প্রেরণার কথা ভুলি নি।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ যখন আপনার বাসায় ছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে আপনি কি কোনো সমস্যায় পড়েছিলেন। (আহার এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে)? এ বিষয়ে কিছু বুলন।

উত্তর : না, তাঁকে নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নি। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সাধক। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ তাঁর কাছে ছিল সমান। আমি এবং আমার পরিবারের সকল সদস্য ঐ একই মনোভাবাপন্ন। ফলে খোদা বকশ শাহের সাথে আমার কিংবা আমার পরিবারের কারো কোনো গরমিল আমি দেখতে পাই নি।

আহারাদি ব্যাপারেও তাঁর কোনো সংস্কার ছিল না, আমাদেরও কোনো সংস্কার নেই। ফলে কোনো ভেদ-বিভেদের প্রশ্নই ওঠে নি কোনো দিন।

প্রশ্ন : শিল্পীদের মধ্যে না-পাওয়ার ক্ষোভ থাকে। খোদা বকশের মধ্যে এমন কোনো ক্ষোভ কিংবা না-পাওয়ার হা-হুতাশ লক্ষ্য করেছেন কি?

উত্তর : না, তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। না-পাওয়ার হাহাকার বা হা-হুতাশ দেখি নি কখনো। তিনি খুব আত্মতৃপ্ত এবং ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর চাওয়া-পাওয়া বলতে কিছুই ছিল না।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ গান রচনা করতেন — এ বিষয়ে কিছু জানেন কি? জানলে বলুন।

উত্তর : গভীর রাতে সব লোক ঘুমিয়ে পড়লে তিনি খাতা-কলম নিয়ে গান লিখতেন। গান লেখা শেষ হলে আমাকে পড়ে শোনাতেন, কখনো বা গাইতেন। তাঁর গানের বাণী ও সুর আকর্ষণীয়।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ মরণোত্তর একুশে পদক পেলেন — এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : এই মহান শিল্পী মরণোত্তর একুশে পদক পেলেন, তাতে আমি খুশি। তবে এটুকুই বলবো যে, শিল্পীর জীবনকালেই তাঁর মূল্যায়ন আবশ্যক। মরণোত্তর স্বীকৃতি শিল্পীর জীবনে কাজে লাগে না। বেঁচে থাকা শিল্পীর জন্যে সরকার কিছু করুন — এই আমার আবেদন।

কিরণ চন্দ্র রায়

[কিরণ চন্দ্র রায় লোকসঙ্গীত ভুবনের একটি জনপ্রিয় নাম। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার ভাটিবয়রা গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি কথা শিখেছেন গান শুনে শুনে। বাবা-কাকারা গান করতেন। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছিল একটি কীর্তনের দল। লোকসঙ্গীত তাই তাঁর প্রাণের স্পন্দন। নিজের গ্রামে, পাশের গ্রামে অনেক কৃষ্ণলীলার দল ছিল। এসব দলে গান গেয়েছেন তিনি, অভিনয়ও করেছেন। লেখাপড়া করেছেন স্থানীয় স্কুলে, মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজে এবং সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী তিনি। গণমাধ্যমে গান গাওয়ার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি গণমানুষের কাছে গিয়ে গান শোনাতে। সে কারণে গানের ডাকে ছুটে বেড়ান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। গান গাওয়া নয় কেবল, গান সংগ্রহও করেন তিনি। চেষ্টা করেন মূল সুর ও বাণী অক্ষুণ্ণ রেখে গান করতে। গান নিয়ে তার নিজস্ব কিছু মতামতও আছে। এই সঙ্গীতশিল্পী খোদা বকশ শাহের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। গত ৫.২.৯৭ তারিখে তাঁর আজিমপুরস্থ বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। নিম্নে সাক্ষাৎকারটি উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় কোন সালে? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শুভক্ষণে (দিন তারিখ স্মরণ নেই) বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে খোদা বকশ শাহকে দেখি। তাঁর সাথে পরিচয় হয়। নিয়ে আসি আমার গুরুদুয়ারা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে) বাসায়। সারারাত তাঁর গান শুনি, আমার গান তাঁকে শোনাই। তিনি আশীর্বাদ করেন আমাকে। সে রাত আজো স্মরণপথে আসে।

প্রশ্ন : খোদা বকশ শাহ গায়ক হিসেবে কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন? এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন খোদা বকশ শাহ। এমন সুরেলা এবং পরিষ্কার কণ্ঠ পল্লিগায়কের খুব কমই দেখা যায়। মাইক ছাড়াও গান করে তিনি হাজার হাজার শ্রোতার কানে তাঁর গানের বাণী পৌঁছে দিতে পারতেন। তিনি মঞ্চ-সাফল্য গায়ক ছিলেন, ভাবের ভাবুক শিল্পী হিসেবে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন : আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পী (যেমন ফরিদা পারভিন) এবং খোদা বকশ শাহ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে কিছু বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ এবং আধুনিক লালন-সঙ্গীত শিল্পী (যেমন ফরিদা পারভিন) এর মধ্যে সামঞ্জস্য (মিল) অসামঞ্জস্য (গরমিল) দুই-ই আছে। সুরের কাঠামো গত দিক উভয়ের একই। তবে গায়নরীতি ভিন্ন। খোদা বকশ শাহ একতারা বায়া বাজিয়ে লালন-সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, সেই সঙ্গীতই ফরিদা পারভিন পরিবেশন করেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ফলে কাঠামোগত দিক ঠিক থেকেও গায়নরীতিতে পার্থক্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : কুষ্টিয়ার পল্লি-অঞ্চলের শিল্পীরা আজো একতারা-বায়া বাজিয়ে লালন সঙ্গীত গেয়ে থাকেন, খোদা বকশ শাহ ঐ একই ভাবে গাইতেন। তথাপি খোদা বকশ কি ভিন্ন রীতি অনুসারী ছিলেন? এ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর : খোদা বকশ শাহ এবং তাঁর সমকালের ও পরবর্তীকালের পল্লি গায়কেরা একইভাবে গান করেন। তবে পার্থক্য এই যে, অনেকেই তাল, মাত্রা, লয় এবং শব্দ-নিক্ষেপণ ব্যাপারে খোদা বকশের তুল্য নয়। ফলে পার্থক্য ধরা পড়ে। খোদা বকশ অসাধারণ গায়ক ছিলেন বলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব এখনো বর্তমান।

প্রশ্ন : খোদা বকশের সুর থেকে সুধীন দাশ লালন-সঙ্গীতের স্বরলিপি করেন (লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ যা বই-আকারে বের করেছে)। এই স্বরলিপি কতদূর নির্ভরযোগ্য বলে আপনি মনে করেন? বলুন।

উত্তর : খোদা বকশ লালন-সঙ্গীতের মূল সুরের গায়ক ছিলেন। ফলে তাঁর সুর থেকে সুধীন দাশ-কৃত স্বরলিপি যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে তুলনামূলকভাবে সুর-সংগ্রহ পদ্ধতিতে স্বরলিপি করলে ভাল হতো।

সঙ্গীত

প্রার্থনা ও স্তুতি

১

ওহে অধমের বন্ধু এই ভবসিন্ধু
দিয়ে পদারবিন্দু কর হে তারণ।।
তোমার কৃপাসিন্ধু নাম তুমি গুণধাম
কর পরিত্রাণ দিয়ে শ্রীচরণ।।
ত্রিতাপ অনলে করিছে দাহন
জ্বলে পুড়ে মরি করি কি এখন
তুমি জীবের জীবন সত্য সনাতন
পতিত-পাবন নাম ধর হে এখন।।
চতুর্বর্গ ফল পথের সম্বল
কর্মদোষে হইল বিফল
ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ যার নাম,
তুমি গুণের গুণধাম, নিলাম হে স্মরণ।।
দীনহীন বেশ করিলে ধারণ
পাপীতাপী ত্বরাও এই তো কারণ
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর চরণ
দীন বকশের আকিঞ্চন
যেন সদাক্ষণ থাকে দু-নয়ন।।

২

এসো দয়াল দীনবন্ধু পাপীকে কর তারণ।।
শত অপরাধে অপরাধী আমি
ডাকি তোমায় সেই কারণ।।
দয়াল নাম প্রকাশিলে
কত পাপীকে উদ্ধারিলে
আমার বেলায় বাম হলে
ত্রিতাপ জ্বালা কর নিবারণ।।
জগাই মাধাই দস্যু ছিলো
তোমার কৃপায় উদ্ধার পেলো
অহল্যা মানবী হলো
আমি কেনো পাইনে চরণ।।

পড়ে ভবসিন্ধু মাঝে
দিন গেল অকাজে কুকাজে
দীনহীন বকশ মজে
যে কাজে হয় রে মরণ।।

৩

জয় জগত–বন্ধু করুণার সিন্ধু
দিয়ে পদারবিন্দু কর হে নিস্তার।।
এ বিশ্বসংসারে মরি ঘুরে ঘুরে
তুমি সবাকার করুণার সাগর।।
শ্রী–অঙ্গনের পাশে দীনহীন বেশে
মাঝে মাঝে তাই আমরা থাকি বসে,
সুমধুর রসে নামের শব্দ ভাসে
থাকি যেন মিশে সঙ্গেতে তোমার।।
দক্ষিণে সরোবর কিবা শোভাকর
নারিকেল সুপারি গাছ আছে বহুতর,
পাকা বাঁধা ঘাট অতিশয় ঠাঁটবাট,
ভক্তিতে নামলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় তার।।
দেখিলাম তোমার নামের মাহাত্ম্য
প্রাণ দিয়ে ভক্তগণ হয়েছে মত্ত
মৃতদেহ তার গাড়া রয় হেথায়
চাল্‌তে গাছের ছায়ার মাঝার।।
তোমার সাধের তরণী রয়েছে এখন,
যাতে বিনা মাঝি–মাল্লায় করিতে ভ্রমণ,
যত্ন করে তাই রেখেছে আঙিনায়
তাহাতে হবে কি বৈতরণী পার।।
শাহ ফরিদ আগমনে জেলা ফরিদপুর যার নাম,
সরস্বতী পূজার মেলা দেখিলাম,
গোঁসাই ব্রজনন্দ করিছে কত আনন্দ
ভক্তবৃন্দ আছে সঙ্গেতে তাহার।।
অতি উচ্চ দেখি সমাধি–মন্দির
মনোহর মুরতি শিলা স্বর্ণ কান্তি
আছ তুমি বসে অধীন বকশ ভাসে,
তব কৃপালেশে গুরুপদে মতি যেন হয় আমার।।

৪

চাতুরী করিয়া কুকাজে মজিয়া
মুখে হরি হরি বলো না, বলো না।।
গলে মালা মোটা কেটে লম্বা কোটা
চিতাবাঘ সেজে থেকো না, থেকো না।।
প্রবঞ্চনা কন্টক অঙ্গেতে ধরি,
বেড়াও সদা সাধুসঙ্গ করি,
স্বপ্নে পাওয়া আঁচলা স্কন্ধে করি
আসনমান্য ভিক্ষা পাবে না, পাবে না।।
হরিনাম যদি করিবারে চাও,
কুচরিত্র ছেড়ে সুপবিত্র হও,
আত্মা ব্রহ্মময়ী ভাব সর্বব্যাপী
নইলে মিথ্যা ডাকায় কিছু হবে না, হবে না।।
সাধু–নামে যদি কেহ কলঙ্ক রটায়,
দায়মালের আসামী হইবে নিশ্চয়,
মহাপাপে তার নরক হয়, দীন বকশ কয়,
সদানন্দের বচন ভাবো না, ভাবো না।।

৫

পড়েছি ঘোর সঙ্কটে একলা বটে
কেউ নাই আজ আর মোর নিকটে।।
বেড়াচ্ছি ছুটে–ছেটে মাঠে–ঘাটে
কখনো যাই নদীর তটে।।
তুমি দীনবন্ধু বটে পাই শঠে
মন্দির মঠে গির্জা পাঠে,
থাকো তুমি সর্বঘটে জানি বটে
কারো দূরে আর কারো নিকটে।।
এসে এই ভবের হাটে ডাকছি মোটে
দৌড়ে দেখা দেও না ছুটে,
আছ কি বংশী বটে নয় জলের ঘাটে
শ্রীপাটে কি হৃদয়–পটে।।
সকলেই চল্‌লো ছুটে কাছা এটে
কীর্তন মঠে নৃত্যনাট্যে
সুপ্রভাতে উঠে দীন বকশ রটে
যেন সুফল ফলে সব ললাটে।।

৬

আমাতে যে তুমি আছ আমি তা তো জানি না।।
তুমি আছ সর্বঘটে মানি কিন্তু মানি না।।
আমি দুঃখ পেলে পরে তুমি জান কেমনে,
হয়ে খাদেম কর সেই কাম আমার মনের সন্ধানে,
তুমি জান কি প্রকারে
আমি জানিনে তোমারে
জানবো বল কেমন করে তোমার এসব বাহানা।।
দিবানিশি তোমায় ডাকি শুনে কি শোনো না
কভু নিদয় কভু সদয় এই কি তোমার মন্ত্রণা,
থাক তুমি নির্জন বাসে
আমি থাকি পরবাসে
কল্পতরু নামটি শুনে ডাকি তোমায় রব্বানা।।
যখন যে ভাবে রাখ থাকি আমি সেই হালে
চাওয়া-পাওয়া নেইকো কিছু দাও জড়িয়ে প্রেমজালে,
তোমারি এই ভূমণ্ডলে
তোমাকে আর না যায় ভুলে
শুকচাঁদ সাঁইকে পেলে পরে দীন বকশর যেতো ভাবনা।।

সাধুসঙ্গ

৭

শুভ সাধুসঙ্গ লয়ে সঙ্গপঙ্গ
বনবিহঙ্গ প্রসন্ন করিলে।।
জলে ফুটেছে কমল হলো সরোবর উজ্জ্বল,
নবপল্লব তরুতল ছায়া সুশীতলে।।
নব নিত্য ফুলে ভরিল ডালা
কুড়াইয়া কেহ গাঁথিল মালা,
তাই হয়েছে উজালা, মুখে যায় না বলা,
যেমন তারার মালা চাঁদের গলে।।
অহৈতুকিং স্বর্গ, শাস্ত্রে শোনা যায়,
সাধুসঙ্গে তার সত্য প্রমাণ হয়,
ভক্তিবলে তাই যে জন ধিয়ায়,
হয়েছে উদয় নয়ন সলিলে।।
সচ্চিদানন্দ রূপে হলো আবির্ভাব
শুদ্ধ ভাবে ভেবে ভক্তের হলো লাভ,
বকশর নাই সে ভাব হইল বৈভব,
সুভাবের ভাব দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই বলে।।

৮

কি আনন্দধাম সাধুসঙ্গ নাম
নয়নে হেরিলাম পূর্ণ মনস্কাম।।
কোটি জন্মফলে যদি ভাগ্যে মেলে
কারো যায় বিফলে দুর্লভ জনম।।
গোধূলী লগনে হলো আগমন,
তার সুবাতাসে হয় বনের কাষ্ঠ চন্দন,
করি পদ-প্রক্ষালন আনন্দিত মন,
সাধের জনম ধন্য হইলাম।।
অমাবস্যায় উদয় পূর্ণ শশধর,
আনন্দ অপারে দেখ যে এবার,
হলো পুলকিত অঙ্গ পেয়ে তার সঙ্গ,
তাপিত অঙ্গ শীতল করিলাম।।
করপুটে এবে সাধি সৎজন,
নিজগুণে কৃপা কর হে এখন,
আমার জীবন-মরণ সব বিস্মরণ,
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর চরণ
বকশ সাধ অবিরাম।।

৯

কত আর চলবো ছুটে পথেঘাটে
হও নিকটে হে দয়াময়।।
যতই আমি খাটি-খুটি কর্ম সেটি,
তাহাতে মোর সুখ-দুঃখ নাই।।
ট্রাক-বাসে রাস্তায় চলি ট্রেনে কি বলি,
ঘোড়াগাড়ি আর টমটমা তাই,
চড়ে কত মষেগাড়ি কাদায় পড়ি,
প্রভুর কৃপায় স্টেশন পাই।।
স্টিমার-লঞ্চে উঠে নৌকা পাটে,
কলার মাড় আর তালোডোঙ্গায়
বাইসিকলের রথে চড়ি গড়াগড়ি
আনন্দে যায় সাধুর আখড়ায়।।
কভু যায় পদব্রজে কে আর বোঝে
তেত্রিশ মাইল ভুলিনে তাই,
পেলাম এক সাধুসঙ্গ পরম রঙ্গ,
দীন বকশ কয় মুর্শিদের কৃপায়।।

মানুষতত্ত্ব

১০

মানুষ ভজন করবো বলে মনেতে করি বাসনা ॥
বনফুলে পুঁজি মানুষ, মনফুল তো ফুটিল না ॥
মানব-লীলা সব লীলার সার শুনেছি তাই শ্রবণে,
কিরূপে ভজিবো মানুষ তাহার সন্ধান জানিনে,
সেবা কিংবা ভক্তি দিলে
তাই কি মানুষ-ভজা বলে,
চন্দন প্রদীপ আর বনফুলে কিসে হয় মানুষের ভজনা ॥
মানুষে মন্‌হুঁশ কামনা করি বল কেমনে,
ফুল তুলিতে বেলা গেল, মালা গাঁথবো কখনে
মম মনসুতা নাইকো ভাল
কেমনে মালা গাঁথবো বল,
গাঁথতে গাঁথতে বেলা গেল কণ্ঠে পরাব কখন ॥
ত্রিলোকের মনহরা রূপ নরবপু তাহার স্বরূপ,
পুঁজিলে কি মেলে মানুষ, গঙ্গাজল তুলসী দিলে ধূপ,
উচ্চ করে আসন দিলে
তাই কি মানুষ-ভজা বলে,
শুকচাঁদ সাঁই মোর কিসে মেলে দীন বকশর সদা এই ভাবনা ॥

১১

মানুষ-ভজন করবা যদি মনে করেছ এই কামনা ॥
মনফুলে ভজ মানুষ, বনফুলে তা তো মেলে না ॥
বনফুল আর কুল্লের কারণ পূজা আর পার্বণে
মহতের অধিবেশনে জাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
উচ্চ অফিসার আসিলে মালাদান হয় তাহার গলে,
মনের সুকৌতুক হলে দান-দক্ষিণা করে সে না ॥
বেলী, বকুল, টগর, গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ,
লাল করবী, শ্বেত করবী, শোভা করে তাহার মাঝ,
গেঁদা ফুলে নেকলেস্ করে, হৃদয় যদি তাতে ভোলে,
নিষ্ঠামনে পরাইলে তবে হয় মানষের সাধনা ॥
অন্তর-মন্দিরে রেখে কর তাহার কল্পনা,
আন-পর সঙ্গ ছাড় সত্যের দেও আসনখানা,
শুদ্ধ শান্ত গঙ্গাজলে, ভজ মানুষ মন-কমলে,
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইজী বলে দীন বকশর হয় পূর্ণ-সাধনা ॥

১২

এই মানুষে আছে মানুষ
মানুষ ধরলে জানা যায় ॥
ভাবের মানুষ দেখতে বেহুঁশ,
মানুষ ছাড়া কিছুই নাই ॥
তিন মানুষের হয় সংসার
অযোনি সহজ সংস্কার
ভজলে সহজ মানুষ আকার
সেই তো উদ্ধার হয়ে যায় ॥
সেবা পূজা ভক্তি মুক্তি
এই তো মানুষ ধরার যুক্তি,
সেই তো হয় মানুষের উক্তি,
যে জন সদা সত্য কথা কয় ॥
আদি মানুষ মানুষ মুরতি,
মাটি হতে মানুষ উৎপত্তি,
মানুষ ছাড়া নাই অন্য গতি
দীনহীন অবোধ বকশ কয় ॥

১৩

জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে ॥
সাদা কিবা কালো বরণ, জাত দেখছো কি এক নজরে ॥
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি এই জেনেছ জাতির জান,
লম্বা কি সে গোল আকৃতি কি করেছ তার প্রমাণ,
অদৃশ্য যা যায় না দেখা,
কিসে হয় তার লেখাজোখা,
জাত-জুয়াড়ি খেলছে যারা কি প্রমাণ করিল তারে ॥
জগন্নাথে দেখ যেয়ে জাতির আছে কি বিচার,
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চামার-মুচি সবে দেখি একাকার,
চণ্ডালের অন্ন ব্রাহ্মণ খেল
তাইরি প্রভু দেখা দিল,
শাস্ত্রমতে শোনা গেল জাতি থাকে কি প্রকারে ॥
মক্কা-মন্দির গির্জা ঘরে জাতির আছে কি প্রমাণ,
আরফাতের মাঠে মন্দির-মঠে জাত বলে কে কারে শুধান,
ঐশী প্রেমে হয়ে মত্ত,
সবে ভাবে একাত্ম,

ছোট মনের কাজ নয়তো জাত–অজাত যে সঙ্গ করে॥
আসবার সময় কি জাত ছিলে কি জাত হবা মলে,
ছেঁউড়িয়ার সাঁই দরবেশ লালন এই কথা পদে বলে,
খোদা বকশ বলে আমার নাই জাত,
দরবেশ শুকচাঁদ শাহ দেখিয়েছে পথ,
নাইকো মোটে বাদ–বিসম্বাদ আছি পবনকে একসঙ্গে করে॥

পারাপার

১৪

সামনে ত্রিমোহনার খাল
ঘটালো জঞ্জাল হইল বিফল,
কি করি উপায়॥
একা আছি বসে, ভেবে না পাই দিশে,
পার হবো কিসে,
ঘাটে মাঝি নাই॥
তপ্ত হেম সম ভানুর বরণ,
দেশান্তরে যেন করিছে গমন,
বহিছে সন্ধ্যা–সমীরণ, নির্মল পবন,
যে স্বদেশে গমন করিছে সবায়॥
ঘাটেতে রয়েছে বহু আবর্জনা,
কলমি দামদল আরো টুপাপানা,
তটেতে বসিয়ে করি ভাবাগনা,
হাইল বৈঠা নিয়ে দাঁড়ি–মাল্লারা সবায়॥
তার দুই দিক আছে দুই দমদমা,
উলুকেশে সীতারাণী হয়েছে জমা,
যার গুরু কৃপা হয়, নাই সাপ বিচ্ছুর ভয়,
রয়েছে সদানন্দ মনে সদায়॥
তার পশ্চিমে আছে এক সেতু নিরূপণ,
পার হয়ে যায় যার আছে এক মন,
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর বচন, বকশ ভাব মন,
ভবপারে যেতে হবে রে নিশ্চয়॥

১৫

মন কি ভবপারে যাবে॥
ঘাটের মাঝি ঠিক না করে
সাজ–সজ্জাতে কাল্ কাটাবে॥

অথায় নদী বৈতরণী
ভাঙ্গা তোমার তরীখানি,
কূলেতে রাই–ভাটার পানি,
নামলে বসন ভিজে যাবে॥
বোঝায় তরী চল্লিশ হাজার মণ,
মাঝি তমিজদ্দী নয় তো সুজন,
উঠেছে উতলা পবন, মহাজন
আক্কেল আলী আর কি করিবে॥
সামনে ত্রিমোহনার খাল,
ঠিকানা পেলেও ঘটবে জঞ্জাল,
সেথা আছে এক মহাকাল,
মাঝিমাল্লা সব তলাবে॥
জয় বদরগাজী বলে চড়লে নৌকায়,
সাধু–গুরু হবে তাহার সহায়,
সাঁইজীর কৃপায় দীন বকশ কয়,
ঘাট–মহাজন দেখতে পাবে॥

১৬

ডুবলো তরী মেঘনা দরিয়ায়॥
কালো মেঘ লেগে তোর নয়ন কোণায়॥
সেই নদীতে উঠছে বিষম ঢেউ,
আকর্ষণে গলুই খসে তড়কা–তুফান ঐ
কত মহাজন হয়ে অচেতন
ধনে–প্রাণে মারা যায়॥
গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা তিন নদী
রাই–ভাটাতে পড়ে কেহ ঘোরে জন্মাবধি,
সেথা কামট কুম্ভীর হয়ে অস্থির
মাঝিমাল্লা ধরে খায়॥
সেই নদীতে মাস অন্তে হয় জোয়ারভাটা
শামুক–শিয়ালা যায় গো ভেসে আরো নেকড়েকাঁটা,
সাঁই বকশ বলে কোন্ যোগে নামলে
বার–দুয়ারে পারে যায়॥

১৭

নদীর তীরে বেড়াই ঘুরে॥
ভাবি কি করে যাব ওপারে॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
ঘাটে তরী না ভিড়িল
উপায় আর কি করি বল
পড়ে ভব ঘোর-সাগরে॥
একা আমি আছি বসে
তুফান দেখে না পাই দিশে
কার কাছে নিই পরামিশে
কেবল বসে দিনটা কেটে যায় রে॥
নদীতে এসেছে জোয়ার
ভেসে গেল ডাঙ্গা-ডহর
কেমনে হইব যে পার
কে আছে কারে সুধাই রে॥
যদি মনমাঝিটার সঙ্গ নিতাম
তবে তরী পাড়ি দিতাম
উড়ায়ে পালের বাদাম
দীন বকশর শুনাম হতে পারে॥

স্বভাব

১৮

থাকিতে স্বভাব হবে না সে ভাব
যে ভাবেতে লাভ হয় নিরঞ্জনে॥
হইলে সুভাব যাইবে অভাব
নিত্য নতুন ভাব দেখবি নয়নে॥
যদি কেহ সাধুর দ্বারে থেকে নিত্য প্রসাদ খায়
মার্জার মুষিকের স্বভাব নাহি যায়
সম্মুখে যা পায়, কেটে করে ক্ষয়
দেবাদেবীর আসন গজাননে॥
দেবদেবীর ভোগ যদি কেউ দেয়
বিড়ালের ইচ্ছা তায় তুলে খায়
শেষেতে কি হয় ভাবে না কোথায়
মুখছুঁ্যাচা খায় তাই সবখানে॥
লোভেতে পাপ হয়, পাপেতে মরণ
একথা সে ভাবে না কখন
সদা-সর্বক্ষণ লোভী তার মন
ফাঁক খোঁজে কখন উচ্ছিষ্ট কারণে॥

ভাগ্যক্রমে কেউ বৃন্দাবনে যায়
শ্রীরাধা রাণীর কৃপায় বেঁচে বাহি রয়
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর বচন, বকশ ভাব মন
সেই জীব এখন রাখি কোনখানে॥

১৯

সাজিয়ে যোগী হয়েছ ভুগী
রোগী হয়ে তাই থাক সর্বক্ষণ॥
যদি হতে ত্যাগী গুরু অনুরাগী,
তবে বুঝি সার হইত সাধন॥
প্রবঞ্চনা কণ্ঠক সর্ব অঙ্গে ঘেরা
মুখে আছে সদা মিষ্ট কথা ভরা
অন্তরে গ্লানি সাজগোছ পরা
ফাঁক খোঁজো কাকে ঠকাবে কখন॥
হাদিস-দলিল দিয়ে লোকেরে বুঝায়
নিজেকে সংশোধন করিতে না চায়
স্কন্ধে আউড়ায় লম্বা ঝুলি
চেনে না সে কখনো গুরু সে কি ধন॥
গুরু-ব্রহ্মা যদি জানিত সে জন
অন্যকে বলতো না মিথ্যা সে বচন
গুরু সর্বময় দেখিত সদায়
সাধুসঙ্গে তাই থাকিত মগন॥
মানব-গুরু যদি ভজিবারে চাও
কুচরিত্র ছেড়ে সুপবিত্র হও
অধীন বকশ বলে গুরু ফাঁকি দিলে
জাহেল ব'লে তারে ডাকে ভক্তগণ॥

২০

ভবের খুঁটো পুতবো কত॥
খুঁটো যতোই পুতি, ততোই ভাঙ্গে
সামলা এঁড়ে মেরে গুঁতো॥
আঙিনাতে বৃক্ষ লাগায়
সাধুগুরুর সেবার আশায়
দুষ্ট অজা দেয় গো সাজা
মেরে মজা মনের মতো॥

এক ঘরেতে বসত করি
কার কিভাব তা বুঝতে নারি
ত্যাগী ভোগী রোগী যোগী
মস্তান পাগল কত শত ॥
আমি বলি এক হয়ে থাক্
কেউ মানে না আমার সে বাক্
ক্ষুধা পেলে যায় সব ভুলে
মুখে বলে যা আসে তো ॥
খোদা বকশ বলে ধরগা এটে
হাতে নি গা মুগুর খেটে
হয় থাকবি নয় যাবি উঠে
কোরবানের নাই বুদ্ধি ততো ॥

২১

সারাকাল মলাম খেটে পিঠে–পেটে
তবু কারো মন পেলাম না ॥
হয়েছি ভবের মুটে এই ললাটে
বিধির এ সব কি ঘটনা ॥
নীন, শাঁড়াশী, হাতুড় তিনজন হয়ে এক মন
আমি একজন করি ভাবনা।
হেতেনে বাতাস টেনে হাপর আগুনে
গড়ি গড়ন এই কয় জনা ॥
নীন পেনেটে ধারটি ভাল শোনা গেল
তাতে আর ভাই রেত লাগে না।
বেহুঁশারে ইটে মেরে মোটের পরে
যেন গড়নটা ভেঙ্গে ফেল না ॥
খরিদ্দারের বিষম ভ্যাজাল কাটাচ্ছি কাল
লোহা–কয়লা তাও মেলে না।
নাইকো মোর ঘটি–কম্বল বিনা সম্বল
পথের পথিক তাও হলো না ॥
গুরুজীর মহত কৃপায় আছি সদায়
ভালো–মন্দ তাও জানি না।
দীন বকশ বলে মূল ভক্তি থাকলে
পবন তোর আর নাই ভাবনা ॥

ব্যক্তিজীবন ও সংসার

২২

কত যে ক্ষুধার জ্বালা সই দু–বেলা
থাকি সবুর নামের সাহায্যেতে ॥
সবুরে মেওয়া ফলে সবে বলে
দেখবো এবার কি হয় তাতে ॥
ভবের পর খেটে মলাম, কত খেলাম
পেট ভরে না থাকে তাতে,
বস্তাটির তলা ফাঁসা, যায় না কসা
বোঝায় করি দুই–তিন বেলাতে ॥
কত ভোগ–মহোৎসব খেলাম, তীর্থে গেলাম
শিরণী–খানা সাধুসঙ্গেতে,
দধি–দুগ্ধ মাখন–ছানা মিহিদানা
কোর্মা পোলাও বিরাণীতে ॥
রাত্রদিন গুদাম ভরি ভাত তরকারী
ঝাঁটিয়ে নেয় সকাল বেলাতে,
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর ক'রে স্মরণ
দীন বকশের মনন
থাকি সদা নাম–সুধাতে ॥

২৩

ভিটের উপর লাগিয়ে কচু ভাবছি কিছু
কিছু হবে কিনা হবে তাতে ॥
পোয়া সব উঠছে ফেঁড়ে দিচ্ছি পেড়ে
কোদাল মাটির সাহায্যেতে ॥
হলো ভাই কি শোভাকর, গাছের বাহার
সবুজের এই ময়দানেতে,
কাল মেঘ কেতুকি বৃক্ষ করে দুঃখ
তারাও লাজ পায় সেই শোভাতে ॥
একবার দিলাম মাটিয়ে খেটেখুটে
কেটেকুটে গেল তাতে,
পড়িছে বিষম গরম হয় কি মরণ
হলো মিলন মাটি আর গায়ের ঘামেতে ॥
দেখে তার পাতার বরণ সাধু–সদজন
বলে পয়সা কিছু হবে এতে,
সর্বদা মহত–বাক্য ক'রে ঐক্য
দীন বকশ রয় কর্মক্ষেতে ॥

২৪

বন্ধু তোমার জ্বালায় যাইব কোথায়
তোমায় খুঁজে বেড়াই দেশ-বিদেশে।।
বারো মাস সাতবার আসে বারেবার
ঈদ-পূজা পার্বন,
ঘোরে তার ভিতর
আজ তুমি নাই সব দেখি শূন্যময়
শুধু নয়নের জল বরষে।।
কতজনার বন্ধু পরবাসে যায়
ছুটি হলে ফিরে আসে
নতুবা চিঠিতে জানায়,
তুমি গেছ কতদূর ছিল বচন মধুর
আর কি আসিবা না এ দেশে।।
জীবন-যৌবন-ধন দিয়ে তোমায় ফিরিয়ে পেতাম
যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো সেখানে যেতাম
ছিল শক্তি বল তোমায় দিতাম যে সকল
ফিরিয়ে আনিতাম আপন বাসে।।
তুমি ও আমি মিলে ছিলাম একন্তর
দেশ-বিদেশ ঘুরিতাম কত জলসা মাঝার
দীন বকশ বলে হায়, তোমায় কোথা গেলে পাই
যেন দেখা পাই বিচারের শেষে।।

২৫

দেখলাম ঘুরে ভবের পরে
কেবা আমি আমার কি।।
ভাবি বসে হিসাব কসে
ওয়াশীল নাই সব বাকি।।
যখন আমি করি কামাই
সবে বলে আমায় আমায়,
দারা সূত পুত্র-কন্যার
ঐ রসে মজে থাকি।।
যখন দম ফুরায়ে গেল
কেবা কোথায় পালাইল
শেষের দিনে কেউ না হলো
বন্ধু-বান্ধবি সব ফাঁকি।।

মরা লাশ রয় তক্তপোশে
জমি মালের হিসাব কসে
কে কি নেবে নাই তার দিশে
কেউ ভাবে না তার হবে কি।।
কারে বলি আপন আপন
সবাই হয় সে নিশির স্বপন
কবর খোড়ার হয় আয়োজন
কাফনের দাম রয় বাকি।।
ত্রিশ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে
কিছু নাহি চোখে দেখে
দীন বকশ তাই বলে দুঃখে
হাসরের দিন হবে কি।।

২৬

দেখলাম কি সুন্দর গোল, বাধাইলো গোল
মাপের কম্পাস পেল কোথায়।।
বলিহারী সেই মিস্ত্রী, কোথায় থাকে
কে জানতে পায়।।
পৃথিবী হয় গোলাকার, কমলা লেবুর আকার
আপেল ফল গোল দেখায় বাহার
শ্রীফলটি গোল, বরই তাল গোল
টমেটো গোল তার অম্বল খায়।।
কদম্ব পুষ্প সে গোল গ্যাঁদা ফুল গোল
চন্দ্রমল্লিক গোলাকার দেখায় শশী গোল
দিবাকর গোল ঘুরছে সকল
ভূগোল তার প্রমাণ দেখায়।।
গুরুশিষ্য বেধেছে গোল নাইকো সম্বল
গোলেমালে দিন কেটে যায়
খেলার মাঠের বল্‌টি সে গোল
নিয়ে পাগল গোলের দিকে সব নিতে চায়।।
পিতাপুত্র বেধেছে গোল, ভায়ে ভায়ে গোল
দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীতে গোল দেখা যায়,
গোলপাতার ছায়ার নিচে থাকি বসে
সাধুর হাটে সেই গোল উদয়।।
আগেকার টাকাটা গোল, আধুলি গোল,
সিকি পয়সা আধলা গোল হয়,
দীন বকশ বলে এই সব গোলে
দীনের ইমান দীনে নষ্ট হয়।।

২৭

বলবো কি ভাই মনের মরম লাগিয়ে কদম,
করবো বিশ্রাম তাহার ছায়ায়।।
নব দিবাকর উঠে লাগে বটে
সেই গাছের পাতার ছায়ায়।।
রেখেছি যত্ন করে ঘিরে-ঘেরে
রাস্তার ধারে ভাবি যে তাই,
কি কখন বাধিয়ে গাড়ি ফেলে পাড়ি
লক্ষ্য রাখি সদা-সর্বদায়।।
দেখা যায় গাছের বাহার কি চমৎকার,
নবপল্লব আর সে ডোগায়,
শ্যামলের ময়দানেতে আর শাখাতে
রবি-শশী কিরণ দেয়।।
তেরো শ পঁচাশি সাল এক বুধের বৈকাল
অকাল-সকাল আছে যে তাই
মনেতে করে যুক্তি করি উক্তি
শুভযোগে গাছটি লাগায়।।
কোন্ দিন ফুটিবে ফুল, রাখি সেই উল
ভ্রমর বুলবুল বসিবে তাই,
বকশ কয় শোন্‌রে আজিম হলে খাদিম
তবে বসবি বৃক্ষের ছায়ায়।।

২৮

হলো রে সন আখেরি ভেবে মরি
কি করি তার নাই ঠিকানা।।
কিস্তি সব খেলাপ হলো, বাকি পলো,
জমিদারের মাল-খাজনা।।
যদি জমি আবাদ করতাম, ফসল পেতাম
রোকড়ে বাকি পড়তো না,
পাপরূপ খাস হয়ে উল্লাস, করে বিনাশ
সাধের জমি আর বীজ ফোটে না।।
হলাম এক আলসে চাষা তলা ফাঁসা
ধর্ম হাল তো জুড়িলাম না,
এখন আদা কেশে উঠছে ভেসে
নিড়িন ঠেসে কূল পেলাম না।।

বর্ষণ হলে ভক্তিবারি, আহা মরি
সাধের জমি ফলতো সোনা,
মুর্শিদের বাক্য কেটে পড়ে মাঠে
দীন বকশ রটে জমির জো চিনলাম না।।

২৯

পেতে এক কামারশালা এই দো-চালা
থাকি খরিদদারের হুকুমেতে।।
যখন যা করে হুকুম, করি সেই কাম
কত মান-অপমান হই তাহাতে।।
বামে ব্রহ্মা, ডাইনে গঙ্গা
সামনে শিব এই তিনজনে,
মন-পবনের সহায্যেতে নিজ হাতে
করি কর্ম এক মনেতে।।
ফাল, খোন্তা, কোদাল পোড়ায় আর দা গড়ায়
নিড়ান কাঁচি বারশুয়েতে
হেসো আর গাছকাটা দা
করি বিষদ সোহাগার সাহায্যেতে।।
কর্মকার নাম ধরেছি সব ছেড়েছি,
পড়ে আছি জাঁহাপুরেতে
বকশ কয় শোন রে পবন অমূল্য ধন,
পাবি সাধুর শ্রীচরণেতে।।

প্রেম ও রাধাকৃষ্ণ

৩০

প্রেম কি ভাই সহজে মেলে।।
সে প্রেম হয় না স্বভাব না ছাড়িলে।।
কুস্বভাব হইলে আশ্রয়
সে প্রেম কাঁচের বাসনের ন্যায়
সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায়
জন্মাবধি জোড় না মেলে।।
সুজনার প্রেম কাঁচা সোনা
ভেঙ্গেও তো কভু ছোড়ে না
মৃণালের সুত যেমন দেখ না
যোগাযোগ সে রয় কমলে।।

চণ্ডিদাস আর রজকিনী
বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি
তারাই প্রেম করেছে শুনি
বকশর কেবল মুখে বলা।।

৩১

করিয়ে শুভযাত্রা যাও মথুরা
আবার কবে আসবা ফিরে।।
ছাড়িয়ে দ্বাদশ রাখাল আর গরুর পাল
চললে তুমি ধীরে ধীরে।।
যমুনা পার হয়ে যাবা রাজা হবা
পাত্রমিত্র সঙ্গে করে,
পাবা সোনার সিংহাসন দাসদাসিগণ
রাজ্যটা বেশ দেখবা ঘুরে।।
বিশ্বশ্রবা মুনির কন্যে কুব্জা নাম হলো এখানে
বহু সাধনা করে পায় তোমারে,
সে তো মালা দিয়ে করবে বরণ ধরবে চরণ
থাকবা দুদিন তাহার ঘরে।।
আমরা সব বৃন্দাবনবাসী হই উদাসী
কেবল মাত্র তোমার তরে
ফিরে এসে দিও দেখা প্রাণ সখা
বকশ কয় তাই বিনয় করে।।

৩২

কি অপরূপ দেখলাম দুই নয়নে।।
নব দিবাকর আভা যেন তার বদনে।।
ললাটেতে পূর্ণ শশী
ভূতলে পড়িছে খসি
লোচনে কাজলের আভা
কেশে মালা দোলে সখনে।।
তিলফুল নাসিকাখানি
বলবো কি তার গুণ বাখানী
ওষ্ঠ অধর কি শোভাকর
সদ্য গোলাপ ফোঁটে আননে।।
শুভ্র দন্ত মধুর হাসি
ঝরিছে ফুল রাশিরাশি
বকশ কয় আর বলবো কি বেশি
চপলা খেলে মেঘের কোণে।।

৩৩

এসো এসো ও প্রাণবন্ধু।।
আমার হৃদয়ের ধন ও জীবনের জীবন
তুমি মোর কৃপাসিন্ধু।।
তোমার লেখায় লিখি আমি,
তোমার পড়ায় পড়ি শুনি
আমার যা কিছু ধন করি সমর্পণ
দিও সে প্রেম এক বিন্দু।।
তুমি না আসিলে পরে
কেমন করে থাকবো ঘরে
আমার দুই নয়নে বারি ঝরে
তোমা বই যে হই অন্ধ।।
আসবো বলে আশা দিলে
কোন্‌খানে লুকায়ে রইলে
চাতকের প্রায় চেয়ে থাকি
তব মুখ উজল ইন্দু।।

৩৪

যাহার কারণ নিশি জাগি অকারণ
কেমনে নিবারণ হয় বেদনা।।
শয্যাতে খুজি আছ তুমি বুঝি
না পেয়ে কেবল বাড়ে যাতনা।।
তোমার আশার আশে থাকি পরবাসে
বিরহ যাতনা আর সহে না,
যদি তোমায় পেতাম, মন-প্রাণ জুড়াতাম
পেতাম আমি সান্ত্বনা।।
এ নিঝুম রাতে ঘুম নাহি আঁখি পাতে,
হাত দিয়ে মাথে করি ভাবনা,
থেকো তুমি সুখে বলবো আর কাকে
আমার ভাবনা যেন কভু ভেব না।।
তোমায় না পাওয়ার ফলে সদা অঙ্গ জ্বলে
জলে কি মন-কমলে শান্তি মেলে না,
যাহা কিছু দিয়াছি কেবল চেয়ে আছি
বকশের একবার চেয়ে দেখ না।।

৩৫

সে যে আমার মন নিল কাড়িয়া॥
নীলাম্বরী শাড়ি পরি আছে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া॥
সদ্য স্বর্গের অপ্সরী
মন উদাসী মুচকি হাসি গো,
কার স্মরণে আছে যে সে
না পাই কিছু ভাবিয়া॥
ওড়না সাথে চলে পথে
কথা কয় না কারো সাথে গো,
পারিষদগণ আছে সাথে
দেখছে ঘুরি-ফিরিয়া॥
মনোহরার মনো হরে
কি ভাব কে তা বলতে পারে গো,
কুরঙ্গিনী পুরঙ্গিনী নয়নি সে যে,
কারে ফেরে খুঁজিয়া॥

৩৬

ও রাই, যাত্রা করি যাই মথুরায়
আনন্দে দাও বিদায়॥
আবার আমি আসবো ফিরে
তাতে কোনো নাই সংশয়॥
রাই তোমার নিকট আছি বাঁধা
দাসখতে নাম লিখি দেখ না,
তোমা বই অন্য জানি না
বাঁধা আছি প্রেম-ঋণের দায়॥
যুগ-যুগান্তর সাধন করে
চেয়েছিল কুব্জা আমারে
তার আশা পুরাবার তরে
তাইতে দু-দিন যমুনা পার যায়॥
সখাসখি আর রাখালগণ
সুখে শান্তিতে থেকো সর্বক্ষণ
কয়দিন হবো মথুরার রাজন
প্রজা পালন করবো তাই॥
আমি তিলার্ধ বৃন্দাবন ছাড়া নাই
এই প্রতিজ্ঞা করেছি তাই
আমায় যে যা ভাবে তাই দেখতে পায়
দীন বকশ তাই কয়॥

৩৭

মন-মালঞ্চে ফুটেছে যে ফুল॥
মল্লিকা মালতীর গন্ধে মন-প্রাণ করে আকুল॥
ফুটেছে বকুল বেলী
কি শোভা করে শিমুলী গো,
গন্ধরাজ আর চন্দ্রমল্লিকা
দেখে মত্ত অলিকুল॥
গোলক পুলকিত সদা
উদ্ভবে বাসন্তী গাঁদা গো
গোলাপ ফোটে আধা আধা
জলে ফুটেছে রক্তকমল॥
বসন্তের প্রথম নিশিথে
বসিয়ে প্রেম কাননেতে গো
বিনা সুতার মালা গেঁথে
শেফালী চাঁপা আকুল॥

৩৮

আমি সাধ ক'রে কি বাজাই বাঁশি
ব'লে রাধার নাম॥
সে যে আমার সর্বস্বধন
শত গুণের গুণধাম॥
সে বিনে মোর জনম বৃথা
জানিনে যে আর অন্যথা,
সে জানে মোর মনের কথা
তাই ভুলে থাকি মুদাম॥
সে যে আমার প্রেমের ধনী
আমি হই তার কাছে ঋণী,
রাই বিনে অন্য না জানি
তাই বৃন্দাবন এলাম॥
নিধুবনে শ্রীরাধার জন্যে
কালীরূপ ধরি সেখানে
আয়ানের মন ভুলাইতে
নিজরূপ বদলাইলাম॥

৩৯

প্রভাতে হেরিনু চাঁদবদন।
মৃদুমন্দ আনন্দেতে বহিছে তাই সমীরণ॥

স্বচ্ছ মনে এলো রূপসী
কোন্ অজানায় ছিল যে সে প্রেমের পিয়াসী
এলোকেশী মধুর হাসি
হরে নিলো আমার মনপ্রাণ॥
নীলাম্বরী শাড়ি করে পরিধান
শান্ত শ্যামল হেরি কোমল লোচন
ভালে নব দিবাকর আভাস হলো
অপরূপা সেই কিরণ-দর্শন॥
ভাবি সদ্য স্বর্গের অপ্সরী
সুকোমল চরণে চলে রাসবিহারী
লেগে ভোরের বাতাস মনপ্রাণ উল্লাস
দীনহীনের পরশ রতন॥

৪০

তুমি হও মন-মোহিনী রূপের খনি
হেসে দেখা দেও না এসে।
সকল ছেড়ে আছি পড়ে
কেবল তোমারি উদ্দেশে॥
কবে হবে সেই শুভদিন, যাবে কুদিন
দেখবে সে রূপ নয়ন ভরে,
সে তো সকল যন্ত্রণা আনাগোনা
রাখতাম ধরে নয়ন পাশে॥
দিয়ে মন-পুষ্পবারি ধোয়াতাম তারি
সরল সুঠাম তনুটারে
মিছে কাজে বেলা গেল, দিন ফুরাইল
না জানি হবে কি শেষে॥
দিয়ে তোমার রূপের কিরণ, তরুণ তপন
ফুটাও পদ্ম হৃদ-সরোবরে,
দেখে সে রূপ-রতন থাকবো মগন
দীন বকশর এই প্রেম-আবেশে॥

বিচ্ছেদ

৪১

সুন্দর তোমার মুখের হাঁসি রে
বন্ধু, সুন্দর তোমার বাঁশি॥
সুরেতে প্রাণ পাগল করে রে
বন্ধু, মন হয় উদাসী॥

জীবনের জীবন তুমি দেহের পূর্ণ শশী
কি দিয়ে আর বাসবো ভাল রে
বন্ধু, হয়ে আমি পরবাসী॥
ইচ্ছা হয় না গৃহকাজে
একবার যাই আর আসি
তোমার দেখার আশে দেশ-বিদেশে রে
বন্ধু, ফিরি দিবানিশি॥
দিও দেখা প্রাণ-সখা,
নির্জনতে আসি,
দীন বকশ বলে হৃদ-কমলে রে
বন্ধু, থেকো পাশাপাশি॥

৪২

আর কত দিন রইব বন্ধু, পথের দিকে চাইয়া॥
আশায় আশায় দিন ফুরালো শূন্য হৃদয় লইয়া॥
তোমার লাগিয়া দিলাম কুলমান ছাড়িয়া
পথে-ঘাটে ফিরি আমি পাগলিনী হইয়া,
কথা কইতে নারি রইতে নারি
দেখা দাও আসিয়া॥
কার কাছে কই মনের কথা এমন ব্যথার ব্যথিত নাই,
মন-আগুনে তোমার জন্যে পুড়ে হলাম ছাই,
তোমার সরল বদন স্নেহের কিরণ
দিও মোর আঙিনায় আসিয়া॥
দালান-কোঠা চাই না আমি চাই কেবল তোমায়,
নিরাশ হয়ে বসে থাকি সাধের আমতলায়,
অধীন বকশ বলে জলে গেলে
এসো উজান স্রোতে বাইয়া॥

৪৩

খুঁজে তোমায় পাইনে দেখা প্রাণ-সখা
মাঝে মাঝে লুকাও কোথায়॥
আমার এই অন্ধ নয়ন কুপথে ভ্রমণ
তাইতে দেখা পাইনে তোমায়॥
ঘন-সৌদামিনী যেমন খেলে তেমন
নবীন মেঘের কোলে সদায়

যার আছে দিব্যনয়ন পায় দরশন
তুমি যার হয়েছ সদয়॥
তব নাম কল্পতরু জগতগুরু
থাকো তুমি সর্বজায়গায়
যে তোমার মনের মতন করে যতন
রাখো তারে ছায়ায়॥
নাইকো মোর ঘটি কম্বল, বিনা সম্বল
দেশ-বিদেশে ঘুরি সদায়,
বকশ কয় দিন অবশান করি সন্ধান
নিদান কালে দিও আশ্রয়॥

৪৪

মনের মানুষ না পাই আর খুঁজিয়া॥
আমারে যে রইলে ভুলে কোন দেশে যাইয়া॥
বিচ্ছেদ আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
কে দেখবে আসিয়া
দুই নয়নে ঝরে পানি ভাটুই নদী দিয়া॥
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে
জলে তো নিভে না,
সম ব্যথার ব্যথিত না হইলে কারে কই বুঝাইয়া॥
পথের দিকে চায়া থাকি
তুমি আসবে কোন্ দিক হয়া,
আশার আশে দিন ফুরালো তোমায় না পাইয়া॥
বলতাম কথা নির্জনেতে
মন-প্রাণ খুলিয়া
এখন সময় দেয় না আমায় বিধি বিমুখ হইয়া॥

৪৫

মন-আগুনে বন পুড়ে যায়
কে দেখবে আসিয়া॥
জলে তো নেভেনা আগুন
দ্বিগুণ ওঠে জ্বলিয়া॥
তীরবিঁধা হরিণের মতো
ছুটে বেড়াই অবিরত গো,

বিষে অঙ্গ জ্বরজ্বর
কারে কই বুঝাইয়া॥
দংশিল গোক্ষুরা ফণী
নামে না বিষ প্রাণ সজনী গো,
প্রাণ যাইবার আগে যেন
একবার যাইও দেখা দিয়া॥
কি করিব কোথা যাব
কোথা যেয়ে প্রাণ জুড়াবো গো,
ব্যথায় ব্যথিত না হইলে
কারে কইবো কথা খুলিয়া॥

৪৬

আজ নিশি ভোরে আমার প্রাণ-বন্ধুরে
দেখেছি স্বপন॥
বন্ধু যেন দূর হতে হেথা
করেছে আগমন॥
সুচাচর কেশ কৈশোর বয়েস
মোর কাছে বসে কত করে সম্ভাষণ
বলে গা-তোল হে রাই, আর নিশি নাই
মেলে দেখ নয়ন॥
দেখলাম নিশির শেষে নিদ্রার আবেশে
হাসি মুখে কত বলে মধুর বচন
আমি তোমা ছাড়া নাই জানিও নিশ্চয়
থাকবো যাবতজীবন॥
দেখলাম সুপ্রভাতে স্বীয় শয্যা হতে
কিবা অপরূপ দর্শন
কিছু বলিতে না পারি নিরখিয়া থাকি
ভাবাবেগে তাই করিলাম চুম্বন॥
কুসুমের হার কণ্ঠে দিলাম তার
বারবার করি নিরীক্ষণ
আবার যেন দেখি হইব তাই সুখী
দীনহীন বকশের নিবেদন॥

৪৭

কার জন্যে প্রাণ এমন করে
তোমরা কিছু জাঁনো নাকি॥

আমার বুকের ভিতর তুষের অনল
জ্বলছে অনল ধিকিধিকি।।
বাসন্তী রঙ শাড়ি পরে
মনোহরার মন হরে
লাল পাড়টি উপরে
জোড়া ভুরু দেখতে সরু
কুরঙ্গিনী নয়নি সে কি।।
সে যে আমার জীবনের জীবন
তার ভাবনা ভাবি আমি সদাসর্বক্ষণ
সে বিনে মোর নাই প্রয়োজন
তার প্রেমেতে মজে থাকি।।
নয়ন মুদলে দেখতে তারে পাই
মেললে নয়ন কোথায় হারাই
করি যে হায় হায়
ভাবি আমি তাই সর্বদায়
প্রেমে উসুল কিবা থাকবে বাকি।।

৪৮

তোরা কি তাই বুঝবি সখি
যে সুখেতে আমি আছি।।
কারো সনে কইনে কথা
মন-আগুনে জ্বলিতেছি।।
প্রাণ-পাখি খাঁচা ছেড়ে যায়
খুঁজিয়া না পাই কি করি উপায়
শূন্য খাঁচা পড়ে আছে
তারে পেলে প্রাণে বাঁচি।।
গিয়াছে যে মাথার মণি
যে ধনেতে ছিলাম ধনী, খুঁজে তা মেলে নি
আমি কি যে ছিলাম কি যে হলাম
সর্বদাই তাই ভাবিতেছি।।
দুঃখের কথা কার বা কাছে কই
ধিকিধিকি জ্বলছে অনল, কেমন করে সই
সে বিনে মোর নাই অন্যজন
তার জন্যেতে বেঁচে আছি।।

৪৯

আমার প্রাণবন্ধু চলে গেছে যে পথে
আমি যাবো সেই পথে।।
কারো শুনবো না মানা হেরবো কেলেসোনা,
কি হবে পরের কথাতে।।
যমুনা পার যাবো খুঁজিয়া দেখিবো
বন্ধু আছে কার বা বাসে,
তাঁকে সামনে পাইলে বাঁধিব আঁচলে
দাঁড়াবো না কোনো মতে।।
শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর
হরে মুণির মন তাতে
বরণ সুঠাম তিনি গুণধাম
ভুলেও পারিনে ভুলিতে।।
বিচ্ছেদ যাতনা সহে না সহে না
করি ভাবনা দিবানিশিথে,
কারো বলিতে না পারি গুমরিয়া মরি
বকশ বলে কাতর চিতে।।

৫০

কি গান শুনালি প্রাণের কোকিল রে
বসন্তেরই শেষে রে।।
মধুর সুরে ডাকিস কোকিল,
নবপল্লব বৃক্ষে বসে রে।।
তোর কুহু কুহু রব শুনিয়া
নয়নে জল আসে
শ্যামল বরণ ক'রে স্মরণ
থাকি ভাবাবেশে রে।।
মন-প্রাণ সব হরে নিল
তোরই কণ্ঠস্বরে
উদারা মুদারা তারা
বাজে সপ্ত সুরে রে।।
ভালো থেকো প্রাণের কোকিল
মালতী লতায় বসে,
তোমার মধুর সঙ্গীত শুনতে পাই যেন
প্রত্যহ প্রত্যুষে রে।।

৫১

তুমি আর কতদিন পরে আসবে ফিরে
ওহে রসিক রসময়॥
উদাস হয়ে থাকবো বসে
তোমারই আশায়॥
আমার ধ্যানের ছবি জ্ঞানের রবি
জেনেছি নিশ্চয়,
যাহা কিছু আপন ক'রে সমর্পণ
শুধু চেয়ে থাকবো তায়॥
ঐ রূপ না হেরিলে সদা অঙ্গ জ্বলে
করি কি উপায়,
উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে
ভাবি সদা সর্বদায়॥
চাঁদমুখের হাঁসি বড় ভালবাসি
শুভ্রবসনা তায়,
যদি দেখা পাই মন-প্রাণ জুড়াই
অধীন বকশ কয়॥

৫২

যার পোড়ে নাই এমন পোড়া
সে জানবে কি করে।
তুষের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
ধিকিধিকি অন্তরে॥
বন পোড়ে তা দেখে সবাই
মন-পোড়া কেউ দেখতে না পায়
যার পুড়ে যায় সেই জানতে পায়
অন্যে জানতে না পারে॥
প্রেমের পোড়া এমনি আগুন
জল দিলে সে বাড়ে দ্বিগুণ
হৃদ-মাঝারে সদাই গুণগুণ
দুই নয়ন ঝরে॥
দেহ পুড়ে হলো অঙ্গার
এ কথা আর বলবো বা কার
শিখা তার উঠছে অনিবার
দীনহীন বকশর অন্তরে॥

৫৩

আর কত সহিব যাতনা॥
বন্ধু আসি বলে চলে গেল
আর তো ফিরে এলো না॥
পথের দিকে চেয়ে থাকি চাতকেরই ন্যায়
নবঘন বারি বিনে প্রাণ যে রাখা দায়
কথা কইতে নারি রইতে নারি
সইতে নারি যন্ত্রণা॥
চাঁদমুখেতে মধুর হাসি
ঐরূপ দেখিতে আমি বড় ভালবাসি
তাইতে ঘুরেফিরে আসি
আর তো ভুলতে পারি না॥
সে যে আমার রূপের খনি
তার বিনে আর এ জীবনে অন্য না জানি
সে যে আমার আমি যে তার
দীন বকশর এই ভাবনা॥

৫৪

কতদিন দেখি নাই তোমার চাঁদবদনের হাসি।
দূর দেশেতে গেছ চলে বলে গেছ আসি॥
আর ডেকো না প্রাণের কোকিল মালতীলতায় বসি,
গুমারে ফুল ঝরে পড়ে কেবল দিবানিশি॥
থেকো থেকো সুখে থেকো প্রেমের পিয়াসী,
তোমার অমল বদন স্নেহের কিরণ দেখাও আজ প্রকাশি॥
অপরূপ সে রূপের ছবি বলবো কি আর বেশি,
যদি দেখা না পাই তারে গলে নেবো ফাঁসি॥

৫৫

আশার আশে চেয়ে আছি চাতকিনী হইয়া॥
কবে আসবে সেই প্রাণের মুরতি গো
ভাবছি তাই বসিয়া॥
মধুর মুরতি দেখাইয়া কোথায় লুকাইলে
পোড়া প্রাণটি জুড়াইতাম কেবল তোমায় দেখা পেলে
আমার দূরে যেত সকল যন্ত্রণা
কেবল তোমাকে সামনে পাইয়া॥

মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ পুড়ে হলাম ছাই
এমন ব্যথার ব্যথিত নাই যে আমার বন্ধুর কথা কয়
সে যে প্রেমের পাগল ভাবের সরল গো
আমি তারে আছি ছাড়িয়া।।
আর যে আমি সইতে নারি বিরহ যন্ত্রণা
নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করবো তোমায় না পাইয়া
দীন বকশ বলে হৃদ-কমলে গো
দেখা দিও আসিয়া।।

৫৬

আমি আর কি দেখা পাব তারে
যার জন্যে দুই নয়ন ঝরে।।
মণ-প্রাণ সব হরে নিয়েছে
যাবত জীবনের তরে।।
সে যে আমার হারানো মানিক
সযতনে কাছে রেখে দেখিতাম ক্ষণিক
কি দোষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে
গেছে চলে দেশান্তরে।।
কোথায় আছে যে সেই মোহন মুরতি
আর কিছু ভাল লাগে না পারিনে সইতি
আশার আশে এই বিদেশে
কেবল সদায় মরি ঘুরে।।
এবার তারে দেখা যদি পাই
মনের সাধে সাধ মিটিয়ে বসতাম এক জায়গায়
দূরে যেত সকল সংশয়
রাখতাম পুরে হৃদ-মাঝারে।।

৫৭

তুমি আবার এসো ও প্রাণ-বন্ধু
তোমার আসার আশে থাকবো বসে
পার হতে প্রেমসিন্ধু।।
শূন্য হেরি তোমা বই সকল
কিছু আর ভাল লাগে না বাধে গণ্ডগোল
হয়ে যায় সব আবোল-তাবোল,
হই চোখ থাকিতে জ্ঞানঅন্ধ।।

প্রাণের কোকিল যায় রে স্বদেশে
কতদিন পর আসবে ফিরে
ভেবে পাইনে তার দিশে,
থাকবো ভাবাবেশে
সদা সে রূপ চেয়ে একবিন্দু।।
ঝুমকো ফুলে আলোকিত
ঝুলছে মালতি লতায়
শান্তি থেকো প্রাণ বঁধুয়া
আনন্দে সদায়
থাকে না যেন কোনো সংশয়
বদন চন্দ্রবিন্দু।।

৫৮

আমার প্রাণবন্ধু কোন্‌দিন আসবে দেশে,
সদা থাকি সেই উদ্দেশে।।
নিশিতে ঘুমায়ে জাগি
সর্বক্ষণ রই ভাবাবেশে।।
যেদিন দেখবো সে চাঁদবদন
নানা জাতি ফুল তুলিয়ে করবো আয়োজন
বিনা সুতায় মালা গেঁথে
কণ্ঠে দেব প্রেমাবেশে।।
বেলী, বকুল, টগর, গোলাপ ফুল
রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ যাতে মত্ত অলিকুল
মল্লিকা, মালতী, জুঁথী
পরাবো তাই মন-উল্লাসে।।
সে যে আমার নির্মল জ্যোতি
অন্ধকারে করে আলো বিদ্যুৎ-আকৃতি
দীন বকশের যদি থাকে মতি
প্রেমানন্দে যাব ভেসে।।

৫৯

কার আশায় থাকবো বসে অবশেষে
পাইনে দিশে ভাবান্তরে।।
হারিয়ে শিরোমণি রূপের খানি,
দেখি অন্ধকারময় এ সংসারে।।

সে আমার নয়নতারা পারাহারা
হয়ে কেবল বেড়ায় ঘুরে
না দেখে সে চাঁদবদন সব অকারণ
ভাসি অশ্রুসিক্ত নয়ন-নীরে।।
তুমি নব দিবাকর হও যে উদয়
আমার অন্ধকার অন্তরে,
দেখে সে রূপের জ্যোতি দীন বকশের মতি
সদায় থাকে ঐ রূপ নিহারে।।

বাউল

৬০

সইলে সম্পত্তি নইলে বিপত্তি
খাটবে না আপত্তি বিচারের সময়।।
হইলে শুদ্ধ মতি তবে হবে ভক্তি
এই উক্তি যুক্তিশাস্ত্রে শোনা যায়।।
না সইলে নাশ হয় শুনেছি শ্রবণে
বিধির বিধানে সাধু-গুরুর সনে
আনে নাহি জানে, কেহ কেহ মানে,
জেনেছে সন্ধানে সাধক সবায়।।
সবুরে শক্তি হইলে এই ভবে
ত্রিতাপ অনলে তারে নাহি ছোঁবে,
চিদানন্দ ভাবে, ভাবিবে এই ভবে,
দয়া করবেন তবে সেই দয়াময়।।
শুদ্ধভাবে থাকলে সাধু সহবাসে
শান্তি পাবে তবে সঙ্গ অবশেষে
অধীন বকশ ভাসে, গুরুকৃপা লেশে,
যাইবে অনাশে পরম আলয়।।

৬১

বাঞ্ছা কল্পতরু নাম ধরেছ
পুরাও মনের বাসনা।।
ঐ আশার আশে আছি বসে
আমায় কি চোখে দেখ না।।
থাকো বটে সর্বঘটে
দূরে কিংবা হও নিকটে

বেড়াও তুমি ছুটেছেটে
তোমায় সন্ধান করতে পারলাম না।।
যে যাহা কল্পনা করে
কৃপা করে পুরাও তারে
আমি কি তোমা হতে দূরে,
তাইতে কি দয়া হলো না।।
অপার এই ভবসিন্ধু
আমি যে হে দীনবন্ধু
দিয়ে তোমার কৃপাবিন্দু,
দীন বকশের কর সান্ত্বনা।।

৬২

ত্যাজ্য করে মনের বিকার
নিষ্ঠা দুধে পাতাবি দই।।
ব্রহ্মানলে জ্বাল্ দিয়ে তাই
উষ্ণ-গরম রাখতে হয়।।
অনুরাগ হাঁড়িতে যত্নে রেখে
ভক্তি সাজা দিবি তাতে,
প্রেমের বারি মিশাইয়ে
জ্ঞান-খড়েনে টান দিবি তায়।।
রসিক চূড়ামণির হাটে
বিকাইবি হেটে হেটে
অমূল্য ধন পাবি তাতে
যদি মনের বিকার যায়।।
মাখন, ছানা, ক্ষীর, সর, ননী
দুগ্ধ হইতে উৎপত্তি জানি,
মণ্ডা-মিঠাই সন্দেশখানি
দীন বকশর আছে একমন সই।।

৬৩

আষাঢ়ে উদাসী বন্ধুর মন।।
নবীন মেঘের ঘটা করে হচ্ছে ঝরঝর বরিষণ।।
সিক্ত পথে বন্ধু হেটে যায়,
টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে ওড়নাটি মাথায়,
সুকোমল চরণে চলে
যেন সে কমল-বদন।।

সুন্দর সুঠাম কলেবর
ফুলের আঘাত সইতে নারে শান্ত তনু তার,
শুভ্র বসন দিয়ে আবরণ
চলে নিয়ে মদন-মোহন।।
মৃগের মতন দুটি নয়ন তার
গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ে বলবো কি যে আর,
মুচকি হেসে চলে যে সে
দীন বকশের সেই নীলরতন।।

সমাজ ও সমকাল

৬৪

ধন্য সাত দোহা সন্ন্যাসী তলা।।
নবগঙ্গার কূলে এসে বটমূলে,
ল্যাংটা বাবার রথের মেলা।।
মনোহরার মন হরে পাগল করলো এই মাগুরা,
শাঁখা চুড়ি কণ্ঠহার কিনছে কুলের কুলবালা।।
মহারাজ জি সন্ন্যাসী ব্যানারসি আসন করলো কালিতলা
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে সামনে আছে সিদ্ধির ঝোলা।।
ধামা, কাঠা, বেতো পাথি,
গরু, ঘোড়া মেটে হাতী,
হাঁড়ি, কলসী, মালসা পাতি,
বারো ভাজার দেখি কিল্লা।।
সন্দেশ, মিঠাই আর দানাদার,
মজা পাই জিলাপি খাজার,
খোরমা কদমা আর দানাদার
দেখি স্যাকারিনের রসগোল্লা।।
ঊর্মিলার রাজ্য যেমন
রথের মেলা দেখি তেমন,
সুবাতি ফুলরাতি হয়ে
এক মন দিচ্ছে হুলু ছেড়ে গলা।।
সমাধিতে ল্যাংটা পাগলা
মন্দিরের ছাঁদ কেনো আগলা,
তাই বলছে বেহাল হয়ে বেহাল
থেমে থাকো বকশ পাগলা।।

৬৫

গোঁসাই ঘোলদাড়ি পাঁচু শাহ্‌র বাড়ি
লয়ে আঁচলা গুঁদড়ি গোপাল শাহ্‌র ঘর।।
সাধুগুরু সনে সবে তার মানে
অন্যে কি জানে সেই মহিমার।।
রূপি শাহ ফকিরাণী
সেই তো মহাজ্ঞানী,
আখড়ার মালিক তিনি হয়েছিল শুনি,
তার পুত্র খোকাই সাঁই, সদানন্দ ময়,
দামকুদর চর সমাধি তাহার।।
চার শত বারো সালের এক মসজিদ খাড়া রয়,
দক্ষিণ মন্দিরে হাজার প্রদীপ দেয়,
তার নিস্কর জমি ছিল, তেল-সলতে মিলিল,
তাহে প্রবল ছিল চৌধুরী জমিদার।।
এখন সেই আখড়ায় ঘরবাড়ি আর নাই,
নারকেল গাছ পড়ে মছে মারা যায়,
পরে কেরু কোম্পানী এলো, সেই জমি চষিলো,
আসনমান্য এখন কার।।
অম্বুবাচি যোগে হতো সাধুসঙ্গ
সাত দিন ধরে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ
অধীন বকশ কয় সেই আমবাগান আর নাই,
ওহে দয়াময় বসাও সাধুর সে বাজার।।

৬৬

দেশে এলো রে বিষম বালাই ঘর ছেড়ে পালায়।
কি করি আর কোথায় যাব ভেবে অন্ত নাহি পাই।।
তেরো শ তিরাশি সালে এক চৈত্রের বৈকালে
কোথা হতে ভালুক এসে ধরিল ছেলে,
কারু ঠ্যাংগের মাংস তুলে নিল শেষে হাসপাতালে যায়।।
খবর খুব শোনা গেল সে যে কি বালায় এলো,
কোলের শিশু ছাগল ভেড়া সব ধরে খেল,
দিনের বেলা যায় না দেখা, রাত্রে মানুষ ধরে খায়।।
শুনেছি ভালুক এসেছে ও ভাই আমাদের দেশে,
মেয়ে-পুরুষ ভেবে ম'ল রাত্রি অবশেষে,
পায়খানা আর পিসাপেতে ক্যাঁথা কাপড় নষ্ট হয়।।

রাত্রি বারোটার সময় ছেলে বলে যাব পায়খানায়
বাবা বলে, ধুত্তুরি ছায়, ঘটালি কি দায়,
তোমার মাকে বলো লম্প জ্বাল আমার যাইবার উপায় নাই॥
ফকির খোদা বকশ কয় এ তো কওয়ার কথা নয়,
পল্লিবাসী সবে বলে কি যেন কাল দেখা যায়,
সবায় হলো হতবুদ্ধি ইউনুস আলি সামাল চায়॥

৬৭

হলো মাঠের মাঝে একি মেলা।
হলো মল্লিকেশের লীলাখেলা॥
যেজন ভাবে ভক্তিভাবে
পিরের দয়া তাইরি হবে,
তার মনোবাঞ্ছা পুরাইবে
আনের কেবল মুখে বলা॥
তেঘরি আর খাড়াগোদা
গোষ্ঠবিহার হয় সে মেলা,
মাঠের নামটি মোকামতলা
প্রমাণ দিল হিদাতুল্লা॥
আম, কাঁঠাল,বরফ, সিরাপ, জল,
বিক্রি হচ্ছে আরো কত ফল,
মণ্ডা মিঠাই বরফি সকল
বিক্রি হচ্ছে ভাজাছোলা॥
ঘরের লক্ষ্মী কুলবালা
বটতলা করে উজালা,
তার সখীর সঙ্গে পরম রঙ্গে
কিনছে প্লাসটিকের মালা॥
চেয়ার, বেঞ্চি, টুল, টেবিল
বিক্রি হচ্ছে কপাট জানালা
শেষে নাগরদোলায় তুলে দিয়ে
জোরে মারছে ঠ্যালা॥
লাঠি সারকাস আর পুতুল নাচ
ফড়গুটি আর জুয়াখেলা,
নিঃসন্তান আর রোগের দায়ে
বটতলাতে মাখছে ধুলা॥
এই বিশ্বচরাচরে কেউ
আসছে কেউ যাচ্ছে ফিরে,
তাই বলছে বেহাল ধীরে ধীরে
আর বলো না বকশ পাগলা॥

৬৮

ভবের হাটে চলছে ছুটে বহু খরিদদার।
যত দোকানদার ধনী করিছে বিকিকিনি,
কেউ শুধু কানে শুনি ঘোরাফেরা সার॥
অভক্তিতে উঠলে হাটে
মন চলে যায় ঘাটে ঘাটে,
যদি কেউ দেখে শ্রীপাঠে
ভবে সেই ব্যবসাদার॥
কলা, পেঁপে, পটল, শশা,
কন্‌কা শাকের কি দুর্দশা
বিক্রি করলে হয় না পয়সা
শুধু হাটে আনা সার॥
চাউল কিনে হারাইল সম্বল
শেষে এলো পাকা কাঁঠাল,
লেবু, আনারস, পেয়ারা, কদবেল
কেনা হলো ভার॥
মাছ, মাংস, লাউ আর কুমড়া,
মজা দেয় বিলাতি আমড়া,
এই সব নিয়ে বাধায় ঝগড়া,
হাটে প্রাণ বাঁচানো ভার॥
ডুবে এলো হাটের বেলা
ফুরাইল সাধের খেলা,
দীন বকশ বলে দাও গা মেলা
সাধুর বাজার॥

৬৯

হলো পল্লি–উন্নয়ন আনন্দিত মন,
নিরূপণ করো হে এখন॥
সোনার বঙ্গভূমি কিছু নাইকো কমি,
যতনেতে তুমি কর সংস্কার॥
জন্মনিয়ন্ত্রণ আগে কর মন
তা নইলে রক্ষা পাবে না কখন,
বহু পুত্র হলে দুঃখী তারে বলে,
যাইবে বিফলে জনম তাহার॥
বারো ভাটি আছে এই বাংলা জুড়ে
খাঁটি সোনা তোলো লাঙ্গলেতে খুঁড়ে

তাহে ভক্তি কোদাল যোগাবে সম্বল
পাপ তৃণ্য-আদি কর পরিষ্কার॥
রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে এসেছে এবার
নায়ক-নায়িকা এই দুই প্রকার,
বুঝে না চলিলে পড়বি গান্ধারীর হালে
হতে শত ছেলে না পেল উদ্ধার॥
একতা বন্ধনে চালাও অভিযান
তবে তো পাইবে শান্তির সন্ধান,
অধীন বকশ বলে সংযমের বলে
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ হলে হয় সুখের সংসার॥

৭০

সোনার ফরিদপুর নিবাস রণগাজী বিশ্বাস,
করিল বিশ্বাস মা-খাকি আদম-তন॥
নামে ভরসা ঘরামি করিয়ে কায়েমী
গুরুরূপে তিনি ভজিলেন চরণ॥
ধান্যে পূর্ণ তার গোলাবাড়ি রয়
মাঝেসাজে সাধুসঙ্গ দিত তায়
পাড়ার খবর নিত, কেউ খেতো কিনা খেতো
করিত তদন্ত সদাসর্বক্ষণ॥
বৈরাগ্য যবে তাঁর হইল উদয়
খতের দিনা সব মাপ করে দেয়
যত দলিল-পত্র ছিল ইন্দারায় ফেলিলো
পুত্র নিজামকে বললো নালিশ করো না কখন॥
মন-আনন্দে তিনি করিলেন সন্ধান
বানাইব এক সখের বাগান
সৃষ্টি করলো গোলাকার
মাঝখানে তার করিল আসন॥
চতুর্দিকে তার তেঁতুল গাছে বেড়া
উত্তর কোণে গাব গাছ আর তালগাছ খাড়া
পরে আম-কাঁঠাল জামরুল নারিকেল
আরো ছফেদার ফল করিল রোপণ॥
অম্বুবাচি যোগে সাধুসঙ্গ দেয়
কাপড়ের কাণ্ডারী ঘিরে মাঝখানে রয়
একা তিনি ছিল পরে সুড়ঙ্গ দেখা গেল

আর একটা পানির বালতি ছিল
সাধুরা বলিলো এই বিবরণ॥
সমাধির চৌদিকে বকুলেতে ঘেরা
পূর্বদিকে আছে নয় হাত মুখী ইন্দারা
তার অতি মিষ্ট পানি বলবো কি বাখানি
ক'রে টানাটানি পান করে সর্বজন॥
পরীক্ষার কারণে দিতে গিয়ে থায়,
সাতখান বাঁশ জুড়ে কূল নাহি পায়
পরে স্বপ্নে দেখাইল, যদি করো এই সকল
সবংশে বল করিব নিধন॥
মহত পুত্র নিজামুদ্দিন হয়
তার পুত্র নাজিমুদ্দিন কয়
তার পুত্র সোনাল্য বিশ্বাস হয়
তিনার পুত্র আত্তাপ বিশ্বাস কয়
তিনার পুত্র আমজেদ আলী নিরূপণ॥
শ্রীপঞ্চমীর যোগে লেগে যায় মেলা
বাবাজীদের দেখি গাঁজা খাওয়া ঠেলা
সন্ধ্যা যখন হয় ভক্তিতে ভোগ দেয়
পরে শিরণী খেয়ে যায় যার যে নিকেতন॥
সাত শত ফকির ছিল এই গ্রামে বর্তমান
তাহার মাঝে পণ্ডিত বেহাল শাহ্ প্রধান
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর কৃপায় অধীন বকশ কয়
এই বাগানে উদয় হয় চাঁদের কিরণ॥

৭১

ধন্য জল শূন্য তের-শ বিরাশি সাল
মিছামিছি পবন-ব্যাটা ভেঙ্গে যায় পিয়ারার ডাল॥
শুভ বৈশাখ মাসে নব জলধর বর্ষে
জো পাইয়া বীজ বুনিলাম মনের উল্লাসে
মাঠের শোভা হলো কি শ্যামল
হলো কৃষকের মনের বল॥
জ্যৈষ্ঠ মাস এলো যে সময়
রবির তাপ অতি প্রখর হয়
আউশ ধান শুকায়ে গেল
পাটের মাথা ব্যাঁকা হয়
তাপে লাংলে নিড়িন বন্দ হলো
না হয় ক্যানাল কাট বান্ধ দল॥

পাড়ার মণ্ডলরা সবায়
যুক্তি করিলেন এক ঠাঁই
সবে মিলে এক সাথ হয়ে
চল অ-আ লেখতে যায়
বটের পাতা লিখলো কিছু বৃষ্টি হলো
কিন্তু ফললো নাকো কোনো ফল।।
পড়েছি দুর্ভাগ্য দশায়
আষাঢ়ে যে মেঘ দেখা যায়
বৃষ্টি হওয়ার আশা ছিল শেষে কুয়ো হয়ে যায়
এখন থোড় ধান শুকায়ে গেল
পেটের দায় খায় কাঁঠাল।।
এলো শ্রাবণের ধারা এখন ধানের কাজ সারা
দেখেশুনে ভেবে মলো চাষীরা
আমরা কি খেয়ে প্রাণ বাঁচাবো
অধীন বকশর ঘরেও নাই সম্বল।।

৭২

কি অসম্ভব দেখি দুই নয়নে।।
ব্যাঙ বেঁচে সব লাভ ক'রে যায় নিষ্ঠুর মানবগণে।।
যাতে হয় জীবনের হানি
তাই নিয়ে সব টানাটানি
হায় গো !
যারা খেয়ে বাঁচে মাটি পানি
তাদের জুলুম কেনে।।
বানাইয়ে চাক্ টুংগিজাল,
কাঁধে ছালা হাতে হেরিকল
হায় গো !
খুঁজে বেড়ায় বনজঙ্গল
অল্প জল যেখানে।।
সরোবর আর গেড়ে গর্তে
চলে তারা সেই সব পথে
হায় গো !
ব্যাঙ পেলে আনন্দের সাথে
ধরে অতি যতনে।।
বস্তায় পুরে মুখটি বাঁধা
কে দেখে ভাই তাদের কাঁদা
হায় গো !

বললে তো দোহাই মানে না
পয়সার কারণে।।
গুন্‌তি করে চালান্ দিল
সেখানে এক জল্লাদ এলো
হায় গো !
সব ব্যাঙের মাথা কাটিল
চালান দেয় ফরেনে।।
অধীন বকশ বলে হে পরওয়ার
এই ব্যাঙের কি হবে না বিচার,
হায় গো !
কণ্ঠে ছিল রাগিনী তার
তাই ভাবি নির্জনে।।

৭৩

সদানন্দ মনে সাথী-সঙ্গীসনে একতাবন্ধনে
চল অভিযানে।।
তাতে হইবে সুফল যাবে না বিফল
রং-বেরং ফল দেখবি নয়নে।।
উদয় নব দিবাকর রামদিয়া বাজার
সেথা আছে এক সুধী ব্যারিস্টার
দেখাশুনার ভার স্বপনের উপর
যন্ত্রপত্র তাঁর রাখে যতনে।।
বাজারে আছে যত দোকানদার
হিংসা দ্বেষ নাই সবে একাকার
আছে ইলেকট্রিক তার করে রাত্রি শোভাকর
ডাক্তার আবুবকর আছে দক্ষিণে।।
মহকুমা হতে এস. ডি. ও. এলো
ক্লাবের ভিত্তি স্থাপন করিল
সৎ লেকচার দিল কীর্তন শুনিল
চা পান করে গেল নিজ নিকেতনে।।
শনিবারে হেথায় লালনগীতি শেখায়
প্রথম ছাত্রী প্রতিভা নাম কয়
আকবর ও ছাত্তার কণ্ঠ ভাল
ইউনুস আলী ভাল রাজা হাসনের গানে।।
সমবেত হয়ে শিল্পিগণ সবায়
মন-আনন্দে যখন যন্ত্রে কণ্ঠ লাগায়
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর কৃপায় দীন বকশ কয়
মহানন্দে হয় ভূস্বর্গ উদয়।।

৭৪

হঠাৎ এক হাট বসেছে খেজুরতলার দক্ষিণে॥
খালি বাচড়ায় গাছ–গাছড়া নাই, কবিগান হয় সেইখানে॥
হাটের বেশ পরিপাটি
মাঝে পাটকাঠির টাঁটি
ঘর নাই তার খুটো পোতা সামনে স্কুলটি
বেঁধে ছাল্লা বাধায় পাল্লা
আবুলের কবিগানে॥
ঢোলে বড় ছক্কা দেয়
সে যে ঢুলি জ্যোতিষ মহাশয়
আলেম ফাজেল ফকির বোষ্টম বসে শোনে তাই
একতায় এই হাট বসেছে
হিংসাদ্বেষ নাই এখানে॥
হটের প্রধান তরকারি
বেগুন–মূলা ভড়ো কচু পালন খ্যাসারি
হাটে বারোভাজা দিচ্ছে মজা
আরো পিয়াজ রসুনে॥
তের শ তিরাশি সালে এক বুধের বৈকালে
মণ্ডলরা সব যুক্তি করে হাট বসাইলে
হাটে মুগ–মশুরি পান সুপারি
যা থাকে নেব কিনে॥
হাটের আশ্রয়ের কারণ একটি বৃক্ষ প্রয়োজন
তাই বুঝিয়ে বটের চারা করিল রোপণ
গ্রামে দীনু ফকির ছাড়ছে জিকির
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইজীর চরণে॥

৭৫

খাজাপির খানজাহান জাহানের জাহান
কর পরিত্রাণ দিয়ে শীতল চরণ॥
তোমার অপার করুণা কেউ দিতে নারে সীমা
জানাও মহিমা কাঙালের জীবন॥
পাপী–তাপী তোমার দরবারেতে আসি
মন–আনন্দে তারা হয় বড় খুশি
তুমি গরীবের নেওয়াজ
জানি জগত–মাঝ
ভক্ত–হৃদয় করহে আসন॥

জেন্দাপির, ঠাণ্ডা পির, গরম পির, পাগল পির সবায়
তোমার আঙিনার চৌদিকে তারা বর্ত রয়
তুমি মহীয়ান সবার সমান
তব ভাবে তারা ছিল যে মগন॥
বোগদাদ আজমীরে তোমার মহিমা
বাগেরহাট দীঘির পাড় গড়িলে সীমা
তোমার রওজা মোবারক
দেখিলে যায় শোক
ভক্তিভাবে যেজন ভাবে সর্বদায়॥
তোমার দীঘিতে ছয়টি কুম্ভীর সদা রয়
হাজতের খাসী মুরগী দিলে ধরে খায়
মুরশিদের কৃপায়
দীন বকশ কয়
মন–ফুলে করি সমাধি পূজন॥

৭৬

হেরি মসজিদ ষাটগম্বুজ, ভাবি হৃদয়–মাঝ
ওহে বেনিয়াজ তোমার কারসাজ॥
সিলেট হতে আসে পাথর জলে ভাসে
বাগেরহাট মসজিদের করলে থামের কাজ॥

দশ ছয় গুণে ষাটটি থামের মিলন
কারুকার্য তার অপূর্ব গঠন
কোথা সে মিস্ত্রী কিবা নিরূপণ
করিল গঠন এ জগত মাঝ॥
ষাটটি থামে যে জন করে আলিঙ্গন
ষাটজন আউলিয়ার সঙ্গে হয় সম্মিলন
অতি উচ্চ মিনার চৌদিকেতে তার
অতি মনোহর সে সৌধ সাজ॥
তার পশ্চিম দিকে ঘোড়া দীঘি নিরূপণ
স্নান, পান, ওজু করিবার কারণ
সগভীরেতে মীন থাকে চিরদিন
শ্বেতপদ্ম লালপদ্ম করে বিরাজ॥
খাজা পির খানজাহান করলো এই অপূর্ব সৃজন
হেথা নাকি ধর্মনীতি রাজনীতি হইত তখন
ফরজ নামাজের সময় মসজিদেতে যান
অন্তিম শয্যায় শয়ন করে জামাত–মাঝ॥

দীঘি এক ঘোড়ার দৌড়ের দৈর্ঘ্য যে তাহার
যাত্রীরা পানি নিয়ে যায় দেশ-দেশান্তর
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই আমার করিবেন উদ্ধার
বকশ ভাব ঐরূপ তব হৃদয় আজ ॥

৭৭

ওরে রাক্ষুসে মশা তুই করলি বড় দুর্দশা।
জীব-জানোয়ার সব খাইলি, আর খেতে কি তোর আশা ॥
রাত আটটার সময় মশার যে শব্দ শোনা যায়
ভয়ে অঙ্গ চমকে ওঠে, প্রাণে বাঁচা দায়
যুদ্ধের বিমান উঠলো যেন
প্রাণ বাঁচানো নাই আশা ॥
সব জীবের লোমকূপের গোড়ায়
কি সন্ধানে হুল বসায়ে রক্ত চুষে খায়
তার ছয়টি ঠ্যাঙে দুই পাখাতে
পদ্মাপার নিবার আশা ॥
মশার জন্ম যেখানে
ছুঁতো হাঁড়ি, পচা পানি কচু বাগানে
লঘু, গুরু মানে না সে
পেট ভরলে মেটে আশা ॥
মশা যদি চওলে বসে ভাই
স্বহস্তে চড় মারে কসে সম্মানের আশা নাই
বেহুঁসারে থাকলে পরে
হবে যে জীবের দশা ॥
যদি কেউ সাধুর দ্বারে যায়
গুরু-কথা সাধুসঙ্গ গীতবাদ্য শোনায়
পীঠের উপর হুল বসাইল
মন্ত্রের আর নাই আশা ॥
যদি কারো গুরুকৃপা হয়
জ্ঞান-মশারী টাঙ্গাইয়ে আলো জ্বেলে রয়
তার কাছে মশা ঘেঁষতে নারে
বিফল হয় যাওয়া-আসা ॥
যেথা হচ্ছে আনন্দ, সেথা রয় ধূপ-ধুনার গন্ধ
বেকুপ মশা খেতে নারে মনে হয় সন্দ
অধীন বকশ হলো ধন্ধ
যা করে শুকচাঁদ শা ॥

৭৮

আদি তীর্থধাম ছেঁউড়িয়া এই গ্রাম
করিলাম বিশ্রাম মহত-আঙিনায় ॥
সমাধি-মন্দির দেখে মন হয় অস্থির
দুই নয়নে নীর বহিছে সদায় ॥
অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে যে সবায়
ভক্তিভাবে ভেবে ডাকলে সাড়া দেয়
অভক্তের সেজন না দেয় দরশন
হলে এক মন ডাকলে পাওয়া যায় ॥
কাঁচে ঢাকা বহ্নি আছয়ে যেমন
মন্দিরে নিদ্রা যায়, সাঁই দরবেশ লালন
তাহারি কিরণ ভক্তবৃন্দগণ
চারদিকে তারা করিছে রশ্নায় ॥
পৃথিবী ব্যাপিয়া তোমারি মহিমা
ক্ষুদ্র জীব আমি দিতে নারি সীমা
অধীন বকশ কয় যেন যুগে যুগে
এ দেহ-মনপ্রাণ দিলাম তব পায় ॥

৭৯

আহা কি ছিল জাঁহাপুর এই বাজার
কত যে কারবার হয়েছে হেথায় ॥
কত ধনী মহাজন আর দোকানদারগণ
হয়ে একমন ছিল এক অশ্বত্থতলায় ॥
তার পূর্বদিকে ছিল রক্ষাকালীবাড়ি
হাজরাতলায় শোনা যেতো ঢাকের বাড়ি
ছেলেরা ছুটে যেতো তাড়াতাড়ি
দেবের ভোগ-প্রসাদ পাইবার আশায় ॥
তার দক্ষিণ দিকে ছিল বারাঙ্গণাগণ
চারুবালা নামে এক ছিল মহাজন
তার নিচে ভাটই নদী স্রোত বইতো নিরবধি
পালের নৌকা ডিঙ্গি কত ভেসে যায় ॥
কামার-দোকান ছিল কাঠের কারখানা
সন্দেশ মিঠাই বিক্রি করতো কতজনা
মিস্ত্রী পরমানন্দ করতো কত আনন্দ
তবলা-হারমোনিয়াম নিয়ে সদায় ॥

দীঘি এক ঘোড়ার দৌড়ের দৈর্ঘ্য যে তাহার
যাত্রীরা পানি নিয়ে যায় দেশ-দেশান্তর
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই আমার করিবেন উদ্ধার
বকশ ভাব ঐরূপ তব হৃদয় আজ ॥

৭৭

ওরে রাক্ষুসে মশা তুই করলি বড় দুর্দশা।
জীব-জানোয়ার সব খাইলি, আর খেতে কি তোর আশা ॥
রাত আটটার সময় মশার যে শব্দ শোনা যায়
ভয়ে অঙ্গ চমকে ওঠে, প্রাণে বাঁচা দায়
যুদ্ধের বিমান উঠলো যেন
প্রাণ বাঁচানো নাই আশা ॥
সব জীবের লোমকূপের গোড়ায়
কি সন্ধানে হুল বসায়ে রক্ত চুষে খায়
তার ছয়টি ঠ্যাঙে দুই পাখাতে
পদ্মাপার নিবার আশা ॥
মশার জন্ম যেখানে
ছুঁতো হাঁড়ি, পচা পানি কচু বাগানে
লঘু, গুরু মানে না সে
পেট ভরলে মেটে আশা ॥
মশা যদি চওলে বসে ভাই
স্বহস্তে চড় মারে কসে সম্মানের আশা নাই
বেহুঁসারে থাকলে পরে
হবে যে জীবের দশা ॥
যদি কেউ সাধুর দ্বারে যায়
গুরু-কথা সাধুসঙ্গ গীতবাদ্য শোনায়
পীঠের উপর হুল বসাইল
মন্ত্রের আর নাই আশা ॥
যদি কারো গুরুকৃপা হয়
জ্ঞান-মশারী টাঙ্গাইয়ে আলো জ্বেলে রয়
তার কাছে মশা ঘেঁষতে নারে
বিফল হয় যাওয়া-আসা ॥
যেথা হচ্ছে আনন্দ, সেথা রয় ধূপ-ধুনার গন্ধ
বেকুপ মশা খেতে নারে মনে হয় সন্দ
অধীন বকশ হলো ধন্ধ
যা করে শুকচাঁদ শা ॥

৭৮

আদি তীর্থধাম ছেঁউড়িয়া এই গ্রাম
করিলাম বিশ্রাম মহত-আঙিনায় ॥
সমাধি-মন্দির দেখে মন হয় অস্থির
দুই নয়নে নীর বহিছে সদায় ॥
অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে যে সবায়
ভক্তিভাবে ভেবে ডাকলে সাড়া দেয়
অভক্তের সেজন না দেয় দরশন
হলে এক মন ডাকলে পাওয়া যায় ॥
কাঁচে ঢাকা বহ্নি আছয়ে যেমন
মন্দিরে নিদ্রা যায়, সাঁই দরবেশ লালন
তাহারি কিরণ ভক্তবৃন্দগণ
চারদিকে তারা করিছে রশ্নায় ॥
পৃথিবী ব্যাপিয়া তোমারি মহিমা
ক্ষুদ্র জীব আমি দিতে নারি সীমা
অধীন বকশ কয় যেন যুগে যুগে
এ দেহ-মনপ্রাণ দিলাম তব পায় ॥

৭৯

আহা কি ছিল জাঁহাপুর এই বাজার
কত যে কারবার হয়েছে হেথায় ॥
কত ধনী মহাজন আর দোকানদারগণ
হয়ে একমন ছিল এক অশ্বত্থতলায় ॥
তার পূর্বদিকে ছিল রক্ষাকালীবাড়ি
হাজরাতলায় শোনা যেতো ঢাকের বাড়ি
ছেলেরা ছুটে যেতো তাড়াতাড়ি
দেবের ভোগ-প্রসাদ পাইবার আশায় ॥
তার দক্ষিণ দিকে ছিল বারাঙ্গণাগণ
চারুবালা নামে এক ছিল মহাজন
তার নিচে ভাটই নদী স্রোত বইতো নিরবধি
পালের নৌকা ডিঙ্গি কত ভেসে যায় ॥
কামার-দোকান ছিল কাঠের কারখানা
সন্দেশ মিঠাই বিক্রি করতো কতজনা
মিস্ত্রী পরমানন্দ করতো কত আনন্দ
তবলা-হারমোনিয়াম নিয়ে সদায় ॥

প্রাইমারী স্কুলটি ছিল সে সময়
শেখ ছাবদার আলী ছিল পণ্ডিত মহাশয়
মুরশিদের কৃপায় অধীন বকশ কয়
সে শোভা নাই, বর্তমান সেথায় কৃষিকার্য হয়॥

৮০

আঁধারে কে আলো দিলে॥
ঘোলদাঁড়ির আখড়া ছিল বাছড়া
কোন্ বিধাতা জাগাইলে॥
বড় জঙ্গল আগে
গরু-মানুষ ধরতো বাঘে
এখন সে সব গেল ফর্সা হলো
ঘরবাড়ি নাই মুখে আখড়া বলে॥
তেরো শত সাতাশি সালে
মঙ্গল বারের এক বৈকালে
নব তপন উদয় হইলে
যেমন বালক-বালিকা একসঙ্গে মেলে॥
পরে এক অনুষ্ঠান হলো
মতামত সব ঠিক করিল
ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া দিয়ে
সাড়া মহানিদ্রা জাগালে॥
ঘোলদাড়ি গোপাল সাঁইজীর ঘর
গোদি-মান্য পায় বহুতর
কোন্খানে তার সমাধি-ঘর
বলতে নারে জিজ্ঞাসিলে॥
ধন্য হবে এই ঘোলদাঁড়ি
যদি উজ্জ্বল হয় এই আখড়া
দক্ষিণে চৌধুরী বাড়ি
দীনহীন বকশ বলে॥

৮১

তুমি ছিলে একতারা হলে একতার।
ছিল নাম জহুরা আসমান উপর॥
তোমার স্মরণ নিলে দুনিয়া যায় ভুলে
এবে কি কৌশলে সাধিব তোমার॥

নিচে লাউয়ের বশ চামড়ার ছাউনি
তরলা বাঁশের ছড় শক্ত বাঁধা জানি
তার উপর কর্ণকাঠি, অতি পরিপাটী
রেখেছে তাই আঁটি সুরের একটি তার॥
ভাবাবেশে তোমায় নিয়ে যে জন বসে
সুর পঞ্চমে তোমার শব্দ ভাসে
কেহ দেখে হাসে, না পেয়ে তার দিশে
কেহ পরবাসে থাকে নিরন্তর॥
মানব-মূর্তি সম আকৃতি তোমার
অতি সুমধুর সুরে দিতেছ ঝংকার
একটি তামার পয়সায় আর কাঁচের মালায়
যেন ফাল্গুন নদীতে জোয়ার-ভাটা তার॥
সাধু-বাউল-দরবেশ শুনলে তোমার তান্
ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে হয় যে অজ্ঞান
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর বচন দীন বকশ ভাবলে মন
খুলে যাবে তখন সপ্ত স্বর্গদ্বার॥

৮২

মহত একিম চাঁদ, একিম চাঁদ পাগল দত্তালির পোল
বাক্যসিদ্ধ ছিল যে তার॥
কোন্খানে থাকতো কোথায়, খোঁজখবর নাই সকল সময়
একখান দা হাতে রয় আর॥
মরাহাসি বিলের ধারে বেড়াইত ঘুরে
কখনো যেতো এক বাবলাতলায়
কখনো যেতো বড় জঙ্গলে সাধন বলে
খুঁজে পাওয়া হতো যে ভার॥
গরু-মহিষ হারাইলে সন্ধান মেলে
একিম চাঁদের কাছে গেলে
কত জন করে শিরণি তাহার জন্য
রোগব্যাধি হলে যাহার॥
হাজতে আট্‌কা ছিল দেখা দিল
ভক্তগণের সাথে এসে
আবার গারদে বসে সাঁইর উদ্দেশে
হকনাম জপনা করে বারবার॥
হাকিমের ঘোড়া হারাইল খুঁজে পেল
এই পাগলের হুকুম মতো

জেলের দায় খালাস দিল আখড়ায় এলো
পাগলামী করে আবার।।
গুরু-শিষ্য একই অঙ্গ জেনে সঙ্গ
যে ভক্ত চেয়ে রয়
রেলগাড়ি ঠ্যাকায় ভক্ত হয়ে
শক্ত দাগ হয় গুরুর বুকের উপর।।
বিশুচাঁদ বড় ভক্ত-শিষ্য দেখায় দৃশ্য
দার্জিলিং মেল সেই দাঁড় করায়
দীন বকশ কয় বলি আল্লার অলি
কৃপা কর এই অভাগার।।

৮৩

করি স্মরণ দরবেশ লালন
তোমারি ঐ চরণে।
মহানিদ্রায় আছ শুয়ে
ছেঁউড়িয়ার এই কাননে।।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে
আছ তুমি এই ভুবনে
আওল আখের জাহের বাতুন
তোমায় যেন ভুলিনে।।
অপার মহিমা তোমার
জানে সব ভক্তগণে
দেশ-বিদেশে তোমার ডংকা
বাজিছে রাত্রদিনে।।
আমি অজ্ঞান মূর্খ নাদান
তোমার ভজন জানিনে
নিজগুণে তরায়ে লও
যেন রাখতে পারি নয়নে।।
জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত বিদ্বান
আছে তোমার সন্ধানে
বকশ বলে রাখবো তোমায়
স্বীয় হৃদ-পদ্মাসনে।।

৮৪

ফকির বাগান নাম অতি মনোরম
দরবেশ তুষ্টু সাঁইজীর ধাম তাহে শোনা যায়।।

কত পাগল মস্তান ধনী মহাজন
করেন ভ্রমণ এই বাগানের ছায়ায়।।
চারিটি গাছ দেবদারু অতি শোভাকর
সেই গাছের মাথায় ছিল আসন তাহার
ক্ষণেক নামতো মাটির উপর
রাত্রিকালে থাকতো সাধনে সদায়।।

বলবো কি তাঁর কাশফো কেরামতি
নববৃক্ষ বানায় ডাল ভেঙ্গে পুতি
তাহে ফলে আম্র ফল অতিশয় রসাল
রোগ-ব্যাধি ভাল হয় যে সেথায়।।
আমজাম কাঁঠাল নারিকেল পিয়ারা
মাধবি মালতিলতা ফুলে ঘেরা
ইলেক্‌ট্রিক তার শোভে তার মাঝার
যেন পূর্ণ শশধর হয়েছে উদয়।।
জেলা কুষ্টিয়া স্টেশন চুয়াডাঙ্গায়
দীঘির উপর এই বাগান দেখা যায়
তার পশ্চিমে মহকুমা হচ্ছে খরচ-জমা
বিচার-হাকিম বসেছে সেথায়।।
তার উত্তর দিকে বাবা মল্লিককেশের স্থান
পাকা বাঁধা আছে নীমগাছ তার প্রমাণ
মনেরি কামনা পূর্ণ হয় বাসনা
বৃহস্পতিবার শিরণি হয় দুই জাগায়।।
কত খাদেম এলো কত চলে গেল
মরহুম মহিউদ্দিন সর্দার পরে দুলাল বাবা ছিল
এখন তারা নাই আছে যুব সম্প্রদায়
আনছার মণ্ডল খতেবাবা বসে রয়।।
পয়লা বৈশাখ পয়লা জানুয়ারি প্রমাণ
দুইটি অনুষ্ঠান করে এই বাগান
গম্বুজ নাই পাকা সমাধি নির্মাণ
দীন বকশ বলে দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর কৃপায়।।

৮৫

ওহে মাবুদ মওলা কত লীলাখেলা
দেখাইলেন সাঁই লালনের আখড়ায়।।
ছিল ঝোড়-জঙ্গলে পুরা, ছিল মশাভরা
সাধুগুরু সমাধিতে ভক্তি দিত তায়।।

কিছু আগে এক খবর শোনা গেল
এই আখড়ায় বহু নির্যাতন চলেছিল
অন্ন ফেলে দিল, দৈ-এর হাঁড়ি ভাঙ্গিল
ভাজা মাছের ঝুঁড়ি গড়াগড়ি যায়।।
আর এক খবর শুনি, বলতে বুক ফাটে
সাধুগুরুর চুলদাড়ি গোঁফ মেরেধরে কাটে
একতারা ভেঙ্গে ছিল, ডুগি-জুড়ি ফেলে দিল
পূর্ণশশী সেদিন মেঘাচ্ছন্ন হয়।।
নব-দিবাকর উঠিল যখন
কত কষ্ট পেল অত্যাচারিগণ
করে নারী হরণ, কলঙ্কে হয় মরণ
আরো কত কষ্ট হলো এই দুনিয়ায়।।
এখন সেই আখড়ায় সরকার লক্ষ্য দেয়
ইলেকট্রিক আলো ঝলমল করে তায়
সমাধি-মন্দির দেখে মনে হয়
অস্থির এখন তিনার গান দেশ-বিদেশ পাঠায়।।
বিশ্বজুড়ে হচ্ছে তাঁর আলোচনা
কলেজ টেলিভিশন-বেতারে যায় শোনা
অধীন বকশ কয় দরবেশ লালন সাঁই
অমাবশ্যায় পূর্ণ শশধর উদয়।।

৮৬

হলো ভাই কি অবতার কলির ডাক্তার
পাশ-সার্টিফিকেট নাইকো দরকার।।
ফুলপ্যান্ট সার্ট প'রে এবার দেখায় বাহার
পকেটে গোজা থারমিটার।।
জানে না নাড়ীর খবর দেখায় জবর
কোন্ নাড়ীতে কোন ওষুধ চায়
ছিমটম জিজ্ঞাসা করে ভেবে মরে
ব্যাধি চিনতে পারে না আর।।
গ্রাম হতে ডাকটি এলো চলে গেল
সঙ্গে ডাক্তার বাক্স সাইকেলটি আর
ইনজেকশনের নিডিল কৌটা আর থারমিটার
কমবাইটিকস ব্যবহার করে যার তার।।
তেত্রিশ কোটি নাড়ীর সমান জেনে প্রমাণ
তিনটি নাড়ী প্রধান যে তার,
কোন্ সময় কোন্ নাড়ি চলে কে কি বলে
হাত ধরে বোঝে না ডাক্তার।।

একদিন রোগী দেখে এলো সূঁচ ফুটাইলো
আর ফিরে রাখে না খবর
রোগী কি মরে গেল, না বেঁচে থাকলো
কেবল দেখায় গল্পের বাহার।।

৮৭

দেখলাম ঘাট কামারখালী, আর কি বলি
ছুটে চলি পারের কারণ।।
ছয়খানা ফেরি আছে খেয়া দিচ্ছে
দিবানিশি সদা-সর্বক্ষণ।।
যাত্রীরা করিছে ভিড় অস্থায়ী নীড়
দোকান-পাট খোলা সর্বক্ষণ
সামনে নদী মধুমতি গভীর অতি
এপার ওপার করি নিরীক্ষণ।।
জ্ঞানী গুণী মূর্খ বিদ্বান হয়ে অজ্ঞান
দুখী-তাপী না হয় গনন
রাজা-বাদশা সাধু-সন্ন্যাসী পরবাসী
হয় উদাসি পরের মনন।।
বলবো কি ভাই ঘাটের কথা ঘুরছে মাথা
এই নদী পার হবো কখন
কতজন হেসে-খেলে যাচ্ছে চলে
কারো গাড়ি হয় নিমগন।।
ঢাকা-খুলনা-বরিশাল গাড়ি দিচ্ছে পাড়ি
এদেশ-ওদেশ করে গমন
কোচ, বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক, সাইকেল,
মোটর চলে সর্বক্ষণ।।
এই ঘাটের পূর্বপারে আস্তানা ঘরে
পান্না পাগলা রয় অনুক্ষণ
নিজাম, লতিফ, কালাচাঁদ বান্ধে এই বাঁধ
দীনহীন এই বকশের বচন।।

৮৮

এলো শুভক্ষণ পরলোক-গমন করিল রে মন
মহত ইজ্জত আলী সাঁই।।
গ্রাম ছত্তরপাড়া ঘুরতেন আগাগোড়া
হিংসা-বিদ্বেষ কারো সঙ্গে ছিল নাই।।

ধুতি পরিধান করে করিত ভ্রমণ
জাতিভেদ তাঁর ছিল না কখন
গো-দান ভূমি-দান করেছিল তখন
জনহিতার্থে চিন্তা সদা তায়॥
তেরো 'শ ঊননব্বই সাল তার পূর্ণ হলো কাল
সতেরই আশ্বিন সোমবারের বৈকাল
প্রাণপাখি ছেড়ে যায়, কেবল খাঁচা পড়ে রয়
বেলা আড়াইটায় সমাধি তার হয়॥
লালন সাঁইজীর ঘরে ছিল যে ভক্ত
গুরু-মা ছিল তার অতিশয় পোক্ত
বক্‌শিপুর গ্রামে আছে কিছু ভক্ত
সাধুসঙ্গে সহায় করে যে তারাই॥
এক 'শ সাত বছর ছিল যে জীবিত
ছেঁউড়িয়া আখড়ায় হয়েছিল ভক্ত
আখড়ার নাম বলিত তীর্থ
নামে বিদ্যাপতি ধর্ম-মাহাত্ম্য
দীন বকশ বলে দরবেশ শুকচাঁদ সাঁইর কৃপায়॥

৮৯

স্বনামধন্য গ্রাম তরফ জাঁহাপুর যার নাম
করি যে সালাম আমি সবাকার॥
ছিল জমিদার জোতদার দরবেশ আউলিয়া
মানবতা-প্রেমে ছিল একাকার॥
বদরুল আলম নামে ছিল জমিদার
বাড়ির চৌদিকে গড় কাটা ছিল জলাকার
সিপাই সরদার কত ছিল তার
মসজিদ ছিল বাড়ি অতি শোভাকর॥
আজানের আগে ঢাকে বাড়ি দিত
চৌদ্দ গ্রাম তাহার শব্দ শোনা যেত
সবে মিলে এক হয়ে আসিত
জুম্মার নামাজ আদায় করিবার॥
নব-সুখের গ্রামটি ছিল যে তখন
মুন্‌শী বিশ্বাস মণ্ডল হয়ে একমন
ধীবর সরকার কুম্ভকার কামার
ঘোষ, বোস, শীল, রজক, শালকার॥

গোলাম রব্বানী মিয়া আউলিয়া আল্লার
শেখ মফিজুদ্দিন কোরানের মাস্টার
শেখ আবদুল কাদের বড় দোস্তদার
সেই গ্রামে বকশর মাটির কুঁড়েঘর॥

৯০

সাধের গ্রাম তালতলা লাগে সাধুর মেলা
কত লীলা-খেলা হয় যে তথায়॥
পূজা ও পার্বণ আরতি কীর্তন
ভুবন মোহন আলোকিত হয়॥
গ্রামের নিচে আছে মাথাভাঙ্গা নদী
স্বচ্ছ জলে স্রোত বয় নিরবধি
বিশ্বাস ক'রে তাই নামতে পার যদি
ডুব দিয়ে মাঝিরা মুক্তা তোলে তাই॥
পালের নৌকা ছেড়ে যাচ্ছে মহাজন
তীরেতে ভেড়ে না এমনি তার মন
নব কুলবধূগণ স্নানে যায় যখন
অপূর্ব তখন ঘাটের শোভা হয়॥
দুর্গা-মন্দির আছে আর মসজিদ ঘর
প্রাইমারি স্কুলটি গ্রামের পূর্বধার
দেওয়ান দর্গা, ঈদগা তাহার উত্তর
গোরস্থানটি আছে মাঠের মাঝে তাই॥
জ্ঞানী-গুণী বিদ্বান আছেন যে হেথায়
শ্রীযুক্ত বিমলবাবু হয় পণ্ডিত মশায়
মহাত্মন বাবুরালি মিয়া অতি বৃদ্ধ হইয়া
মাস্টার রূপে তিনি শিক্ষা দিয়ে যায়॥
আলফাজদ্দিন নামে সাধু একজন আছে
কত ভক্ত হলো কত চলে গেছে
একজন নুরু মিয়া নামে ঘোরে পিছে পিছে
দীন বকশ বলে ব'সো নয়া বেলতলায়॥

৯১

এসে সাধুর দ্বারে বসে তাঁতের ঘরে
পরে সবে হয় এক জায়গায়॥
হইয়ে সদয় প্রভু দয়াময়
যেনো অসময় দেখা পাই তোমায়॥

তার দক্ষিণে সরোবর উত্তরে কর্মের ঘর
কাঁঠালগাছ ভেটুলগাছ আছে গাভির পর
তাহার পশ্চিম–পার রাস্তা মনোহর
ধীবর ও জলকর আছে যে সেথায়॥
হেথায় লালন–গীতি নিয়ে হয় আলোচনা
আলী হোসেন বিশ্বাস পণ্ডিত সে একজনা
পূর্বে ভাব–লোচন হয়ে একমনা
কখনো কখনো বসেন এই আঙিনায়॥
তার দক্ষিণ–পূর্ব কোণে আছে এক বাজার
ডাক্তার দোকানদার করে শোভাকর
খাসকররা নাম যেন পূর্ণ–ধাম
আসে সাঁই নিজাম, দীন বকশ ইহা কয়॥

৯২

এই তো কুমার নদী, ছিল অগাধ জলধি
কঁত পালের নৌকা ডিঙে ভেসে যেত তায়॥
হতো গঙ্গাস্নানের মেলা শ্মশানে মরা ফেলা
শিশু–কুম্ভীর জলে ভাসতো সে সময়॥
ভাগ্যক্রমে তাতে কাটিল ক্যানাল
আনন্দধামের পূর্বে দিল দুর্ভেদ্য বাঁধাল
দিয়েছে লৌহকপাট, তাতে মারা বল্টু–নাট
অতিশয় ঠাঁটবাট করেছে সেথায়॥
নদী মরে এখন পড়ে গেল চরা
জারমানী কলমী দুলালে দামেতে জলভরা
আরো কাদায় পুরা, নামলে গরু–মোষ যায় মারা
কালের কবলে এই তো দেখা যায়॥
অদ্য সেই নদী হেটে পার হই
জলে পা লাগে না স্রোত বচ্ছে তাই
দিয়ে দুই দিকে দুই ঢেলা, তার উপর দিয়ে চলা,
সাধুগুরুর সঙ্গে বকশ বকশিপুরে যায়॥

৯৩

দেখলাম ইমানের জোর এক পিরের দুই গোর
ভক্তগণ বিভোর হয়েছে হেথায়॥
করে টানাটানি আউলিয়ার লাশখানি
দুই গ্রামে দুই সমাধি দেখায়॥

সাতদিন পরে সে লাশটি তুলতে যায়
ইস্পাত কাগজে তার খবর শোনা যায়
হলো জানাজানি, আর কিছু না শুনি
চৌষট্টি দিন পরে পুন তোলে তায়॥
যাহারা সেই লাশ তুলে নিয়ে এলো
আতর গোলাপের গন্ধ তাতে পেলো
নাভি না ফাটিল, চুল সাবেক রইলো
ঘুঘরো পিপড়ায় তার কিছুতেই ছোঁই নাই॥
শাহ সুফি নাম গোলাম রহমান
নাগদা, ভোলারদাঁড়ি পরস্পর দুই গ্রাম
স্বনামের জমিতে পিরের দরবার শুনিলাম
জরিপের আমিন টেবিল ফেললো সেথায়॥
সাতাশি নম্বর নাগদা মৌজায়
পূবদিক সেই পিরের আস্তানায়
নজির ও আবুল হোসেন রসুল করে রক্ষণাবেক্ষণ
দীনহীন বকশ দেখে কয়॥

৯৪

দয়াল মুর্শিদের কৃপায় এসে ঢাকায়
দেখলাম লালবাগ কিল্লা কি চমৎকার॥
চারিদিকে বাঁচড়া প'ড়ে ঘাসে জুড়ে
অনেক জায়গা জনশূন্যকার॥
ওস্তাদ কামরুজ্জামান আর আমি ছিলাম
হানিফ আলির এক বন্ধুবর
চারজনা যুক্তি করি রাস্তাধরি
চড়ি দুইখানা রিকসার উপর॥
ঠিক জায়গায় নেমে পলাম দেখতে পেলাম
কিল্লার তোরণ সুবৃহদাকার,
দুই দিকে ফুলবাগিচা মাঝখানে রাস্তা
সামনে পরীবিবির মাজার॥
শ্বেতপাথরে আছে গাঁথা বলবো কি তা
মসজিদ শোভাকর
নিচে দেখি সৈন্যদের গড় মাটির পাহাড়
ঢুকবার সাধ্য নাই ঘোর অন্ধকার॥
শেষে দেখি এক সরোবর
চারিদিকে ঘাট বাঁধা তার

একটা কামান পড়া ছাল ওঠা তার
নাইকো বাদশা জাহাঙ্গীর সেই মহাবীর
দীন বকশ কয় চল বাসায় এবার।।

৯৫

বৌদ্ধ-মন্দির দেখলাম অতি মনোরম
সামনে সরোবর শোভিত মণ্ডন।।
মহানগরী ঢাকায় মানব-দেবতার উদয়
ভক্তগণ তাই করছে ভজন-পূজন।।
আমি আর শিমুলী ওস্তাদ কামরুজ্জামান
হানিফ প্রিয়নাথ ছিল যে ওসমান
পায় হেটে যাই কত শোভা দেখতে পাই
বহু দিনের আশা হলো যে পূরণ।।
অতি মনোরম বৌদ্ধের আস্তানা
স্নিগ্ধ শিলামূর্তি সুঠাম গঠন সে না
প্রস্তরমূর্তি আরো দেখলাম কয়খানা
পূজার সামগ্রী তার সামনে ফুলবাগান।।
ভাড়ালি ঘর আর অফিস দেখি তার
হল্ একটি আছে মিটিং মধ্যস্তার
সাইন্‌স ল্যাবরেটরি স্কুলটি সুন্দর
পড়ে সব চিটাগাং-ছাত্রগণ।।
সড়ক দীপঙ্কর কিবা শোভাকর
সেথা হইতে বৌদ্ধের সাইনবোর্ড তার
সাধনার পাকুড় গাছ, গোড়া বাঁধা তার
মনে হয় এটা সাধুর উদ্যান।।
আরো জীবে দয়া দেখিলাম সেথায়
শ্বেত-খরগোশ-হরিণ তারাও সেবা পায়
গেরুয়া বসন পরা ভক্তেরা সবাই
দীন বকশ কয় দেখলাম ভরে দুই নয়ন।।

৯৬

একি আনন্দ শুভবিবাহ সম্বন্ধ
নাইঁ নিরানন্দ সবার হাস্যবদন।।
ছাত্রছাত্রী মিলি খেলে যেন হোলি
এসেছে হেথায় নতুন ফাগুন।।

ফুলের তোড়া দেখি আর উপঢৌকন
জ্ঞানী-গুণীজন হেথা হয়েছে আগমন
সবার মুখে মধুর হাসি, ঝলে ফুলরাশি
মিলিত আসি ঢাকা কলাবাগান।।
স্বর্ণ-অলংকার শাড়ি-বেনারসি পরি
নববধূ দুর্বাদল বেড়ায় ঘুরিফিরি
বর শ্রী তপনকান্তি বৈদ্য শুভদৃষ্টি করি
নায়ক ও নায়িকা দুজন হলো যুগলমিলন।।
স্নেহময়ীর স্বহস্তে করিলাম ভোজন
বসিয়া হোটেল চায়না গার্ডেন
বলবো কি আর বেশি
পূর্ণ হলো যাহা কিছু, ধন্য হলো জীবন।।
তেরো শ' একানব্বই সাল উনত্রিশে ফাল্গুন
সর্বসম্মতিক্রমে হলো এই মিলন
করি আশীর্বাদ দু-জন থাকে একসাথ
দীনহীন অধম বকশের এই বচন।।

লোকগীতি

৯৭

তোরা কে দেখবি জামাই শীঘ্র ছুটে আয়।।
জামাইর মাথায় জটা, কটিতে বাঘছাল আটা
সাপ জড়ানো সকল গায়।।
জামাই অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোনো গুণ নেই জামাইর কপালে আগুন
জামাই স্বগুণে নির্গুণ হয়ে
ভস্ম মাখে সকল গায়।।
বাতাসে চড়ে বরযাত্রী এলো
কেহ ল্যাংড়া, কেহ নুলো, দেখতে সব কালো
তাদের দাঁত খিচুনি, চোখ রাঙনী
উব্দো পায়ে হেটে যায়।।
জামাই শ্মশানে থাকে
বন্ধু-বান্ধব নন্দী-ভৃঙ্গি বলবো আর কাকে
জামাই গোধুলি লগ্নে এসে
শুভযোগে সাত পাক দেয়।।
হাড়ের মালা জামাইর গলে

ত্রিশূল–ডম্বুর করে লয়ে জামাই পথেতে চলে
আবার ব্যোম ব্যোম ব্যোম ব্যোম মুখে বলে
অধীন বকশ থাকে সেই নেশায়।।

৯৮

তোমারে নয়নে লুকাইয়া রাখিবো।।
মুকুর ধরিয়া ও রূপ নিরখিয়া
চপলার ন্যায় তোমায় চেয়ে দেখিবো।।
তুমি পিপাসার জল পথেরই সম্বল
অন্তরের অন্তঃস্থল তাই ভাবিবো
তব রূপসিন্ধু, হেরি এক বিন্দু
নির্জন মন্দিরে আমি শান্তি পাবো।।
ফুলমাঝে যেমন গন্ধ বিরাজে
অমনি আমি তাই তোমায় ভাবিবো
মল্লিকা মালতি না তোমায় আমি বলিলাম,
নাসারন্ধ্রে শুধু গন্ধ লবো।।
শুক্তিমাঝে মুক্তা লুকাইয়া থাকে
অমনি রাখিবো তব মম অন্তরীক্ষে
বাঁশে বংশলোচন, গজে গজমতি সৃজন
কস্তুরি সম গন্ধ হও উদ্ভবো।।

৯৯

ওগো প্রাণসজনী দিবস–রজনী
আনমনে গনি সে রূপ উপাসনা।।
বসন্তের নিশি তাহে পূর্ণ শশী
প্রেম–কাননে বসি করি ভাবাগনা।।
তোমায় না দেখিলে কবিতা যাই ভুলে
মনে হয় চলে যাই নদীর মোহনায়
সব হয় বিস্মরণ, শুধু লাগে জ্বালাতন
কুহু কুহু রব ছাড়ে না, ছাড়ে না।।
হেরি আমের মুকুল ডাকিছে কোকিল
কুহু কুহু রব ছাড়ে না ছাড়ে না
আর বিরহ যাতনা সহে না সহে না
কি করি বলনা তুমি যে ললনা।।

১০০

যে যাহারে ভালবাসে সে কি কারো কয়।।
দিনের রবি রাতের চন্দ্র জেনেছে নিশ্চয়।।
তার লাগি নক্ষত্রগণে
চেয়ে থাকে বদন পানে গো,
সে যেখানে সেও সেখানে
ভাবে সদা–সর্বদায়।।
সে হয় তার ভজন–পূজন
তার বিনে আর নাই প্রয়োজন গো,
দুর্বলের বল অন্ধের নয়ন
রেখেছে হৃদ–আঙিনায়।।

১০১

কন্যা তোমার কাছে আমার চাওয়ার কিছু নাই।।
সময় মতো দিও দেখা থাকি সেই আশায়।।
আমার বলতে কি ধন আছে তাই তোমাকে দেবো
হীরা–মানিক নাই যে দিয়ে তোমারে ভুলাইবো
দীন–ভিখারী হয়ে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।।
যে দিকেতে তাকাই আমি তোমায় দেখতে পাই
প্রেম–পিরিতের দায়ে আমি খুঁজিয়া বেড়াই
কথা কইতে নারি রইতে নারি, হয় নাকো সময়।।
মধু হইতে সুমধুর লাগে তোমার মুখের বাণী
নীল কমলের মতো তোমার দুটি নয়ন জানি
ও নয়নে নয়ন দিয়ে থাকিবো নিশ্চয়।।

১০২

মালতির গন্ধে প্রেমানন্দে এসেছে ফাল্গুন।।
ফোটাফুলে মত্ত হয়ে ভ্রমর করিছে গুণগুণ।।
একে তো নিঝুম নিশি
তাহে উদয় পূর্ণশশী
হোলি খেলি হয় উদাসী
আনন্দে মগন।।
আবীরের ছড়াছড়ি,
রঙ নিয়ে সব দৌড়াদৌড়ি

লাল করিল সাদা শাড়ি
সবার হাস্য-বদন ।।
পিচকারিতে টেনে নিয়ে
দিতেছে রঙ ছড়াইয়ে
কোলাকুলি ঢলাঢলি
দীন বকশের এই বচন ।।

১০৩

আর কি তারে দেখা পাবো ।।
বৃক্ষের নব-পল্লব ছায়ায় বসে
বন্ধু লয়ে প্রাণ জুড়াবো ।।
বন্ধু আমার শ্যামল বরণ
চাচর চিকুর কেশ হরে মণির মন
এক নজরে দেখলে তারে
মৃতদেহে জীবন পাবো ।।
সে যে আমার রূপের খনি
মন-প্রাণ সব আকুল করে
বলবো কি বাখানি,
ভাবি আমি দিন-রজনী
তারে পেলে শীতল হবো ।।
বন্ধু আমার অতিশয় সুধীর
এক নজরে দেখলে তারে থাকে না অস্থির.
সে আমার আমি যে তার,
অন্তরে অন্তরে লুকাইয়া থোবো ।।

১০৪

পথের দিকে চেয়ে যে থাকি ।।
কখন আসবে প্রাণ-বঁধুয়া
সেই আশাতে জীবন রাখি ।।
উদয় যেন নব-দিবাকর
লাল রঙের শাড়ীটি পরে হয় যে শোভাকর,
সহস্র কিরণ জ্যোতি
ললাটে শিখা টিপ দেখি ।।
বসন্তের মাঝামাঝি শেষ নিশিথে
দেখিয়ে মোহন মুরতি পারিনে ভুলিতে

যেতে শুতে উঠতে বসতে
সর্বদাই ঐরূপ নিরখি ।।
চাতকের ন্যায় থাকবো কতকাল,
নব-জলধরের সে যে পিপাসারই জল
এখন সকাল বিকাল আর সন্ধ্যাকাল
ঐরূপ বই আর না দেখি ।।

১০৫

আমার মনের মানুষ নাই যেখানে
সেখানে কেমনে থাকি ।।
পলকবিহীন চেয়ে দেখি
কোনো পথে সে আসছে নাকি ।।
সে বিনে মোর শূণ্য এ জীবন
কেমনে পাশরি থাকি কি করি এখন
তার জন্যে মোর জীবন ধারণ
সে নইলে প্রাণ কিসে রাখি ।।
পাখি হতাম উড়ে যে যেতাম
কোন্‌খানেতে আছে বন্ধু খুঁজে দেখিতাম
কেমন করে জানবো বন্ধু
দুখী কিবা আছে সুখী ।।
মনের কথা কার বা কাছে কই
সম-ব্যথার ব্যথিত আমার আর তো কেহ নাই
আসুক বা না আসুক বন্ধু
থাকে যেনো পরম সুখি ।।

১০৬

পিরিতের বান হানিলো অন্তরে ।।
আমার হৃদয় জ্বলে হলো অঙ্গার
অন্তর আর বাহিরে ।।
জানতাম না তার কিবা জ্বালা
হৃদয় জ্বলে হলো কালা
খেতে শুতে উঠতে বসতে
সদা থাকি অস্থিরে ।।
সবে বলে পিরিতি ভালো
আমার জন্যে হলো পিরিত বিষম কালো
আমি কি করিতে কি যে করি,
ভাসি সদা নয়ন নীরে ।।

আর জ্বালা সহিব কতকাল
সে বিনে শূণ্য জীবন হই সদা বদহাল
পিরিতের এই কি রীতি
সর্বদা হৃদয় বিদরে ॥
লীলাতে বহুরূপ ধরি
আমি যে সেই নন্দের হরি
ব্রজ–গোপীর মন হরণ করি
দীন বকশ ভাবে তারে ॥

১০৭

পিরিতের আশ্রয় না জেনে
প্রেম করা তার হয় ঝাকমারি ॥
বিষয় ত্যেজে আশ্রয় করলে
সে প্রেম থাকে বরাবরি ॥
বিষয় থাকলে সে প্রেম তো হয় না
চীনের থালার মতো সে
কিছুতে লাগলে থাকে না,
যেমন ছিদ্র–কুম্ভে রয় না বারি ॥
সুজন প্রেমের প্রেমিক যে জন হয়
নয়ন দেখলে তারে চেনা যায়
তার কেটে গেছে সকল সংশয়
বেড়ায় সে বাতুল রূপ ধরি ॥
শুকচাঁদ শাহর পিরিত ভুলে
ভাসে বকশ কূলে কূলে
লও গো গুরু কোলে তুলে
এই অভিলাষ মনে করি ॥

১০৮

তার জন্যে মোর সদায় ভাবনা ॥
আমি যেতে নারি রইতে নারি
সইতে নারি যন্ত্রণা ॥
যেখানে সেখানে যে থাকি
সর্বদায় হৃদয়ে রাখি
সে বিনে মোর সকল ফাঁকি
কে বোঝে সে বেদনা ॥
সে যে আমার ফুলের রেণু
গায়ে উড়ে পড়ে যখন হই শান্তানু

তারই গন্ধে প্রেমানন্দে
থাকি সদায় মগনা ॥
দেখিয়ে তার বদন–শশী
অশান্তি সব দূরে পালায় হই যে খুশি
বকশ বলে কাতর হালে
সদা তোর এ সান্ত্বনা ॥

১০৯

তোমার করকমলের কলম আমি
সদায় বুকে ধরে রাখি ॥
ক্ষণে ক্ষণে খুঁজে দেখি
আছে কি হারালাম নাকি ॥
নীল বরণের কলম যে তোমার
সময় সময় হাতে নিয়ে ভাবি অনিবার
তার কথাই লিখি বারেবার
কোনো কথা থাকে না বাকি ॥
নিশিতে ঘুমায়ে যে থাকি
সর্বদায় হস্ত দিয়ে খুঁজিয়া দেখি
আছে কি কারো দিলাম নাকি
সদা সন্তর্পণে থাকি ॥
কালি, কলম, মন এই তিন জন
এক নিহারে লিখি সদাই হইয়া মগন
আমার বৃথা যাবে কি এ জীবন
খাতায় উশুল পাব বা কি ॥

১১০

গানের খাতা এসেছি ফেলিয়া ॥
কি করে গান বলবো বলো
সব গিয়াছি ভুলিয়া ॥
মনে নাই কবিতা ছন্দ
জ্ঞানের দ্বার হয়েছে বন্ধ
সদায় থাকি নিরানন্দ
দিন যে গেল চলিয়া ॥
যার আশার আশেতে লিখি
তারে আর চোখে না দেখি

সে যে আমার প্রাণপাখি
কোথায় গেল উড়িয়া ॥
সে রূপ না আর মনে আসে
আছি কেবল দূর দেশে
কবে পাবো দর্শন সে চাঁদবদন,
দীন বকশ কয় তাই ভাবিয়া ॥

১১১

কি সাজে সেজেছে আজি মনোহর মন-মোহিনী ॥
শরতের পূর্ণশশী বিকশিত হয় যামিনী ॥
নব নব উদ্দীপনায় পরিছে হার কন্ঠশোভায়
ললাটে টিপ কিরণ দেয় রজত-কাঞ্চন শিরোমণি ॥
সর্বাঙ্গেতে শুভ্রবসন হরিছে যেন মণির মন,
অধর-ওষ্ঠ হিঙ্গুল বরণ, শুভ্র দন্তে মুক্তা ঝরে জানি ॥
ক্ষীণ কটিতটে কি শোভাকর, কুঞ্চিত কেশে মালা দোলে তার
লোচনে কাজলের আভা, তরল যে সে চাহনী ॥
দুটি বাহু মৃণাল সম, করকমলে রক্তজবা উত্তম
রাঙা চরণে নুপুর বাজে, রুনুঝুনু চলিতেছে রাজহংসিনী ॥
মহানন্দে হয়ে মত্ত সঙ্গিগণ সঙ্গেতে বর্ত
করে কোলাকুলি ঢুলাঢুলি দীন বকশর সেই কমলিনী ॥

১১২

আমার বন্ধু যেন থাকে পরম সুখী ॥
আমি দুখ পাই তাতে ক্ষতি নাই,
তবু ঐরূপ হৃদে রাখি ॥
বন্ধুর রূপে নয়ন দিয়া সব ভুলিয়া থাকি
কবে আসবে প্রাণ-বন্ধুয়া আমার পরাণ-পাখি ॥
সরল সুঠাম সে যে মধুর মুরতি
এক নজরে দেখলে তারে শীতল হয় দুই আঁখি ॥
বন্ধু যেদিন আসবে দেশে , দেখবো অমৃতের হাসি
সোনার বরণ তরুণ তপন, আর দিও না ফাঁকি ॥

১১৩

গানের ডালা এনেছি ভরিয়া ॥
মল্লিকা মালতি ফুলে রেখেছি তাই সাজাইয়া ॥

কথার মালা গেঁথে ফিরি
তাল-লয় তার সহচরি গো,
রাগরাগিনী লক্ষ্য করি
দিচ্ছে কন্ঠে ছড়াইয়া ॥
ভাবাবেশে করে লক্ষ্য
কবিতা হয় উপলক্ষ গো,
অপরূপ সে প্রেমের বৃক্ষ
উদারা-মুদারা-তারা লাগাইয়া ॥
জ্ঞানি গুণীর হাটে বিকাই
নিত্য নতুন কুসুম ফোটে তাই, গো
মন আনন্দে মত্ত সদায়
দীন বকশ তাই তান লাগাইয়া ॥

১১৪

বৃষ্টিভেজা পথে চলে রসিক রসোময় ॥
সুকোমল-শ্যাম -নির্মল তনু হেলে-দুলে যায় ॥
কিবা সুন্দর সেই যে চাহনী
যেন যায় বনের হরিণী
মনোহরার মনোমোহিনী,
যাচ্ছে হেটে কোন্ আশায় ॥
নবীন মেঘের বরিষণে
উল্লসিত মনেপ্রাণে
মালতি পুষ্প কাননে
ঝরঝর বরুণ ঝরিছে তায় ॥
জলে ভিজা যুগল চরণ
কিবা অপরূপ করেছে ধারণ
দীন বকশর এই আকিঞ্চন
যেন জীবনে তার আর না হারায় ॥

গৌরতত্ত্ব

১১৫

কবে গৌরচাঁদকে পাবো প্রাণ জুড়াবো
মনে সদা এই ভাবনা ॥
চরণে থাকবো মিশি দিবানিশি
কুলের গৌরব আর করবো না ॥

কুলের বউ হয়েছিলাম পথে এলাম
তবু তার সন্ধান পেলাম না,
কত বেড়ায় তীর্থযাত্রায় মনের ব্যথায়
বুঝি কোন্ মন্দিরে আছে সে না॥
হই নাই কি তার মনের মতন গোরা রতন
মম ভাগ্যে মিলতেছে না,
জানি নে সেবাভক্তি চায় যে মুক্তি
তাই বুঝি আর খুঁজে পেলাম না॥
সব ছেড়ে ধরলাম পেড়ে পথে পড়ে
গৌরচাঁদ তোমায় ছাড়বো না,
দীন বকশ বলে এই ভূমণ্ডলে জলেস্থলে
করি দরবেশ শুকচাদ সাঁইর চরণ বন্দনা॥

১১৬

গৌরচাঁদ হয়েছে উদয় ভাবের নদীয়ায়॥
রসে অঙ্গ ভরপুর পুলকিত সর্বদায়॥
বলবো কি তার রূপের কিরণ
যেন কাঁচা সোনার বরণ
জগতের মন করে হরণ
একবার যদি ফিরে চায়॥
গৌর উদয়ে পুষ্প চন্দন
যোগে উদয় গৌরচন্দ্র
নক্ষত্রগণ ভক্তবৃন্দ
আনন্দে মত্ত সদায়॥
গৌর অঙ্গে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা
সময় বুঝে দিচ্ছে দেখা
রাই রূপেতে মাখাজোখা
দীনহীন এই বকশ কয়॥

গোষ্ঠ

১১৭

ও ভাই কানাই, চল গোষ্ঠে যাই
সকাল বেলা ডাকি তোরে॥
মায়ের কোলে থাকলি শুয়ে
আমরা কি তোর কেহই নয় রে॥

আমরা সবায় রাখালগণে
এলাম যে তোর ডাকার জন্যে
যাবে নাকি গোচারণে
আর কতক্ষণ থাকবি ঘরে॥
হয়েছে অধিক সময়
আর কত ঘুমাবি রে ভাই
আমরা রাখলগণে সবায়
চেয়ে কি তুই দেখিস না রে॥
গাভী বৎস অনাহারে
কানাই তুই বেরিয়ে আয়রে
যেতে হবে গোষ্ঠ মাঝারে
দীন বকশ তুই দ্যাখ কি করবি রে॥

১১৮

গোষ্ঠে আর যাবে না আমার
প্রাণের গোপাল নীলমণি॥
দণ্ডে দণ্ডে খাওয়াই ননী
আমি বলছি যে যশোদা রাণী॥
গোষ্ঠে গোপাল পাই যে কষ্ট
আমার নিকট বলে পষ্ট
তোদের চোখে হয় না দৃষ্ট
এখন ডাকিস কিসের জন্যি॥
ধেনু-বৎস করিব দান
কারো কথায় দেব না কান
গোপাল যে আমার প্রাণের প্রাণ
দেখবো ঘরে দিন-রজনী॥
বলছি তোদের রাখালগণে
গোপাল যদি যাবে বনে
আমি মরিব এ জীবনে
দীন বকশ কি তার ভাব জানি॥

১১৯

ও ভাই কানাই তোর কি মানায়
মায়ের কোলে শুয়ে হা-রে॥
আমাদের কি মা নাই বলে
তুই কি মনে ভাবিস তাই রে॥

পিতধড়া নে রে প'রে,
মোহন চুড়া দে রে শিরে
কটিতে কিংকিনি ধরে
চরণ-শোভা পর নূপুরে॥
হাম্বা রবে ডাকছে ধেনু
বাজা রে ভাই মোহন বেনু
গোষ্ঠে চল রে প্রাণের কানু
রাখালগণকে সঙ্গে করে॥
কালিন্দিরির মাঠে যাবো
কত শোভা দেখতে পাবো
কিছু দেখে ভয় না পাবো
তুই যদি সঙ্গে থাকিস রে॥
তুই আমাদের প্রাণের কানাই
মাকে ডেকে হওরে বিদায়
যদি কৃপা করে গুরু-দয়াময়
দীনহীন এই বকশর পরে॥

১২০

আমি বলবো কি আর রাখালগণে
তোরা ফিরে যা মোর কথা শুনে॥
বড় চিন্তায় পড়েছি বাপ রে
আজকার নিশি অবশানে॥
শৃগাল, ব্যাঘ্র, সিংহ আছে
গোধন চরাও যেখানে
দৈত্য-দানব আছে কত
শুনেছি তাই শ্রবণে,
তাদের মধ্যে থাকিস তোরা
গোপাল আমার নয়ন-তারা
হই যে আমি দিশেহারা
গেলে গোপাল গো-চারণে॥
কালিদহের জলে আছে
বিষেতে গরল পুরা
সময় সময় সেই জল নাকি
খেয়ে থাকিস বাপ তোরা,
আরো আছে কুম্ভীরাণী
নামলে কিনা করে জানি

সেথায় আছে কালনাগিনী
বিষের হায় ছাড়ে সখনে॥
কংশের চর ঘুরে ফিরে
বেড়ায় সদা সেই মাঠে
বিপদে কি ফেলবে তারা
পেলে তোদের নিকটে,
পড়েছি বিষম সংকটে
কি আছে যে এই ললাটে
দীনহীন এই বকশ রটে
নীলমণি পাঠায় কেমনে॥

কীর্তন

১২১

ও রাই, এভব ভুবনমাঝে॥
যেদিকে ফিরি অপরূপ হেরি
নেহারি সকাল-সাঁঝে॥
তাহে ভালে পূর্ণশশী, মুখে মধুর হাসি
নয়নে কাজল সাজে
জোড়া ভুরু যেন কামেরই কামান্
রঙধণু সরে লাজে॥
কমল মৃণালসম বাহুদল
প্রেমের লতিকা সে যে,
পিনোন্নত পয়োধর কিবা শোভাকর
তুলনা দিব কি আর যে॥
তার যুগল নিতম্ব কি ছার কদম্ব
মদন মুরছা যায় রে,
শুভ্র অম্বর কিবা শোভাকর
ক্ষীণ কটিতট-মাঝে॥
ও তার চরণ-কমলে তিলোত্তমা শোভে
আলতা আল্পনা সাজে,
সোনার নূপুর বাজে রুণুঝুনু,
এ দীনহীন রয় মজে॥
কোন বিধাতা গড়িয়েছে
নির্জনে বসে বসে,
বিধি গড়ে বুঝি দেখে নাইরে
দেখলে ছেড়ে দিত না রে
যে দেখেছে আবার খোঁজে
রাই এ ভুবনমাঝে॥

১২২

ও রাই, তুমি যে প্রেমের ধনী গো রাধা
আমি সে প্রেমের খনি।।
তোমার পরশে রাধাবল্লভ নাম
বাঁধা থাকি আমি এই ব্রজধাম
তোমাকে সত্য জানি,
তোমা বিনে আর দেখি অন্ধকার
তুমি যে নয়নমণি।।
চুঁড়া বামে হেলে চরণ-কমল পাব বলে,
তুমি যে প্রেমের খনি
মম পরশ-রতন জীবনের জীবন
বাঁশিতে বলে রাই ধনী।।
তমাল তরু মূলে যমুনা সলিলে
তুমি যে পারের তরণী
মম পরশ মণি হও শিরোমণি
অধীন বকশর এই বাণী।।

পরপার চিন্তা

১২৩

এই সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় বসে দিন কাটাই,
ভাবি নাই দীনের একদিন সন্ধ্যা হবে।।
মিছে মায়ার ভোলে আছি কেবল ভুলে
এসব ফেলে কোন্‌দিন চলে যেতে হবে।।
বলেছিলাম নাম করবো অনিবার
দিন গেলে মুখে আসে না একবার
ভবের বেচাকেনা নিয়ে মন আনমন
বললে তো শোনে না দুনিয়ার ভাবে।।
নির্জনে বসিয়ে ডাকবো যে তোমার
এই প্রতিজ্ঞা ছিল পূর্বেতে আমার
এখনো হে দয়াময় হইয়ে সদয়
নিজগুণে তুমি তরায়ে লবে।।
বৃক্ষের পল্লব সম ধরে আছে জীবগণ
সময়ে ঝরে পড়ে নবপল্লব হয় দরশন
দরবেশ শুকচাঁদ শাহর বচন বকশ ভাব মন
গুরুধন বিনে কে আর তরাবে।।

১২৪

এ ভবসংসার ভেবেছিলাম সার
সে সারে অসার হইল শেষে।।
এ সব হাওয়ার খেলা ফুরাইল বেলা
হইয়া সরলা যায় স্বদেশে।।
যেমন নব-জলধরে রবি আচ্ছাদিত
ঐরূপ মায়াপাশে জীব হইল আবৃত
যদি সৌদামিনী খেলে না যায় বিফলে
পবন অনুকূলে তাহে প্রকাশে।।
বাল্য, কৈশোর, যুবক, বৃদ্ধকাল
এই চারকালে কভু ফললো না সুফল
এখন হইল বৈকাল কিছু নাই সম্বল
সামনে সন্ধ্যাকাল নাইরে দিশে।।
যবনিকা যবে হবে অভিনয়
ভজনহীনের কৃপা করিবেন সাঁই
দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই কহিছে সদায়
বকশ ভাব তাই স্বরূপ উদ্দেশে।।

শ্যামাসঙ্গীত

১২৫

ও মা, তরাও তারা এ সংকটে।।
আমি একলা পড়ে আছি বটে।।
মাগো, আছ তুমি সর্বঘটে
বেড়াই আমি ছুটেছেটে
কৃপা করে হও নিকটে
দেখা দাও হৃদয়পটে।।
পড়ে মায়া নদীর তটে
কি আছে মা এই ললাটে
আছ কি মা কালিঘাটে
কৃপাময়ী হও নিকটে।।
দীন বকশ রটে
আর কিছু নাই মা, আছে কেবল বাস্তুভিটে
সেটুকু যদি কেড়ে নাও মা
পড়বো ঐ চরণে লুটে।।

১২৬

মায়ের বিচার এমনি বটে॥
যেজন ভাবে ভক্তিভাবে
ওমা, তারই তুমি হও নিকটে॥
গিরিরাজ নন্দিনী মাগো,
থাকো তুমি শ্মশানঘাটে
সময় সময় দিন বয়ে যায়,
ভোলানাথে সিদ্ধি কুটে॥
কভু হও শ্যামরায় কভু শ্যামা,
সবঘটে থাকো বটে,
রাখাল সনে বাজাও বাঁশি
কখনো যাও গঙ্গাতটে॥
বকশ তোমার অবোধ ভক্ত মা,
কি আছে যে এই ললাটে,
সকল ছেড়ে ধরলাম এঁটে
হৃদয়-মাঝের চিত্রপটে॥

১২৭

এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে বিদায়॥
সদানন্দ হও মা উদয়, মান-অভিমান কারো না তায়॥
যে আনন্দ লাগি মা গো করিয়েছ এ সৃজন
সেই আনন্দে আনন্দিত রাখো সদা ভক্তের মন,
কৃপানন্দ বারি দিয়ে, তম-অন্ধ দাও মা ধুয়ে
থাকি আমি তোমায় লয়ে , যাতে সন্দ নাহিক রয়॥
সদানন্দ রূপে তুমি থাক এই ভূমণ্ডলে
মহানন্দ হয়ে মাগো সৃষ্টি পালন করিলে,
থাক এ মহীমণ্ডলে জলেস্থলে মন-কমলে
কেহ শুধু মুখে বলে, স্বচক্ষে দেখে নাই তোমায়॥
প্রেমানন্দ রূপে তুমি দিও দেখা অজ্ঞানে
তোমার মহিমা মাগো বিজনে আর বিপিনে,
এসেছি তোমার সন্ধানে দীনহীন এই বকশ ভনে
তোমা বই অন্য জানিনে, সর্বানন্দে হয়ো সহায়॥

১২৮

অবোধ মন, তুমি আর দিন গুনো না॥
কৃপাময়ী থাকতে সহায়
তোমার আর কিসের ভাবনা॥

মায়ের দয়া হলে পরে
যাবে সকল সংকট দূরে
শান্তি পাবে হৃদ-মাঝারে
বিঘ্ন-বিপদ আর রবে না॥
দুদিনের এই মায়ার সংসারে
কেবল বেড়াই ঘুরেফিরে
খেলা সাঙ্গ হলে পরে
চলে যেতে হবে, কেউ রবে না॥
আনন্দময়ীর কর স্মরণ
দূরে যাবে সব জ্বালাতন
দেখতে পাবি রূপসনাতন
মায়ার বেড়ি আর থাকবে না॥

১২৯

মা তোর বরণ কালো লাগে ভালো,
তাই বারেবার দেখি॥
দেখে তোমায় সাধ মেটে না,
তোর আশাতেই থাকি॥
কৃপাদৃষ্টি করে মা গো
কেটে দে মোর কর্মফাঁসি,
সব সময় তোর নিয়ে থাকি
ঐ নীলকমল দুই আঁখি॥
আমি রোগে কিংবা শোকে থাকি
সর্বদাই তোর চোখে রাখি,
তুই ছাড়া হইলে মা গো,
সকল দেখি ফাঁকি॥
সময় সময় হও জ্যোতির্ময়
কোনো সময় দেখি মৃন্ময়,
তোর শ্যামল বরণ করে ধারণ
দীন বকশর জীবন রাখি॥

১৩০

প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মাগো
এই বাসনা মনে করি॥
ডাকবার সময় হয় না আমার
মিছে মায়ায় ঘুরে মরি॥

শিশু যেমন মাকে ডাকে
মা ছাড়া জানে না কাকে,
শিশুর মতো করে আমাকে
পথে নিও হাতে ধরি ॥
মা-কথা মমতা যুক্ত
ডাকলে কোলে নেয় যে সুত,
কুপুত্র অনেকে হায় তো
কুমাতা নয় বরাবরি ॥
ভুলে আছি ভূমণ্ডলে
মাগো আমি তোমায় ফেলে,
দীনহীন এই বকশ বলে
ঝরে কেবল নয়নবারি ॥

১৩১

নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো আনন্দময়ী ॥
এ বিশ্ব-ব্রাহ্মাণ্ড মাঝে তুমি আছ চিরস্থায়ী ॥
তোমার ভাবে থাকে যারা
মণিহারা ফণী পারা
দেখলে দুটি নয়ন তারা
মনে হয় সেই জগন্ময়ী ॥
নানাস্থানে নানানময়
থাক তুমি ভক্তের হৃদয়
মহানন্দে হও মা উদয়
সময় কি আর অসময়ি ॥
কোন্ ফুলে সন্তুষ্ট তুমি
ভেবে গুণে পাইনে আমি
তুমি তো মা অন্তর্যামী
এই দীনহীনের স্নেহময়ী ॥

১৩২

যদি মন, মায়ের দাবি করবি পূরণ ॥
আগে নিষ্ঠা-ভক্তির কর আয়োজন ॥

কাম , ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ সকল
ছেড়ে দাও গে সে সব গণ্ডগোল

লক্ষ্য রেখ সে চাঁদবদন
সম্বল মাত্র অভয় চরণ ॥
শুদ্ধমতি ভক্তি দিয়ে
থাকো ঐরূপ স্মরণ লয়ে
কৃপাময়ীর কৃপা হলে
ঘুচে যাবে ভববন্ধন ॥
ও মন, ধূলাখেলায় আছিস মগন
মা ডাকলে রইতে পারবিনে কখন
ফেলে রেখে সব আয়োজন
যেতে হবে নিজ নিকেতন ॥
তুই আমারে যা শিখাবি মা
তাই হবে মোর উপাসনা
তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানি না
দীন বকশ রয় নামরসে মগন ॥

১৩৩

মা তোমায় আর ডাকবো কতো ॥
আমার ডাকতে ডাকতে বেলা গেল,
কোন্দিন দেখা হবে বলতো ॥
শিশুকালে ডাকতাম যখন
দৌড়ে দেখা দিতে সতত,
এখন সকাল বিকাল ডাকছি ওমা
তবু উত্তর পেলাম না তো ॥
তুমি যখন ডেকেছিলে মা
ভবের খেলায় ছিলাম মত্ত,
তাই প্রাণ খুলিয়ে ডাকছি মা গো
অভিমান আর করো না তো ॥
ধূলায় ঘরবাড়ি বেঁধে মা
বসত করলাম কিছু দিন তো,
এখন সুখ দাও আর দুঃখ দাও মা
আমি তোমায় ছাড়বো না তো ॥
অপরাধ না হয় করেছিলাম মা
দেখে তোমার অভয় পদ,
তোমার নামের গুণে নাও না তুলে
দীন বকশ তোমার পদানত ॥

১৩৪

মা কী নেই মোর ভূমণ্ডলে।।
বেঁচেই যদি থাকতে মা গো,
ডাকতে নিতে কোলে তুলে।।
কুপুত্র মা অনেক বলে
কুমাতা নাই কোনোকালে,
যতই ত্রুটি–দোষ করি আমি
মা হয়ে দিও না ফেলে।।
তোমার এই ভূমণ্ডলে
কত দুঃখ আমায় দিলে,
ডাকি তবু মা মা বলে
দেখবো মা নেও, দেও কি ফেলে।।
কর্মক্ষেত্রে পড়েছি মা গো
কি জানি হয় মোর কপালে,
আমি সকাল–বিকাল ডাকছি কেবল
দীন বকশ যেন যায় না ভুলে।।

বিবিধ

১৩৫

উম্মুল কোরান পড়ে দেখরে মন
তাতে আছে সকল বিবরণ।।
আল–কোরানে যত ছুরা,
তাহার মধ্যে এই তো সেরা গো,
জানবে কি বে–ঈমান যারা
মোমিন গণের হয় স্মরণ।।
বান্দার বন্দেগীর তরে
এই তো শ্রেষ্ঠ বলে যারে গো,
যে জনা তাই আমল করে
ওলির সেরা হয় গনন।।
কোরানের হয় জননী
বললো কি তার গুণ বাখানী
দীন বকশ ভাবে দিনরজনী,
রাখবো স্মরণ সর্বক্ষণ।।

১৩৬

নবির দ্বীন করে একিন মলো মোমিন
আল্লাজীর নেক রাহাতে।।
ঈমানের পূঁজি করে চল ধীরে
অমূল্য ধন পাবে তাতে।।
হিংসা–নিন্দা–কেনা ছাড়, কলমা পড়
বগজ নফছো আম্মারাতে
বান্দাকে কর খুশি দিবানিশি
নাজাত পাওয়া যায় যাহাতে।।
মাটির ন্যায় হয়ে খাঁটি পরিপাটি
দেখ না স্বরূপের সাথে,
সর্বজীবে আছে খোদা, ভেব না জুদা,
দাখেল হও আল্লার বান্দাতে।।
লাহুত নাছুত মলকুত জবরুত
দেখা পাবে হাহুতেতে
শুকচাঁদ শাহর সত্য বাক্য করে ঐক্য
বকশ থাক এক নিষ্ঠাতে।।

১৩৭

কি অলংকার পরাই ননীর পুতুলের গলায়।।
স্বর্ণ–হারটি দিতে গেলে কেটে পড়ে যায়।।
ফুলের মালা দিতে তোলে
সুতার গাথা সুকৌশলে
কন্ঠে পরাইতে গেলে
খসে পড়ে তায়।।
দুগ্ধ হইতে জন্মায় মাখন
তাহে ননী হয় নিরূপণ
গজমতির হার পরাইলে
তাহা নাহি সয়।।
ফুটিল না মনের মুকুল
কবে ফুটবে সেই প্রেমফুল
গলে দিয়ে হব আনন্দে আকুল
অধীন বকশ কয়।।

১৩৮

কিবা শোভা চাঁদের আভা লেগেছে আজ এখানে।।
পুলকিত হলো অঙ্গ বলিব আর কার সনে।।

নির্মল বাতাসে ওড়ে বৃক্ষের নবপল্লব,
সকলেই আনন্দ মনে, কারো মনে নাই ক্ষোভ,
হেরিয়ে নির্মল জ্যোতি
নৃত্য করে প্রজাপতি,
ফোটা ফুলের ডালে বসি
মত্ত সদা মধুপানে॥
চকোরা উড়িছে তাহে সুধা পানের উদ্দেশ্যে,
মন-আনন্দে উড়ে চলে আকাশে আর বাতাসে,
যদি চকোর এক বিন্দু পায়
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে নিশ্চয়
একান্ত হয়ে ঘুরিছে তায়
ঊর্ধ্ব দৃষ্টি চন্দ্র পানে॥
পূর্ণ শশী উদয় আসি সুনীল ঐ গগনে
সহস্র কিরণ জ্যোতি প্রকাশে ঘনে ঘনে,
তাহে স্বচ্ছ মন নিয়ে
অধীন বকশ আছে চেয়ে,
সেই বিন্দুর এক বিন্দু পেলে
মত্ত প্রেমসিন্ধু পানে॥

১৩৯

দেবতা হারিয়ে পূজারি কাঁদবি কতো দিন॥
অন্ধকারে ঘিরে নিলো মন্দিরে নেই তো আলোর চিন॥
ধূপ-প্রদীপ আর গঙ্গাজলে
পূজিতাম বেলী-মালতি ফুলে
মন-আনন্দে চন্দন গলে
চয়ন করতাম প্রতিদিন॥
বেদিতে রাখিয়া প্রতিমা
শঙ্খ-ঘন্টা বাজাইয়া
বরণ-ডালা সাজাইয়া
আরতি করতাম সন্ধ্যাকালীন॥
যার পূজা আজ তাকে দিয়ে
আমি আছি উপলক্ষ হয়ে
অষ্ট অলংকার সাজাইয়ে
সামনে এই বকশ দীনহীন॥

১৪০

জীবন-পথের শুভযাত্রী যায় শেষরাত্রি,
আর তাকায় না পিছে ফিরে॥

ছেড়ে সংসারের জঞ্জাল শ্মশানে যান,
মায়া-মোহ সব ত্যাগ করে॥
তেরো শ একানব্বই সাল শুক্রবারের সকাল
বারোই পৌষ গণনা হয় রে,
নামটি তার রাধারাণী গুণমণি
শ্মশান পোস্তগোলায় দাহন করে॥
প্রমাণ করি জেলা কুষ্টিয়ায়
কন্যা হয়, গায়ত্রী নাম তায়,
বৌমা অনিমা দেবী তার যত্ন করে।
চন্দনা তার নয়নমণি গুণমণি
আশীর্বাদ করে যাই সেরে॥
দিতেন তিনি সাধুসেবা,
দেব-দেবীর পূজা,
করে একাদশী বারো মাস ধরে
শুনতেন সে ভাগবত গীতা,
কীর্তন কত তীর্থপর্যটন করে॥
ছেড়ে তার পুত্রকন্যা অট্টালিকা
খাট-বিছানা চায় না ফিরে,
বিশ্রামের হাওয়াখানা তাও দেখে না,
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে যায় রে॥
সাত নম্বর ওমর আলি লেন, ঢাকা আসেন
ওয়াপদা এক রোডের ধারে,
পুত্র নির্মল মজুমদার বলবো কি আর,
দীন বকশ মা বলে ডাকতো তারে॥

১৪১

চিন্তারোগের ওষুধ কোথাও খুঁজে পেলাম না॥
চিন্তা যতই করি ততই বাড়ে গো, সতত দেয় যন্ত্রণা॥
কত ডাক্তার বৈদ্য ডেকে আনি
রোগটি সারবার জন্যে
থারমিটারে জ্বর ওঠে না
ডাক্তার ধরবে কি সন্ধানে
এই রোগের উপশম তো পাইলাম না॥
দিবানিশি ভাবছি বসি কখন কি হয়
কার কি বলি ঠিক থাকেনা বিকারের জ্বালায়,
কত ট্যাবলেই, পাচন, সালসা খেলাম গো,
এ রোগ বাড়লো বই আর কমে না॥

পিলেই লিভার পেটের ব্যথা
বাত বাতাইসে নাই ভগন্দর কি অর্শ-ধাতু
কালা পালাজ্বর তো নাই
ভয় পাওয়া কি স্বপ্নে খাওয়া গো,
এ সব আপদ-বালাই তো দেখি না।।
বিশ্রাম ব্যারাম হয় না আরাম
শুয়ে বসে তাই
সর্বরোগ হরে হরিতকি সময় সময় খাই,
এই উপদেশ দেন দরবেশ শুকচাঁদ সাঁই
দীন বকশ ভালমন্দ কিছু জানে না।।

১৪২

শুনে গুরুবাক্য হৃদে কর ঐক্য,
পাইবে মানিক্য, পণ্ডিতেরা কয়।।
আলস্য করিলে রত্ন নাহি মেলে
যাইবে বিফলে জনম তায়।।
সমুদ্রের জলে ঝিনুকগুলি ভাসে
যদি স্বাতীনক্ষত্রের জল পায় কার্তিক মাসে,
তার এক বিন্দু পরশে যায় তলদেশে,
চৈত্র মাসে খুঁজলে তাতেই মুক্তা পায়।।
সাকার ও আকার এই দুটি বিধান
জল আর বরফে আছে তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ,
জল হইতে বরফ করিয়া আরোপ
স্বরূপেতে তাহারা ঠিক করে তায়।।
ধ্রুব প্রহলাদে বিশ্বাসের জোরে
হস্তি শুণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে নাহি মরে,
অধীন বকশ কয় আর কি করে
সবে যায় সরে,
যেন অন্তিমকালে দরবেশ
শুকচাঁদ সাঁইকে পাই।।

১৪৩

যদি না হয় নির্দিষ্ট, হবে পথভ্রষ্ট,
হবে না সন্তুষ্ট সেই দয়াময়।।
যদি ভাব তারে ইষ্ট, যাবে সব কষ্ট,
এই তো সুস্পষ্ট শাস্ত্রে শোনা যায়।।

কি আছে অদৃষ্টে ভেবে নাহি পাই,
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ তাহাই শুনতে পাই
যদি হয় দুষ্ট পায় নানা কষ্ট,
অভীষ্ট পূরণ কভু নাহি হয়।।
ইষ্টমন্ত্র কেবল মুখে বললে কি হয়
যদি তার মনে নিষ্ঠা নাহি রয়
অধরোষ্ঠে নাম না রেখে সন্তুষ্টে
দুষ্টমতি কেবল নিষ্ঠাপানে ধায়।।
গুরুর উচ্ছিষ্ট যে জন নিষ্ঠভাবে খায়
যাবে তার সকল সংশয়
অধীন বকশ কয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়,
স্রষ্টা সন্তুষ্ট হইবে নিশ্চয়।।

১৪৪

ভক্ত আমার প্রাণ, জীবনের জীবন
ভক্ত বিনে বন্ধু দেখিনে একজন।।
ভক্তের দ্বারে দ্বারি থাকি রবাবরি
কেবল ঘুরিফিরি ভক্তের কারণ।।
ভক্ত যে আমায় ডাকে গুরুজী
সর্বানন্দে আমি হয়ে যাই রাজী
প্রাণ শীতল হয় আর কিছু না চাই
ভক্তের হৃদয়ে আমার দিয়েছে আসন।।
ভক্তের কারণ করি ভবে আগমন
ভক্ত-হিতার্থে ধ্বংস হয় রাজা রাবণ
স্বর্ণলংকা তার গেল ছারেখার
সবংশেতে সেজন্য হইল নিধন।।
প্রেমের বৃক্ষ হয় ভক্ত যে আমার
প্রাণ শীতল করি তাহারই ছায়ায়
অধীন বকশ কয় ভক্ত মাতাপিতা হয়
ভক্ত দিলে খাই ,নাই করি অনশন।।

১৪৫

জন্মমৃত্যু খণ্ডন হবে কিসে।।
ভেবে পাইনে আমি তার দিশে।।
নির্বাণ লাভ করেছিলেন জ্ঞানীবুদ্ধ
বহু বছর সাধনা করে হলেন তিনি শুদ্ধ,

মরণ-ফাঁদে শেষে তিনি হলেন অবরুদ্ধ
আমি তো সামান্য জীব, কি হবে শেষে॥
ভাবনা-চিন্তায় আয়ু এলো অন্তে,
মরণ হলো হলো না আমার জীয়ন্তে,
জন্মমৃত্যু পরিহার জীবের কি খাটে আর,
জীবাত্মা পরমাত্মায় কি মেশে॥
শুকচাঁদ শাহ বলছে সদায় ডেকে,
রাখতে আর পরবি নে নিজেরে ঢেকে,
জেন্দামরা হয়ে যা, সময় পাবি না,
বকশ দেখে যা একবার এসে॥

১৪৬

নিরাকার সেই সত্তা ভজ একমনে॥
আলাকুল্লে শাইন মুহিত বলিছে কোরানে॥
আকার সাকার নয় রে তিনি
নিরাকার সে চিরদিনি
মনের ঘোরে বুঝতে না পেরে
হাতড়ে বেড়ায় আঁধার কোণে॥
এক জেনে ভজ তারি চরণে
তবেই উদ্ধার পাবি কঠিন মরণে
এক রজনী এক দিন, হলো তাঁর একত্ব চিন,
আমি অবোধ ঘুরে মরি না জেনে॥
শুকচাঁদ শাহর সত্য বাক্য
শোনরে বকশ কর্ লক্ষ্য
একে জেনে তুই হ-গে যোগ্য
নইলে ভুল হবে তোর সাধনে॥

১৪৭

ধরে সত্যের রশি চল দিবানিশি
উদয় হবে শশী হৃদয়-আকাশে॥
যদি থাক বসি হইবে কি কৃষি,
কর মিলামিশি সবার সকাশে॥
এই ভবে আসি ধর নাম-রূপ মন্ত্র ক'সে
তম-মসী সব যাবে উঠে শেষে,
কারে দ্বেষাদ্বেষি লয়ে মাসীপিসি
নিজে দোষী হও আকাশে॥

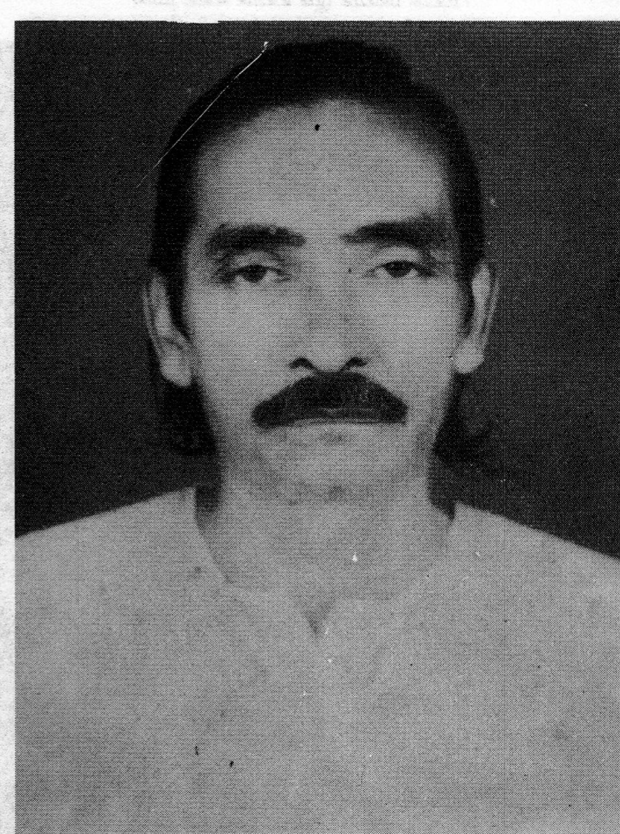
সইলে সাহসে সৃষ্টির উদ্দেশ্য
শান্তিপাবে তবে বিধির বিনাশে
যমদূত এসে কি ধরিবে কসে
যাইবে স্বদেশে শান্তিতে অবশেষে॥
শক্তিতে সিদ্ধি হইলে স্ববাসে
শ্রীগুরুর চরণে সদা থাক মিশে
অধীন বকশ ভাসে গুরুকৃপা-লেশে
আত্মায় আত্মায় মিশে দেখা দেবে এসে॥

১৪৮

আমি ভালবাসি যারে ভুলিব কি করে
সে বদনমণ্ডল॥
মোহন মধুর মুরতি দেখে
ভোলে ভূমণ্ডল॥
তার মুখে সদা হাসি মনপ্রাণ উল্লাসি,
বরণ চিকন কালো,
ও সে শ্যামল সুন্দর, রূপে মনোহর
সদা অবিচল॥
শান্ত মুরতি ক্ষণপ্রভা জ্যোতি,
সুমতি সুঠাম সুকোমল,
আমার যা আছে আপন, করি সমর্পণ,
আর নাই কিছু সম্বল॥
আমি যদি তারে পাই মনপ্রাণ জুড়াই
আর কিছু নেইকো প্রয়োজন,
সুপথের সম্বল, প্রেম পরিমল
দীন বকশ মুখে গুরু বল্॥



খোদা বকশ শাহের পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্বের ছবি।



খোদা বকশ শাহের যুবা বয়সের ছবি।



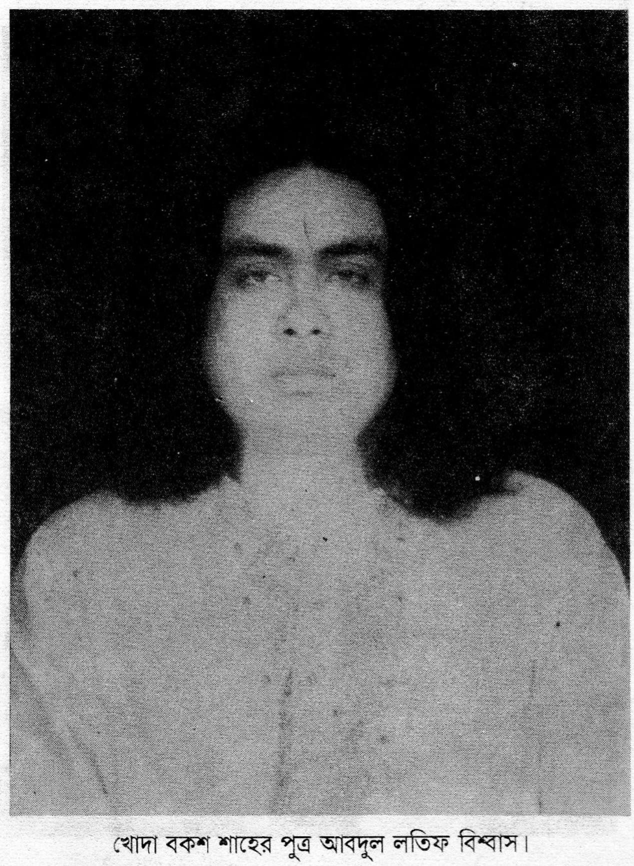
মরমী কবি লালন শাহ্
[শিল্পী জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর অংকিত স্কেচ]
অংকনকাল ২৩শে বৈশাখ ১২৯৬।
খোদা বকশ শাহের উর্ধ্বতন গুরু (দাদা–গুরুর দাদাগুরু)



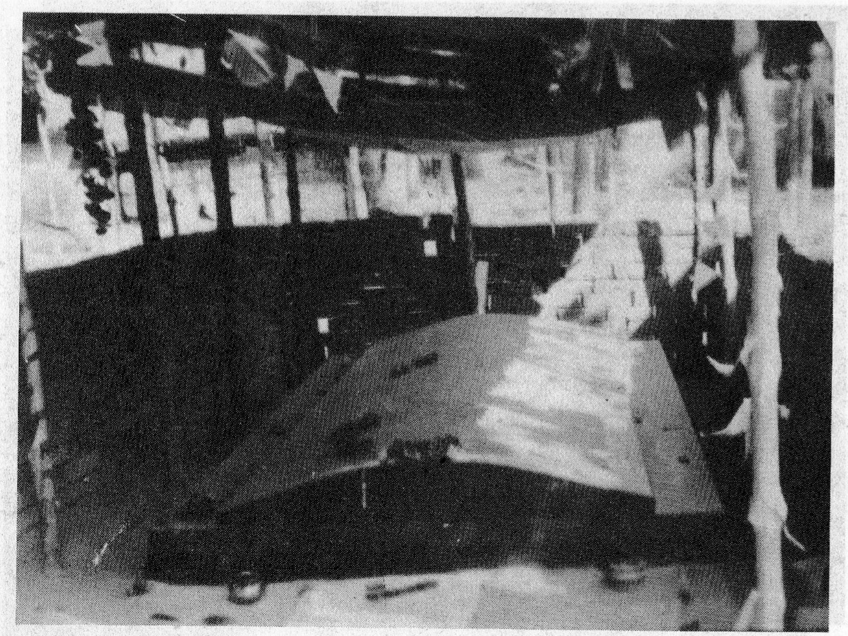
খোদা বকশ শাহের স্ত্রী রাহেলা খাতুন।



খোদা বকশ শাহের প্রধান শিষ্য হেদায়েত আলী শাহ।

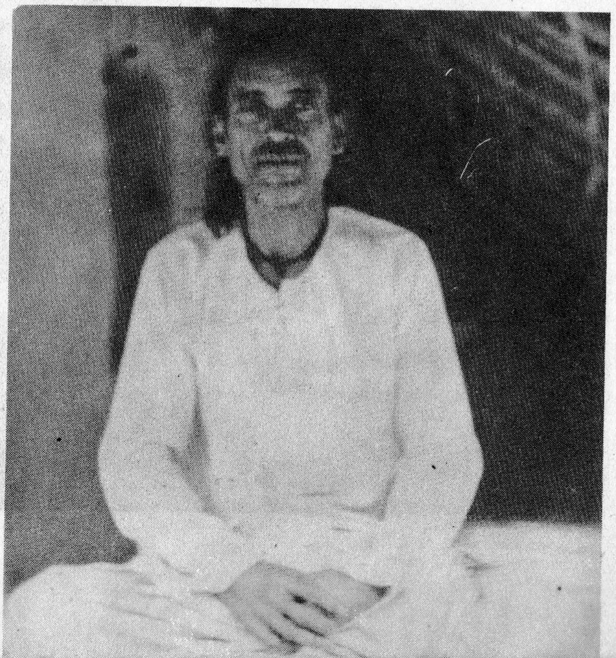


খোদা বকশ শাহের পুত্র আবদুল লতিফ বিশ্বাস।



খোদা বকশ শাহের মাজার (সমাধি)।

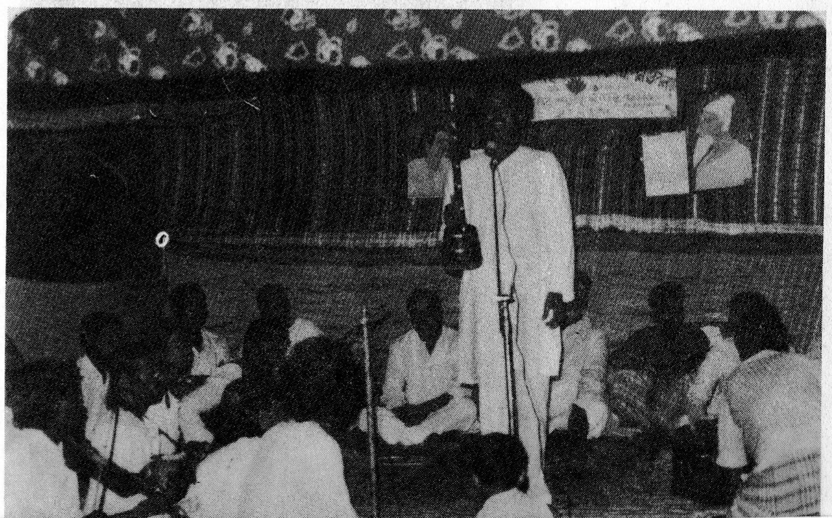
খোদা বকশ শাহের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সঙ্গীতশিষ্য পবন কুমার বিশ্বাস।

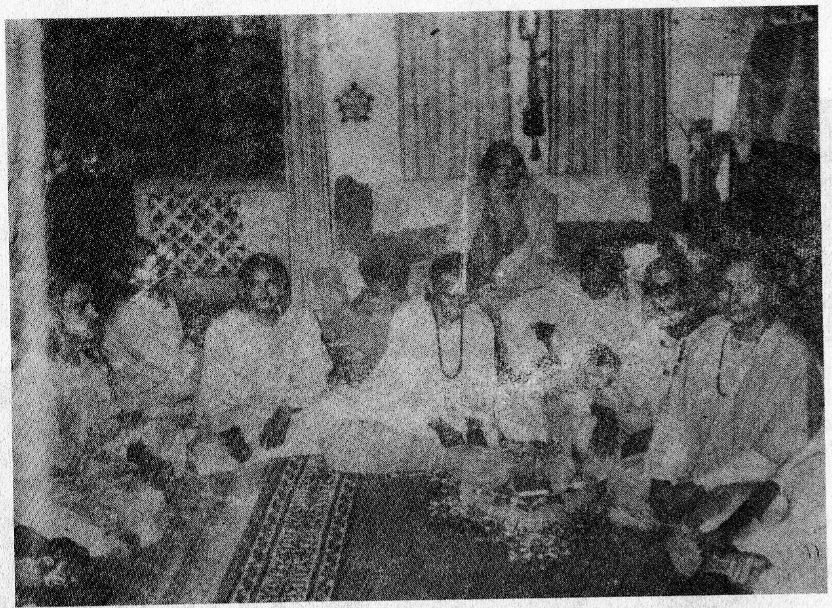




খোদা বকশ শাহ তাঁর শিষ্য হেদায়েত আলীকে খেরকা-খেলাফত (ফকিরি পোশাক) প্রদান করছেন। ডান থেকে বামে : ঝড়ু শাহ, হেদায়েত আলী শাহ (চোখবাঁধা), খোদা বকশ শাহ (একতারা হাতে)।

খোদা বকশ শাহের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাধুসেবার সঙ্গীতাসর।





পূর্ণদাস বাউল-এর আশ্রমে, দাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত—১৯৮২। ডান থেকে বামে : পূর্ণদাস বাউল, কানাই শাহ, মহেন্দ্র গোস্বামী, ঝড়ু শাহ, খোদা বকশ শাহ, খোদা বকশের ডানপাশে দু-জন ভক্ত। সভাপতির আসনে ডক্টর মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

খোদা বকশ শাহের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ভাবসঙ্গীতাসরে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন কানাই শাহ।



পরিশিষ্ট

বংশলতিকা

- মিয়াজান বিশ্বাস
  - কফিলউদ্দিন বিশ্বাস
    - নছরুদ্দিন বিশ্বাস
    - আরশাদ আলি বিশ্বাস
    - দৌলতন্নেসা
    - খোদাবকশ শাহ
      - আবদুল লতিফ বিশ্বাস
      - মালঞ্চ

খোদা বকশ শাহ-এর সিজরানামা

হজরত মুহম্মদ মোস্তফা আমম্মদ মোস্তফা নুরুল আহাদ (দ:)
তাঁর তালিব (মুরিদ) পীরানে পীর দস্তগীর হজরত আলি করমুল্লাহ্ অজহু
" " হজরত মুহম্মদ হাসান বসরি পীরে আলিশান
" " হজরত আবদুল ওয়াহেদ শাহ্ সুফি
" " হজরত ফজিল ওয়াজেদ ওলিয়েল আজম
" " হজরত ইব্রাহিম আদহাম বলখি
" " হজরত আমিনউদ্দিন শাহ পীরে সুলতান
" " হজরত মমশাদ উলুবি দীন্ওয়ারি
" " হজরত ইসহাক শাহে শাহান শাহ
" " হজরত আহাম্মদ শাহে সুলতান
" " হজরত মোহাম্মদ শাহ ওলিয়েল আজম
" " হজরত ইউসুফ শাহে মুরশিদ
" " হজরত মওদুদ হক শাহ সুলতান
" " শাহ সুলতান হজরত শরিফ জিন্দানি
" " শাহ সুফি হজরত ওসমান হারুনি
" " হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি হাসান শানজারি
" " হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি আল-চিশ্তি
" " হজরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জ-ই-শোকর
" " শাহ সুলতান হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া
" " হজরত নাসিরুদ্দিন শাহ আল্-চিশ্তি
" " হজরত কামালউদ্দিন শাহ ওলি
" " হজরত শাহ সিরাজউদ্দিন আল্-চিশতি
" " হজরত শাহ এনামুল হক আল্-চিশ্তি
" " হজরত শাহ দরজায়ে দরবেশি
" " হজরত শাহ জালালউদ্দিন জুম্মানি
" " হজরত হাশেম শাহ আল্-চিশ্তি
" " হজরত আহাম্মদ শাহে দরবেশ

” ” শাহ সুলতান এহিয়া মাদানি

” ” হজরত শাহ নিজামুদ্দিন নাজারাবিন

” ” হজরত শাহ ফকরউদ্দিন আল-চিশ্‌তি

” ” হজরত মেহেরুল্লাহ্‌ শাহে দরবেশ

” ” শাহ আমানতউল্লাহ ওলিয়েল আজম

” ” হজরত শাহ আক্‌বার মানিক ওলিয়ে কামেল

” ” দরবেশ সিরাজউদ্দিন সাঁই পীর সুলতানুল

” ” মুর্শিদুন্নবি দরবেশ লালন শাহ ওলিয়েল আজম

” ” পণ্ডিত-প্রবীণ হজরত মনিরুদ্দিন শাহ ওলি

” ” দরবেশ খোদা বকশ শাহ (হরিয়ারঘাট)

” ” দরবেশ শুকচাঁদ শাহ

” ” দরবেশ খোদা বকশ শাহ

সঙ্গীতসূচি

তথ্য-সরবরাহকারী ব্যক্তির তালিকা

মুনশি ওহিদুল ইসলাম ছন্টু : পিতা-মুনশি জানারদ্দিন, বয়স-৪০, পেশা- কৃষিকাজ, গ্রাম- শাহপুর

ডাক্তার ওহিদুল ইসলাম : পিতা-সাবের মোল্লা, বয়স-২৮, পেশা- চিকিৎসা, গ্রাম- ভ্যাদানগর

মোহাম্মদ আনারুল ইসলাম : পিতা-মোবারক মণ্ডল, বয়স-২৫, পেশা-মাজারের খাদেম, জাঁহাপুর

মো: আবদুস সাত্তার : পিতা-মোবারক মণ্ডল, বয়স-৩০, পেশা-কৃষিকাজ, গ্রাম- জাঁহাপুর

মতিয়ার হোসেন : পিতা-নূর বকশ মণ্ডল, বয়স-৪৫, পেশা-রাজমিস্ত্রী, গ্রাম- বারোঘরিয়া

আবদুর রাজ্জাক : পিতা- মকছেদ শাহ, বয়স-৩৮, পেশা-কৃষিকাজ, গ্রাম- জোড়গাছা

বজলুর রহমান : পিতা- আরশাদ আলি, বয়স-৩২, পেশা-কৃষিকাজ, জাহাপুর

নজরুল ইসলাম গঞ্জের : পিতা-আনসার মালিতা, বয়স-৫০, সঙ্গীতচর্চা, বেলগাছি, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

লোচন কর্মকার : পিতা-হিরনচন্দ্র কর্মকার, বয়স-৯০, গ্রাম-কবরা, স্বর্ণকার

মোহাম্মদ আলী হোসেন বিশ্বাস : পিতা-মোজাহার বিশ্বাস, বয়স-১০৫, গ্রাম- কবরা, পেশা- স্বর্ণকার

নিজামউদ্দিন শেখ : পিতা - কিফাতুল্লাহ শেখ, বয়স-৮০, গ্রাম-কররা, পেশা- বয়নশিল্প

দীনু শাহ : বয়স-৯০, গ্রাম-কররা

গ্রন্থপঞ্জি

অক্ষয় কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৮৮

অন্নদাশঙ্কর রায় : রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা,১৯৬২

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত, প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫০

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, রীডার্স কর্ণার, কলিকাতা, ১৯৬১

অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, তৃতীয় মুদ্রণ, উচ্চারণ, কলিকাতা, ১৯৮১

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতকাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

অর্জুন বিকাশ চৌধুরী : ভারতীয় দর্শন, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৭১

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙালির ধর্ম ও দর্শন-চিন্তা, প্রথম প্রকাশ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৬৫

আজহার ইসলাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, প্রথম সংস্করণ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭২

আনিসুজ্জামান : মুসলিমম মানস ও বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩

আনোয়ারুল করিম : বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, প্রথম প্রকাশ, লোকসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, কুষ্টিয়া, ১৯৭১

আনোয়ারুল করিম : বাউল কবি লালন শাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আমেনা আনোয়ার প্রকাশিত, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬

আবদুল হাফিজ : বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

আবুল ফজল : সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবন, প্রথম সংস্করণ, বইঘর, চট্টগ্রাম

আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ—সংস্কৃতির রূপান্তর, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮২

আবুল আহসান চৌধুরী : কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, প্রথম সংস্করণ, গণলোক প্রকাশনী, কুষ্টিয়া, ১৩৮০

আবদুর রহমান : কোরআন ও জীবন-দর্শন, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, রহমান সন্স, চট্টগ্রাম, ১৯৬০

আমিনুল ইসলাম: প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস,কলিকাতা, ১৯৭৭

আহমদ শরীফ : বাংলার সুফী-সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

আহমদ শরীফ : বাউল-তত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রথম সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলিকাতা, ১৯৫৭

এস. এম. লুৎফর রহমান : লালন-জিজ্ঞাসা, প্রথম সংস্করণ, ধারণী সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৮৪

এস.এম.লুৎফর রহমান : লালন শাহ: জীবন ও গান, প্রথম সংস্করণ,বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

এবাদত হোসেন : পদাবলী সমীক্ষা, প্রথম সংস্করণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৩৭৬

ওয়াকীল আহমদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

কল্যাণ মল্লিক : নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫০

কাজী আকরম হোসেন : দীউয়ান-ই-হাফিজ, প্রথম সংস্করণ, আজাদ হোসেন, ঢাকা, ১৯৬১

কাজী দীন মোহাম্মদ : সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, প্রথম সংস্করণ , নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

কালীদাস রায় : পদাবলী সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৬৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য চরিতামৃত,সুকুমার সেন (সম্পাদিত), লঘু সংস্করণ, সাহিত্য আকাদেমী, নিউদিল্লী, ১৯৬৩

কেনেথ ডব্লিউ মরগান : ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, মুয়াযযম হুসায়ন প্রমুখ (অনূদিত), দ্বিতীয় প্রকাশ, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৯

খগেন্দ্রনাথ মিত্র : বৈষ্ণব পদাবলী, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬১

খোন্দকার মকবুল হোসেন : কবি পাগলা কানাইয়ের মানস-পরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭১

খোন্দকার রফিউদ্দীন : ভাবসঙ্গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৯৬৭

খোন্দকার রিয়াজুল হক : লালন শাহের পুণ্যভূমি হরিশপুর, প্রথম সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৯৭২

ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, লেখক সমবায় সমিতি সংস্করণ, লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৯৬৫

ক্ষুদিরাম দাস : বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, প্রথম সংস্করণ, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৫

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : জীবনী সংগ্রহ, অষ্টম সংস্করণ, চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১২২৬

গোপীনাথ কবিরাজ : তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৬৯

গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৭২

গোলাম সাকলায়েন : ফকীর গরীবুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮

গোলাম মোস্তফা : বিশ্বনবী, ঊনবিংশ মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৪

গোবিন্দচন্দ্র দেব : তত্ত্ববিদ্যা সার, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন গীতিকা, প্রথম সংস্করণ, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬৩

চিত্তরঞ্জন দেব : বাংলার পল্লীগীতি, প্রথম সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৬৬

শামসুর রহমান চৌধুরী : সুফীতত্ত্বের মর্মকথা, প্রথম সংস্করণ, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০

জসীমউদ্দীন : মুর্শীদা গান, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

জাহান আরা বেগম : বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

দক্ষিণারঞ্জন বসু : সংস্কৃতি ধর্ম, প্রথম প্রকাশ, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৭১

দাতা-গঞ্জে-বকশ : কাশফুল মাহজুব, আবদুল জলীল (অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, শামস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৪

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, স্যানাল এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯০১

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ এণ্ড পাবলিকেশান্স, কলিকাতা, ১৯৬৯

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

নুরুর রহমান (অনূদিত) : তাজকেরাতুল আউলিয়া, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭২

পাঞ্জু খোন্দকার : ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, তৃতীয় সংস্করণ, হরিশপুর, যশোর, ১৯৬১

প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত : ভারতীয় দর্শন, প্রথম খণ্ড, দশম সংস্করণ, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮০

প্রফুল্লচন্দ্র পাল : প্রাচীন কবিওয়ালার গান, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৮৯৮

বসন্ত কুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির, প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৩৬২

বাহেরালী খোন্দকার : ছহি ইস্কি এলাহি এরফানী ভেদের কথা, প্রথম সংস্করণ, কুশলীবাসা, নদীয়া, ১৩২২

বিধুশেখর ভট্টাচার্য : উপনিষদ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৬৯

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর : বাউল গান ও দুদ্দু শাহ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ১৩৭১

মতিলাল দাস ও পিযুষকান্তি মহাপাত্র : লালন গীতিকা, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৯

মাযহারুল ইসলাম : কবি পাগলা কানাই, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৯

মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী : আদ্য পরিচয়, শেখ জাহিদ (রচিত), প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী, ১৩৭১

মওলানা মোহাম্মদ জালালউদ্দীন রুমী : মছনবী শরীফ, প্রথম খণ্ড, আজিজুল হক, (অনূদিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৪

মুনশী বুদ্দু শাহ : ছহি দিদার এলাহি, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৯

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : ইসলাম প্রসঙ্গ, প্রথম সংস্করণ, রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২

মুহাম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী-প্রভাব, প্রথম সংস্করণ, মোহসীন এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৩৫

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ : মানুষের ধর্ম, তৃতীয় সংস্করণ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৯

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারমণি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২

মুহম্মদ আবূ তালিব : লালন শাহ ও লালন গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

মোহিতলাল মজুমদার : সাহিত্য বিচার, পরিবর্ধিত প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৩

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

মোহাম্মদ গোলাম রাসুল : বিশ্বমরমী চিন্তাধারায় রুমী, প্রথম প্রকাশ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৩

মোহাম্মদ মযহারুদ্দীন : হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৮

মোহাম্মদ আবদুল হালিম : গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

মোহাম্মদ আবদুল আজীজ : বানুমোল্লার শায়েরী, প্রথম সংস্করণ, সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত, তালতলা, যশোর, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : বাঙলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, প্রথম সংস্করণ, বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লি:, কলিকাতা, ১৩৬৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৬১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৫৩

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৩৭৭

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ : ভারতীয় দর্শন, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

রেয়াজউদ্দীন আহমদ : বাউল ধ্বংস ফতওয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, রংপুর, ১৩৩৩

শশিভূষণ দাসগুপ্ত : ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭২

শশিভূষণ দাসগুপ্ত : ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৮৪

শরীফ হারুন : দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, প্রথম প্রকাশ, উচ্চারণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২

শাহ আবদুর রহমান : শরফুল ইনসান, হামিদুর রহমান (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৭

শাহ গরীবুল্লাহ : ইউসুফ জেলায়খা, পঞ্চদশ সংস্করণ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৩

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : সংসদ বাংলা অভিধান, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮২

শ্রীশচন্দ্র দাস : সাহিত্য সন্দর্শন, বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫৪

সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৬৩

সতীশচন্দ্র রায় : শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২২

সনৎকুমার মিত্র : লালন ফকির : কবি ও কাব্য, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৩৮৬

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বৈষ্ণব পদরত্নাবলী, প্রথম সংস্করণ, নতুন সাহিত্য-ভবন, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

সাইদুর রহমান : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৪

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের গান, সংশোধিত সংস্করণ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৬১

সুকুমার সেন : বৈষ্ণব পদাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১

সৈকত আজগর : বাউল সাধক কালু শাহ, প্রথম প্রকাশ, কালু শাহ পরিষদ, মানিকগঞ্জ, ১৯৮২

সৈয়দ শাহ কাসেম আলী : জলসায়ে মৌলুদ, প্রথম সংস্করণ, দহকুলা, কুষ্টিয়া, ১৯৩২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধ গান ও দোহা, নতুন সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৬

হারেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৬৩

হিমাংশু চৌধুরী : বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা, প্রথম সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৮

হেমাঙ্গ বিশ্বাস : লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৫

Guillame : The Life of Muhammad, Second Impression, Oxford University Press, Pakistan Branch, Dhaka, 1963

Abdul Ghani : A History of Persian Language, Literature at the Mughal Court with a brief Survey of Urdu language, First Edn, Indian press, Allahabad, 1930

Abu Rushd (Tr,) : Songs of Lalon Shah, First Edn, Bangla Academy, Dhaka, 1964

A.G. Arbery : The Koran Interpreted, First Edn., George Allen & Unwin Ltd.,London, 1955

A. G. Arbery : The Doctrine of the Sufis, Reprinted Ed, kashmiri Bazar, Lahore, 1966

A.G. Arbery : Sufism, second Impression, George Allen & Unwin, London, 1956

Ahmed Hossin : The Philosophy of Fakirs, Second Ed. kashmiri Bazar, Lahore, 1963

Ashrf Siddiqui : Our Folklore our Heritage, First Edn. Barnamichhil, Dhaka, 1976

Bertrand Russell : History of Western Philosophy, Eighth Impression, George Allen & Unwin Ltd., London, 1962

Bhagavan Das : Eessential Unity of All Religions, Fifth Ed., The Theosophical publishing house, Madras, 1955

Cyprian Rice : The persion sufis, Reprinted Ed., George Allen & Unwin Ltd., London, 1964

Frank Thilly : A History of Philosophy, Revised by Ledger Wood, Third Ed., Central Book Depot, Ellahabad, 1973

Mary Boyce : Zoroastrians, First Ed., Routledge & Kegan Paul, London, 1979

Ahmed Hossain : The Philosophy of Fokirs, Second Ed. World Press Private Ltd., London.

নির্ঘণ্ট